দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত খান জাহান আলী (রহ:)
এর
অবদান

GIFT

অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর

জন্য উপস্থাপিত

401421

Dhaka University Library
401421

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক

মোঃ জয়নুল আবেদীন

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মার্চ ২০০৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্ব প্রথম মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যার অপার করুণায় এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সাথে সাথে অসংখ্য দুরূদ ও সালাম জানাই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা:) এর প্রতি। অতঃপর আমি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক যিনি বহু ভাষাবিদ, ইসলামি চিন্তাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস- চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান স্যারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁর যথার্থ নির্দেশনা ব্যতীত আমার পক্ষে এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করা সম্ভব হতো না। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন দায়িত্বে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহসহ সার্বিক ব্যাপারে আমাকে বহু মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন, এজন্য তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ। তাঁরই সহধর্মিনী নাজিবা রহমান আমার গবেষণার ব্যাপারে যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন, এজন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড: মুহাম্মদ ফজলুর রহমানও আমার গবেষণা কর্মটি সুন্দর করার জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, এ জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। অত্র বিভাগের অনেক শিক্ষক তাঁদের প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন যথাসময়ে গবেষণা সুসম্পন্ন করার জন্য। আমি এজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার স্যারের নিকট থেকে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুন্দর করার জন্য মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি, এজন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

আমারই বন্ধুবর আবু মোহাম্মদ আরিফুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মালীবাগ, ঢাকা; এ.কে.এম.আমিনুল হক, পিএইচ.ডি. গবেষক, ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; লস্কার নওশের আলী, লেকচারার বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর; মোঃ শামছুল আলম হাওলাদার, পিএইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ আলী আকবর, পিএইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক, পিএইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, পিএইচ.ডি. গবেষক, যাদবপুর

401421

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী, পিএইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরা আমার গবেষণা কর্মে উৎসাহ-প্রেরণা যুগিয়েছেন, এজন্য তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। ডা: মোঃ বজলুর রহমান মিঞা, সেকশন অফিসার, কলা অনুষদ, ডীনের অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়, তিনি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে সহযোগিতা করেছেন, এজন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

আমারই অতি আদরের ছোট বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী তাহজিদা আফরোজ আমার রিসার্স কাজে সহযোগিতা করেছে, এজন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ডঃ মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম তিনি আমার গবেষণা কাজের জন্য একটি সুন্দর বসার স্থান দিয়েছেন, এজন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। মোহাম্মদ আলী সরকার, জুনিয়র গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি আমার গবেষণার ব্যাপারে নানা সহযোগিতা করেছেন, এজন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। মোঃ আলমাস মিয়া, অফিস এ্যাটেনডেন্ট গ্রেড-১, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি আমার গবেষণার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট আন্ত রিকতার সাথে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, এজন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী, জাতীয় গ্রন্থ সংস্থা, পাবলিক লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ব্যানবেইস লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে আমি এই অভিসন্দর্ভের উপকরণ ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি থাকলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গে ফিল্ড ওয়ার্ক করার সময় যারা আমাকে মূল্যবান তথ্য ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

401421

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সঙ্কেত

অনু./অনু:	=	অনুবাদ/অনূদিত
আ:	=	আলাইহিস্ সালাম
ইং	=	ইংরেজি
খ.	=	খণ্ড
খ্রি:	=	খ্রিষ্টাব্দ
ড:/ড.	=	ডক্টর
ঢা. বি.	=	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
বা/বাং	=	বাংলা
বি. দ্র.	=	বিস্তারিত/বিশেষ দ্রষ্টব্য
মৃ.	=	মৃত
রহ:	=	রহমাতুল্লাহ আলাইহি
র. / রা:	=	রাদিয়াল্লাহু আনহু
সা:	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হি:	=	হিজরি
p.	=	Page
pp.	=	Pages
Ed.	=	Edition
Ibid.	=	Ibidem (in the same place)
AD.	=	Anno Domini (in the year of our Lord)
Op. cit.	=	Opere citato (in the work cited)
J.A.S.B	=	Journal of the Asiatic Society of Bengal

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী, ফার্সি ও ইংরেজি বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

ا	a	আ
اِ	i	ই
اُ	u	উ
ب	b	ব
پ	p	প
ت	t	ত
ث	th	স
ج	di,j	জ
چ	c	চ
ح	h	হ
خ	kh	খ
د	d	দ
ڈ	d'	ড
ذ	dh	য
ر	r	র
ڑ	'r	ড়
ز	z	য
ژ	zh	ঝ
س	s	স
ش	sh	শ
ص	s	স
ض	d	দ/য

ط	t	ত্ব
ظ	z	জ/য
ع	-	আ
غ	gh	গ
ف	f	ফ
ق	k/q	ক্ব
ك	k	ক
گ	g	গ
ل	l	ল
م	m	ম
ن	n	ণ/ন
ه	h	হ
و	w	ও/ভ/ব
ى	y	য়
ي	ay	ে
ء	-	য়/আ
ـَـ	-	আ
ـِـ	-	ই/ি
ـُـ	-	উ
ـَـ + ا	-	আ
ـِـ + ى		ঈ/ী
ـُـ + و		উ/ঊ

Dhaka University Institutional Repository

সন পরিবর্তনের পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি ঃ

হিজরি সনকে খ্রিষ্টীয় সনে পরিবর্তনের নিয়ম ঃ সাধারণত হিজরি ৩৩ বছরে খ্রিষ্টীয় ৩২ বছর হয়। কেননা হিজরি হিসাব চান্দ্র বছর অনুযায়ী হয় এবং খ্রিষ্টীয় হিসাব সৌর বছর অনুযায়ী হয়।

ফরমুলা ঃ খ্রিষ্টীয় সন = $\frac{৩২}{৩৩}$ (হিজরি সন) + ৬২২

উদাহরণ ঃ ১৪১২ হিঃ = $\frac{৩২}{৩৩}$ (১৪১২) + ৬২২

১৪১২ x ৩২ = ৪৫১৮৪ ÷ ৩৩ = ১৩৬৯.২১ ... ...

১৩৬৯ + ৬২২ = ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ

এ হিসেবে ভগ্নাংশ বিবেচ্য নয় ।

খ্রিষ্টীয় সনকে হিজরি সনে পরিবর্তনের নিয়ম ঃ

ফরমুলা ঃ হিজরি সন = $\frac{৩৩}{৩২}$ (খ্রিষ্টীয় সন - ৬২২)

উদাহরণ ঃ ১৯৯১ খ্রিঃ = $\frac{৩৩}{৩২}$ (১৯৯১ - ৬২২)

১৯৯১ - ৬২২ = ১৩৬৯ x ৩৩ = ৪৫১৭৭

৪৫১৭৭ ÷ ৩২ = ১৪১২ হিঃ।[১]

দ্বিতীয় পধতি ঃ

বঙ্গাব্দের সমপরিমাণ খ্রিষ্টাব্দ পেতে হলে প্রাপ্ত বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করতে হবে।

যেমন - ১৩৮৬ বাং + ৫৯৩ = ১৯৭৯ খ্রিঃ । হিজরি অব্দের সমপরিমাণ খ্রিষ্টাব্দ পেতে হলে নিম্নেবর্ণিত সূত্রের আলোকে অঙ্ক কষে বের করতে হবে। যেমন --

$$A.H. - \frac{3xA.H}{100} + 621 = A.D.$$

হিজরি ১০৮৪ $- \frac{৩\times১০৮৪}{১০০}$ + ৬২১ খ্রিঃ = ১৬৭২/১৬৭৩ খ্রিঃ ।[২]

Fractions being neglected.

তথ্য নির্দেশ

১. ড: মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুর'আন পরিচিতি, নুবালা পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৫২

২. ড: মুহম্মদ এনামুল হক, মনীষা মঞ্জুষা, ৩য় খণ্ড, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৫০-৫১, ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ
(Abstract)

অত্র অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য "দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অবদান" অনুসন্ধান । অনুসন্ধানের সুবিধার্থে এ অভিসন্দর্ভটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ

১. প্রথম অধ্যায়ে "বঙ্গের ভৌগোলিক পরিচিতি অর্থাৎ - বঙ্গের তথা বাংলার সীমানা ও আয়তন, ভূ-প্রকৃতি ও গঠন, প্রকৃতি ও জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতির প্রভাব, ধর্ম প্রভৃতি আলোচনা স্থান পেয়েছে ।

২. দ্বিতীয় অধ্যায়ে "বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম " অর্থাৎ - মুসলমানদের আগমনের প্রেক্ষাপট এবং বাংলায় ইসলাম প্রচার তথা দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

৩. তৃতীয় অধ্যায়ে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব চিত্র বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. চতুর্থ অধ্যায়ে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. পঞ্চম অধ্যায়ে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু পীর আলী মুহাম্মদ তাহিরের পরিচিতিসহ পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচিত হয়েছে।

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়ে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) দক্ষিণবঙ্গে আগমন-কাল থেকে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত সমাজ সেবা ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে সকল অবদান রাখেন তার বাস্তব চিত্র বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন সময়ে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) দক্ষিণবঙ্গে সমাজ সেবা ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন। উক্ত অবদানের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের কলেবর বা আয়তন ছাড়িয়ে অসংখ্য ভলিয়্যুম বা খণ্ডে পরিণত হবে। সেজন্য দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারের মৌলিক দিকসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i-ii
শব্দ সঙ্কেত	iii
প্রতিবর্ণায়ন	iv
সন পরিবর্তনের পদ্ধতি	v
সারসংক্ষেপ	vi
ভূমিকা	১ - ২
প্রথম অধ্যায় : বঙ্গের ভৌগোলিক পরিচিতি	৩ -১২
দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলায় মুসলমানদের আগমন এবং দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম	১৩-৬১
তৃতীয় অধ্যায়: হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা :	৬২-১৩০
৩.১ সামাজিক অবস্থা :	৬২
৩.১.১ প্রাথমিক স্তর :	৬৩-৭৪
ক. সাধারণ শ্রেণী	৬৩-৬৫
খ. মধ্যবিত্ত শ্রেণী	৬৫-৬৭
গ. অভিজাত সম্প্রদায় ও উচ্চ শ্রেণী	৬৭-৬৯
ঘ. দরবারী জীবন	৬৯-৭১
ঙ. চারিত্রিক সততা	৭১
চ. শাসক	৭১-৭৩
ছ. সমাজের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য	৭৩-৭৪
৩.১.২ দ্বিতীয় স্তর :	৭৫-৮৭
ক. উৎসবাদি	৭৫-৭৭
খ. সামাজিক অনুষ্ঠানাদি	৭৭-৭৮
গ. আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক রীতি	৭৮-৮০
ঘ. বিয়ে - সাদি	৮০-৮৩
ঙ. পোশাক-পরিচ্ছদ	৮৩-৮৪
চ. অলঙ্কারাদি	৮৪
ছ. খাদ্য	৮৪-৮৭
জ. দাস ব্যবসা	৮৭
৩.২ রাজনৈতিক অবস্থা :	৮৮-৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ অর্থনৈতিক অবস্থা : ১০০-১২০

ক. কৃষি ১০১-১০৪

খ. শিল্প কারখানা ১০৪-১০৮

গ. আর্থিক সমৃদ্ধি ১০৯

ঘ. বাণিজ্য ১১০-১১৩

ঙ. সুলভ জীবন যাত্রা ১১৩-১২০

চতুর্থ অধ্যায় : হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর জীবন কথা ১৩১-১৪৮

পঞ্চম অধ্যায় : পীর আলী মুহাম্মদ তাহির ও পীরালী সম্প্রদায় ১৪৯-১৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অবদান ১৬৪-২২৫

৬.১ দক্ষিণবঙ্গে আগমন ও ইসলাম প্রচার ১৬৫

৬.১.১ বারবাজারে আগমন ও ইসলাম প্রচার ১৬৫-১৬৭

৬.১.২ মুড়লী কসবায় আগমন ও ইসলাম প্রচার ১৬৭-১৬৯

৬.১.৩ খানপুরে আগমন ও ইসলাম প্রচার ১৬৯

৬.১.৪ বিদ্যানন্দকাটিতে আগমন ও ইসলাম প্রচার ১৬৯-১৭১

৬.১.৫ আমাদি মসজিদকুড়ে আগমন ও ইসলাম প্রচার ১৭১

৬.১.৬ বাগেরহাটে আগমন ও ইসলাম প্রচার ১৭১-১৭৪

৬.১.৭ ষাট গম্বুজ মসজিদ ১৭৪-১৭৯

৬.১.৮ ঘোড়াদিঘি ১৭৯

৬.১.৯ হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর বসতবাটি ১৭৯-১৮১

৬.২ হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অন্যান্য কীর্তিরাজি ১৮১

৬.২.১ রণবিজয়পুর মসজিদ ১৮১-১৮২

৬.২.২ বিবি বেগিনীর মসজিদ ১৮২

৬.২.৩ চুনাখোলা মসজিদ ১৮৩

৬.২.৪ সিঙ্গার মসজিদ ১৮৩-১৮৪

৬.২.৫ নয়-গম্বুজ মসজিদ ১৮৪-১৮৫

৬.২.৬ মসজিদ কুড় মসজিদ ১৮৫-১৮৬

৬.২.৭ গোড়া মসজিদ ১৮৬-১৮৭

৬.২.৮ জিন্দাপীর ১৮৭-১৮৮

৬.২.৯ খাঞ্জালী দিঘি ১৮৮-১৯০

৬.২.১০ কুমীরের বর্ণনা ১৯০-১৯৭

৬.২.১১ রাস্তা-ঘাট ১৯৮

৬.২.১২ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ১৯৯

৬.২.১৩ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ১৯৯

৬.২.১৪ মুসাফির খানা ১৯৯-২০০

৬.৩ জীবন সায়াহ্নে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ও তাঁর অবদান ২০০-২০৪

৬.৪ খাঞ্জালীর সমাধি ও তাঁর লিপিসমূহ ২০৪-২১০

উপসংহার ২২৬-২২৮

গ্রন্থপঞ্জি ২২৯-২৪৬

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মহান সূফী-সাধক হযরত খান জাহান আলী (রহ:) বঙ্গের ইতিহাসে সাধারণত খান জাহান আলী এবং দক্ষিণবঙ্গের জনগণের মধ্যে পীর খাজালী নামে সমধিক পরিচিত।[১] তিনি ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, সুশাসক ও স্থপতি। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কৃতিত্বের স্বাক্ষর আজও বিদ্যমান রয়েছে। অদ্যাবধি এই মহান সূফী সাধক সম্পর্কে Authentic এবং গবেষণামূলক কোন গ্রন্থ বা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। তাছাড়া এ অঞ্চলের জনসাধারণ হযরত খান জাহান আলী (রহ:) সম্পর্কে জানতে উদগ্রীব, সেজন্য আমি এই সুদীর্ঘ অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করতে প্রয়াস পাই। আমার এ গবেষণার পরিধি ও পরিসর হলো "দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অবদান"।

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার উদ্দেশ্যে তিনিসহ আরও এগারজন সঙ্গী এবং ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে বারবাজারে আগমন করেন। মূলত তিনি ইসলাম প্রচার ও জনসেবার উদ্দেশ্যে বঙ্গে আগমন করেন। বারবাজারে ইসলাম প্রচারের পর তিনি সেখানে গরীব শাহ ও বাহরাম শাহ নামীয় দু'জন অনুচরকে রেখে মুড়লী কসবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মুড়লীতে ইসলাম বিস্তৃতির পর উপরিউক্ত দু'জনকে এখানের প্রশাসনিক দায়িত্বও দেয়া হয়। তারপর হযরত খান জাহান আলী (রহ:)তাঁর অনুচরবর্গকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে একদলকে কপোতাক্ষ নদের তীর ঘেঁষে সুন্দরবনের বেতকাশি পর্যন্ত পৌঁছেন এবং এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন বুড়ো খাঁ ও তাঁর পুত্র ফতেহ খাঁ। তাঁরা উক্ত স্থানে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবামূলক নানা রকম কর্মকাণ্ডে অবদান রাখেন। আর অন্যদল ভৈরব নদীর তীর ধরে সামনের দিকে চলছিল, সে দলের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং হযরত খান জাহান আলী (রহ:) । তিনি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের পর খলিফাতাবাদ তথা বর্তমান বাগেরহাটে স্থায়ীভাবে খানকাহ স্থাপন করেন। আর এখানেই তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা-ঘাট, দিঘি, প্রতিষ্ঠা ও খনন করে যা বিশ্বের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

অত্র অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে আমি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম "বঙ্গের ভৌগোলিক পরিচিতি"। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান লাভ করে "বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম" তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে "হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা" চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো "হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর

Dhaka University Institutional Repository

জীবন কথা'' পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে ''পীর আলী মুহাম্মদ তাহির ও পীরালী সম্প্রদায়'' আর ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে ''দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত খান জাহান আলী (রহ:)এর অবদান'' প্রসঙ্গে; অর্থাৎ - হযরত খান জাহান আলী (রহ:) দক্ষিণবঙ্গে আগমনকাল থেকে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত সমাজ সেবা ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অবদান রাখেন তার বিস্তারিত বিবরণ এ অভিসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে।

অত্র অভিসন্দর্ভে দু'টি পদ্ধতি (Method) ব্যবহৃত হয়েছে যেমন -

১. দালিলিক পদ্ধতি (Documentary Method)

২. সাক্ষাতকার পদ্ধতি (Interview Method)

এ অভিসন্দর্ভে দালিলিক পদ্ধতির উৎস হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । যেমন -

১. Text Books
২. Journals
৩. Reports
৪. Seminer Report
৫. ড: মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান ।
৬. আহমদ শরীফ সম্পাদিত বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান।
৭. Samsad English-Bengali Dictionary.
৮. Samsad Bengali-English Dictionary.
৯. ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান প্রণীত আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান।
১০. মুহম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী প্রণীত বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধান । (প্রথম খণ্ড)
১১. Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam, Lahore, 1964

অপরদিকে দক্ষিণবঙ্গে ফিল্ড ওয়ার্ক করার সময় বিভিন্ন লোকের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে।

পরিশেষে উপসংহারে অত্র অভিসন্দর্ভের দীর্ঘ আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপলব্ধ তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ

১. ড: এ.কে.এম. আইয়ুব আলী, খান জাহান, (ইসলামী বিশ্বকোষ, নবম খণ্ড), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫০৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গের ভৌগোলিক পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গের ভৌগোলিক পরিচিতি

ঐতিহাসিক সত্য কথা হলো কোনো একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, এর রাজনৈতিক জীবন গঠনে এবং এর অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। ভূ-প্রাকৃতিক গঠন-প্রণালী ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বাস্তবিকই দেশের জীবন ও সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। একটি দেশের ইতিহাস সে দেশের ভূগোল জ্ঞান ব্যতিরেকে পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং এদিক থেকে বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থা আলোকপাত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

একাধিক কারণে বাংলার সামাজিক জীবন চিত্রণে ভূগোল-জ্ঞান অপরিহার্য। "প্রথমত, মুসলিম আমলেই কেবল বিভাগ-পূর্ব সমগ্র দেশটি 'বাংলা' নামে অভিহিত হতো। দ্বিতীয়ত, মুসলমান শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক সীমানা এর ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমার সঙ্গে এক হয়ে যায় এবং এ দুটোই বাংলা ভাষা -ভাষী অধিবাসীদের ভাষাগত ঐক্যের সঙ্গে মিলে যায়। মুসলমান শাসন এভাবে বাঙালী অধিবাসী লোকদেরকে এক সাধারণ জীবনের আওতায় একত্রীভূত করে এবং তাদেরকে এক ভাষা ও সংস্কৃতির পটভূমিতে সন্নিবেশিত করে। প্রকৃতপক্ষে, এ সময় থেকেই বাঙালী ও বাংলার ইতিহাস শুরু হয়।"[১]

বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ জনসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এদেশের প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য বর্তমানের ন্যায় অতীতেও এত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল যে, তা বাংলার অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাত্রা, আচার, পদ্ধতি এবং রীতি-নীতিতে একটি বিশিষ্ট ছাপ রেখে যায়।

বাংলাদেশ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অতি প্রাচীন দেশ। প্রাচীনকাল থেকেই তা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভৌগোলিক এলাকা বলে সুপরিচিত ছিল এবং স্থায়ীভাবে এ ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর একটি ভিন্ন সত্তা বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী একটি দেশের নাম হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশ। এদেশ স্বাধীন সার্বভৌম ও এর অধিবাসী বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিক্ষিপ্ত জনপদের অংশ বিশেষ । এ এলাকার বাইরে ভারতের বিহার, উড়িষ্যা , পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যের কিছু অংশে এবং মায়ানমারের (বার্মার) আরাকানে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় ২১ কোটি।" [২]

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ ভারতের রাজ প্রতিনিধি ১৯০৫ সালে বাংলাকে পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম বাংলা এই দু'ভাগে বিভক্ত করেন। এ সময় পূর্ববাংলা নতুন প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ব বাংলাকে শাসন কাজের সুবিধার জন্য অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগকে আসামের সাথে যুক্ত করে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর হতে কার্যকর হয়। নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী হলো ঢাকা। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজ প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে এবং লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অবশেষে বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালে তীব্র প্রতিবাদের মুখে বাংলা বিভক্তি রহিত করেন এবং পুনরায় বাংলা একটি প্রদেশে পরিণত হয়।[৩]

কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হলেও বঙ্গদেশ তার পূর্ববর্তী সীমানা ফেরত পায়নি। তখন বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায়। নতুন ব্যবস্থায় পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিং ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বঙ্গদেশ গঠিত হয়। আর আসাম পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। এতে করে এক দিকে বাংলা ভাষা-ভাষী সিলেট, কাছাড়, শিলচর ও গোয়ালপাড়া জেলা আসামে থেকে যায়।[৪] বৃটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা দেয়। ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম বাংলা ভারতের একটি রাজ্যে এবং পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।[৫] পূর্ববঙ্গ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে তখন পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হয়। অবশেষে সুদীর্ঘ ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ হতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় নয় মাস স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এদেশ পাকিস্তান হতে পৃথক হয়ে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৬]

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকদের বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গার সর্ব পশ্চিম ও সর্ব পূর্ব দু'ধারার মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চলই আসল বঙ্গ এবং এর প্রায় সবটুকুই (২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার অংশ বিশেষ ছাড়া) বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলার সীমানা ও আয়তন

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন শাসনামলে যুগে যুগে বাংলার আয়তন ও সীমানা হ্রাস, বৃদ্ধি ঘটেছে। এ দেশের সীমানা কখনো যুদ্ধে জয়লাভ করে বৃদ্ধি হয়েছে, কখনো সীমানা হ্রাস পেয়েছে পরাজিত হওয়ার পর । যুগে যুগে এভাবে বাংলার আয়তন ও সীমানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ-

বর্তমান বাংলার সীমানা পশ্চিম ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য ও মায়ানমার (বার্মা), উত্তর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুনাচল ও আসাম রাজ্য এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এর আয়তন ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল বা ১,৪৩,৯৯৮.২৬ বর্গকিলোমিটার আর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি।"এর অবস্থান ২০°৩৪´ ও ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০°১´ ও ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।"[৭] এমন এক সময় ছিল যখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিম বাংলার সমগ্র অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ বোঝাত। আবার কখনো বাংলাদেশ বলতে সমতট, রাঢ় পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় ও তাম্রলিপ্তিকে বোঝাত। "মহাভারতের যুগে বাংলাদেশ মোদাগিরি, পুন্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ সূহ্ম, প্রসূহ্ম, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তি ইত্যাদি এ সব বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল।"[৮]

কোনো কোনো ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন যে, বঙ্গ মূলত তাম্রলিপ্ত, পুন্ড্র ও সূহ্ম সংলগ্ন দেশ। পরবর্তীকালে বঙ্গের পশ্চিম সীমা ছিল গঙ্গা ও ভাগীরথী। যশোর এবং এর চতুর্দিকের অঞ্চলগুলো কোনো এককালে বঙ্গ হতে স্বতন্ত্রভাবে উপবঙ্গ নামে আখ্যায়িত হতো। এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে মধ্যযুগে রচিত 'দ্বিগ বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে।[৯] সুতরাং প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্ধারণ করে নির্দেশ করা যায় না। কারণ আমরা বর্তমান কালের বাংলা বলতে যে সকল অঞ্চলকে বুঝি তা প্রাচীনকালে এসকল অঞ্চলের কোনো একটি নাম ছিল না। এ সব অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এ সমস্ত এলাকায় স্বাধীন রাজ্য ছিল একাধিক। এদের নামের মধ্যেও আবার বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যেমন দক্ষিণ ও পূর্বাংশে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল, উত্তরাংশে পুন্ড্র ও বরেন্দ্র এবং পশ্চিমাংশে তাম্রলিপ্তি, রাঢ় ও কজঙ্গল প্রভৃতি দেশ ছিল। পশ্চিমাংশে দণ্ডভূক্তি ও সূহ্ম নামেও অভিহিত হতো। এছাড়া কোনো এক সময় উত্তর ও দক্ষিণাংশ গৌড় নামেও আখ্যায়িত হতো। সুতরাং আমরা এভাবে মোটামুটি প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্দেশ করতে পারি। যেমন- পূর্বে গারো, খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিকা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ, উত্তরে হিমালয় এং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

সাধারণত এ সীমানার মধ্যবর্তী অঞ্চল বাংলা নামেই সুপরিচিত।[১০] গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বঙ্গরাজ্য 'মগধ' সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পুনরায় ৭ম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বঙ্গরাজ্য উদ্ধার করেন। আর বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন জনপদগুলোকে একত্র করার প্রচেষ্টা করেন। শশাঙ্কের পরে এ বাংলা তিনভাগে বিভক্ত ছিল যেমন- গৌড়, পুন্ড্র ও বঙ্গ।[১১] চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তখনকার বঙ্গরাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন- কর্ণসুবর্ণ, সমতট, পুন্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্ত ও কামরূপ। তাছাড়া সেন বংশের রাজত্বকালে বল্লাল সেনের সময় বঙ্গরাজ্য পাঁচভাগে

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ করা হয়েছিল যেমন- মিথিলা, রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ) বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ) বাগড়ী বা বকদ্বীপ (মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গ) ও বঙ্গ (পূর্ব বঙ্গ) ।[১২]

তবে মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেও সমগ্র বঙ্গ অঞ্চল পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু নামের ব্যাপারে কিছুটা প্রভেদ দেখা যায়। যেমন- (১) রাঢ় অঞ্চল - গঙ্গার দক্ষিণ ও হুগলী নদীর পশ্চিম ভাগ পর্যন্ত । (২) বাগড়ী - গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বদ্বীপ (৩) বঙ্গ - বদ্বীপের পূর্ব দিকের স্থানসমূহ (৪) বরেন্দ্র - গঙ্গা বা পদ্মার উত্তর মহানন্দার পূর্ব এবং করতোয়া নদীর পশ্চিম দিক। (৫) মিথিলা - মহানন্দার পশ্চিম দিকে অবস্থিত দেশ ।[১৩] কিন্তু সেন ও পাল বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে বঙ্গের আয়তন সংকুচিত হয়ে যায়। এ যুগে বঙ্গ জনপদ গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। হেমচন্দ্র রচিত চিন্তামনি নামক অভিধান থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র নদীর উপকূল বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন পাল বংশ দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে তখন বঙ্গ জনপদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর বঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গ নামে সুপরিচিতি লাভ করে। উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমানায় ছিল পদ্মা আর দক্ষিণের বদ্বীপ অঞ্চল ছিল দক্ষিণ বা অনুত্তর বঙ্গ । এর দীর্ঘকাল পরে বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের আমলেও বঙ্গের দু'টি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। এখনকার বিক্রমপুর পরগণা এবং এর সঙ্গে আধুনিক ইদিলপুর পরগণার সামান্য অংশ মিলে বিক্রমপুর ভাগ হয়েছিল। অন্য ভাগের নাম ছিল নাব্য মণ্ডল। বরিশাল জেলাসহ আরও পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার নাম নাব্য মণ্ডল ছিল। মেঘনা নদীর মোহনাও এ নাব্যমণ্ডলের অন্তর্গত ছিল।[১৪]

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সুলতানি শাসন প্রাক্কালে বাংলা তখন কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং মুসলমানগণ এর পৃথক পৃথক নামকরণ করেছিলেন। যেমন- ইকলিম-ই-বাঙ্গালাহ, আরসা-ই-বাঙ্গালাহ্ এবং দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ। ডঃ কে.আর.কানুনগো ইকলিম-ই-বাঙ্গালাহকে সোনারগাঁও অঞ্চল বা পূর্ববঙ্গ, আরসা-ই-বাঙ্গালাহকে সাতগাঁও অঞ্চল বা দক্ষিণ বঙ্গ এবং দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহকে সংযুক্ত সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করেছেন।[১৫] ইলিয়াস শাহী বাংলার শাসনকেন্দ্র তিনটি যেমন- সাতগাঁও, লখনৌতি ও সোনারগাঁও এর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি মূলত বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের ভিত্তি স্থাপন করেন। Dr. Muhammad Abdur Rahim তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এ-রূপে সুলতান ইলিয়াস শাহ্ 'বাঙ্গালা'র প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিগণিত হন। এর ফলে বাংলার সমগ্র এলাকা একত্রীভূত হয় এবং সমস্ত বাঙালী জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হয়। এ সময় থেকে তেলিয়াগর্হি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ বাঙ্গালা, এটি একটি সাধারণ নামে পরিচিত হয়।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, মুসলিম শাসন প্রাক্কালে বাংলার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অঞ্চলকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা সফলকাম হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকগণ বাংলার ভৌগোলিক আয়তন ও সীমারেখা সম্বন্ধে বর্ণনা করেন যে, দ্বিতীয় ইকলিমে[১৭] সুবে[১৮] বাংলা অবস্থিত । চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগিরী[১৯] অর্থাৎ পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরে পর্বত থেকে সুবার দক্ষিণ সীমান্তস্থ সরকার মানদারান[২০] পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ প্রস্থ।

বাদশাহ আকবরের শাসন প্রাক্কালে কালাপাহাড়[২১] কর্তৃক সুবে উড়িষ্যার বিজয়ের পর উক্ত সুবা দিল্লীর বাদশাহর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সুবে বাংলার অংশ এ অঞ্চলকে করা হয়। এতে সুবে বাংলার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৪৩ ক্রোশ ও প্রস্থে ২০ ক্রোশ বৃদ্ধি পায়। এ সুবার উত্তর ও পূর্বদিকে উচ্চ পর্বতমালা ও দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্র এবং পশ্চিমে সুবে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ঈশা খান সম্রাট আকবরের শাসন প্রাক্কালে পূর্ব দিকের প্রদেশ সমূহ জয় করেন এবং সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন।[২২] আবুল ফজল 'সুবে বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখা সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে 'বাংলা দ্বিতীয় (ইকলিম) অঞ্চলে অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম থেকে গর্হি (তেলিয়াগর্হি) পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য চারশত ক্রোশ। এর পূর্ব ও উত্তর সীমায় পাহাড়-পর্বত, দক্ষিণের সাগর ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। এ দেশের প্রান্ত সীমায় রয়েছে কামরূপ এবং আসাম।[২৩] সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর 'তুজুক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন বাংলা দ্বিতীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং এটা একটা বিশাল দেশ। সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগর্হি পর্যন্ত ৪৫০ ক্রোশ এর দৈর্ঘ্য এবং উত্তরের পর্বতমালা থেকে মান্দারান অঞ্চল পর্যন্ত ২২০ ক্রোশ এর প্রস্থ ।[২৪]

মোগল যুগে সুবে বাংলা সাতগাঁও, মাহমুদাবাদ, ফতেহাবাদ, খলিফাবাদ প্রভৃতি ১৮টি সরকার বা বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে ছিল বাংলাদেশ।[২৫] বৃটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে বাংলা পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন- বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম। আর এ পাঁচটি বিভাগের অধীনে ২৭টি জেলা ছিল।[২৬] অর্থাৎ প্রকৃত বাংলা বলতে এই পাঁচটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাকেই বোঝান হতো। বিভিন্ন জেলাগুলো প্রত্যেকটি বিভাগের অধীনে ছিল। যেমন- বর্ধমান বিভাগ- বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া প্রভৃতি।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ - চব্বিশ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া, যশোর, মুর্শিদাবাদ ও খুলনা ।

রাজশাহী বিভাগ- রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি।

ঢাকা বিভাগ- ঢাকা, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

চট্টগ্রাম বিভাগ - চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ইত্যাদি।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া উত্তর বঙ্গে কুচবিহার ও পূর্ব বাংলার সীমান্তে এ দু'টি দেশীয় রাজ্য ছিল। এ সময়ে বর্তমান ভারতের আসাম ও বিহার প্রদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের কিছু কিছু অংশ যেমন- সিলেট, কাছাড়, গোয়াল পাড়া, মানভূম জেলা ও সিংহভূমের ধলভূম পরগণা সংযুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালের আগে বঙ্গদেশ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের বৃটিশ শাসনের একটি প্রদেশ।[২৮]

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর সমস্ত বাংলা দু'ভাগে বিভক্ত হয়। যেমন- পশ্চিমভাগ অর্থাৎ- পশ্চিম বঙ্গ যা ভারতের আওতাভুক্ত হয়। পূর্বভাগ অর্থাৎ- পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।[২৯] সে সময় এর সীমানা ছিল উত্তরে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং বার্মা। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গ।[৩০]

পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ পূর্ব পাকিস্তান তথা উপরিউক্ত সীমানা সমৃদ্ধ ভূ-খণ্ডই স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি লাভ করে।

ভূ-প্রকৃতি ও গঠন

আইন-ই-আকবরীতে বাংলার যে ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে ভারত বিভাগ পূর্ব (১৯৪৭ সালের পূর্বের বাংলাদেশ) বাংলার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার উত্তর দিক দিয়ে বয়ে গেছে হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী। বঙ্গোপসাগর বিধৌত এর দক্ষিণাঞ্চল এবং বিখ্যাত 'রয়েল-বেঙ্গল টাইগার' ও অন্যান্য বণ্য প্রাণীর আবাসভূমি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবন এর দক্ষিণে শেষ সীমারেখা টেনেছে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে এ প্রদেশকে উর্বরা ও শস্য-শ্যামলা করে তুলেছে। এর পূর্ব সীমায় গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিকা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বতরাজি অবস্থিত। খরস্রোতা গঙ্গা, মহানন্দা ও এদের বহু শাখা-প্রশাখা এর পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত এবং রাজমহলের পাহাড়, ঝাড়খন্ডের বনাঞ্চল, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম, মানভূম ও ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমি এর পশ্চিম সীমানা বেষ্টিত।[৩১]

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনন্য। বাংলা হলো পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলের বেশীরভাগ ভূ-ভাগই পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, ভাগীরথী ইত্যাদি নদ-নদী বিধৌত পলিদ্বারা গঠিত। অধিকাংশ বাংলার ভূ-ভাগই অপেক্ষাকৃত নতুন বা নব্যভূমি। তবে সম্পূর্ণ ভূ-ভাগই নতুন নয়। পশ্চিমাংশের বেশ কিছু অঞ্চল প্রাচীন বা পুরাভূমি বিদ্যমান। বাংলার পশ্চিমাংশের প্রাচীন ভূমি রাজমহলের দক্ষিণ থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহলের সাঁওতাল

Dhaka University Institutional Repository

পরগণা, মানভূম, সিংহভূম, ধনভূমের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল এ প্রাচীন ভূমির অন্তর্গত।[৩২] উত্তর বাংলায় এ প্রাচীন ভুমির একটা অংশ অপরাংশের চেয়ে কিছুটা উঁচু। উত্তর রাজশাহী, বগুড়া, পূর্ব দিনাজপুর এবং রংপুরের পশ্চিমাংঞ্চল ব্যাপী অপেক্ষাকৃত উঁচু অঞ্চলই হলো ইতিহাস বিখ্যাত বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রস্থল। বাংলার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের প্রাচীন ভূমির বন্ধনীটুকু বাদ দিলে বাকী সবটুকু অঞ্চলই (চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত) নব্যভূমি এবং এটা গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখা প্রশাখা নদী পলিমাটি দ্বারা বিধৌত। এদিকে সিলেটের পূর্বাঞ্চল ময়ননসিংহের মধুপুর গড়, ঢাকার ভাওয়ালের গড়, পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত পূর্ববাংলার সবটুকু ভাগই নব্যভূমি অঞ্চল। তবে এর মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এর সমতল ভাগও সিলেটের অধিকাংশ ভূমি তুলনামূলকভাবে প্রাচীন। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনার সমতল ভূমি অঞ্চল আরও নব্যভূমি অঞ্চল। সে কারণে এ অঞ্চলকে নাব্য মণ্ডল বলা হয়।[৩৩] সুতরাং ভৌগোলিক গঠনের দিক থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকের কয়েকটি প্রত্যন্ত ব্যতীত বাংলাদেশ একটি বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ও পলিমাটির দেশ।

প্রকৃতি ও জলবায়ু

নানাদিকে বিকীর্ণ অসংখ্য নদী-নালা ও পলিমাটির দেশ বাংলার সমতল ভূমি বছরে প্রায় অর্ধেক সময় জলে প্লাবিত থাকতো। বাংলাদেশকে নদ-নদী প্রাকৃতিক শোভায় সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছে। বর্ষার মৌসুমে নদীগুলোর দু'কূল ছেপে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এদেশে বর্ষাকাল প্রায় ছ'মাস ব্যাপী স্থায়ী হয়। এর আবহাওয়া বাংলাদেশের অন্যতম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। বিষুব রেখার উত্তরে দেশটি অবস্থিত। এদেশের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি চলে গেছে। এ কারণে এখানকার আবহাওয়া মৃদু ও নাতিশীতোষ্ণ । মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রভাবিত। তাই এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং বায়ুমণ্ডলে রয়েছে আর্দ্র জলীয় বাষ্পপূর্ণ । ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে প্রলয়ংকারী আকার ধারণ করে। এতে করে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি সাধিত হয়।[৩৪]

আবুল ফজলের মতে এ প্রদেশে গ্রীষ্মের গরম ছিল মৃদু এবং শীতকাল ছিল ক্ষণস্থায়ী। মে মাস হতে বৃষ্টিপাত শুরু হতো। ছ'মাস কিংবা আরও বেশী সময় ধরে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতো। সারাদেশে সে সময় জলপ্লাবিত থাকতো।[৩৫] অদ্যাবধি এ আবহাওয়া পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । ফলে এ অঞ্চলকে বলা হয় 'ভাটি' অঞ্চল বা জোয়ার ভাটার দেশ। তবে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর উপর বেশী হওয়ায় বাংলাদেশের জলবায়ুকে বলা হয় ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু।

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-প্রকৃতির প্রভাব

স্বভাবত ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া বাংলাদেশের অধিবাসীদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এদেশের অধিবাসীদের উপর মৃদু আবহাওয়া প্রকৃতিগতভাবে শান্ত ও কোমল স্বভাব-সুলভ গড়ে তুলেছে। বিশেষভাবে এদেশের মানুষের মায়া মমতায় এবং তাদের পারিবারিক জীবনের ঘনিষ্টতায় এ প্রকৃতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়।[৩৬] সুতরাং সহস্র নদীর স্রোত ধারায় বিধৌত উর্বরাভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রকৃতিগতভাবে এ দেশের মানুষকে যেমন হাসি, খুশি, কোমল হৃদয় যেন শান্ত প্রকৃতির করেছে, তেমনি কোমল অন্তকরণের চমৎকার মায়া-মমতায় তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সম্পর্ককে মধুময় করে তুলেছে। তাদের আত্মীয় -স্বজনদের প্রতি অপরিমিত স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা যেন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে একান্নভুক্ত পরিবার সৃষ্টি করেছে। কেবলমাত্র তাই নয়, নদীর প্রচণ্ড স্রোত, ঝড় -ঝঞ্জা, প্লাবন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদি যেন এ দেশের মানুষকে দুর্দান্ত সাহসী ও শক্তিশালী করে তুলেছে। "বাংলাদেশ এখন যেমন, অতীতেও তেমনি বেশিরভাগ লোক গ্রামে বসবাস করতো। এর মূলে রয়েছে প্রকৃতির উদার অবদান; কেননা বাঙালীদের কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনে প্রকৃতির বদান্যতা ছিল অপরিসীম।"[৩৭] বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশই এদের অধিবাসীদের খাদ্য, পোশাক -পরিচ্ছদ, বাসস্থান, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতা দান করেছে। ধান এদেশের প্রধান কৃষিদ্রব্য, আর প্রচুর মাছ নদী-নালা খাল-বিল সরবরাহ করেছে। সুতরাং ভাত,মাছ বাংলার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। আবার এদেশের মানুষকে বন্যা,ঝড় ,তুফান, নদীর ভাঙ্গন ইত্যাদি প্রকৃতির বিরূপতার সাথে যুদ্ধ করেই বেঁচে থাকতে হয়। সুতরাং এ কারণেই সংগ্রামশীলতা বাংলার মানুষের প্রকৃতিতে আর এক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।[৩৮]

আবুল ফজল তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, বাংলার অসংখ্য নদ-নদী ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা , পদ্মা, মেঘনা, করতোয়া, মহানন্দা এবং যুগ যুগ ধরে এদের শাখা-প্রশাখা বা বাঙালী অধিবাসীদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৩৯]

ধর্ম

জাতিগত দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় যে, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণস্থল হলো বাংলায়, বাঙালীরা মৌলিকভাবে সমজাতীয় নয়। তারা নানান জাতির সংমিশ্রণ । সুতরাং এখানে বিভিন্ন ধর্ম দৃষ্টিগোচর হয়। তবে বেশিরভাগ লোক ইসলাম ধর্মের। অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন মুসলিম। অবশিষ্ট হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান।[৪০] বাংলা এ দেশের ভাষা ও মুখের ভাষা। এ ভাষায় নিজস্ব ছাপার অক্ষর ও উপভাষা রয়েছে। এ দেশের বাংলা ভাষা হাজার বছরের অধিককাল থেকেই প্রতিষ্ঠিত ।[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১ Muhammad Abdur Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol.I, (1201-1576 A.D.), Pakistan Historical Society, Karachi, 1963, p. 1

২ কে.এম.রাইহু উদ্‌দীন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী,ঢাকা, ১৯৯৬,পৃ. ২২

৩ Dr. M.H. Khan, And Early History and Technical of Paper Manufacture in Bengal, Vol. XII, The Eastern Librarian ,Dhaka-1986, p. 21

৪ আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ.১৩; কে.এম. রাইহু উদ্‌দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৫ The World Book Encyclopedia , Vol. II, U.S.A., 1988, p. 58

৬ Encyclopedia Britannica, 15th edition, Vol. II, Chicago, 1973-74, p.694

৭ ঢাকা ডায়েরী, ১৯৯৯, পৃ. ৩

৮ ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১

৯ কে.এম. রাইহু উদ্‌দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪

১০ কে.এম. রাইহু উদ্‌দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২. Dr. A.K.M. Shamsul Alam, Sculptural Art of Bangladesh, p. 22.; আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১১ কে.এম. রাইহু উদ্‌দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১২ ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ, পূর্বোক্ত , পৃ .১

১৩ এ এফ এম আব্দুল জলীল, সুন্দর বনের ইতিহাস, লিঙ্কম্যান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃ. ৫৮

১৪ কে.এম. রাইহু উদ্‌দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১৫ Sir Jadu-nath Sarkar, (ed.), History of the Bengal, Vol. 11, Muslim period, (1200 -1757), published by The University of Dacca, Dacca, 1948, p. 67

১৬ Hasan Askari, Bengal past and present, Vol. LXVII, Calcutta, p. 38; Muhammad Abdur Rahim, op. cit, p. 6; দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জুলাই, ১৯৯৩

১৭ মুসলমান ভূগোলবিদ ও জ্যোতির্বিদগণ সমগ্র পৃথিবীকে জলবায়ু ও আবহাওয়ার ভিত্তিতে সাত ভাগে বিভক্ত করেন । আর প্রত্যেকটি আবহাওয়াভুক্ত অংশকে এক একটা 'ইকলিম' নাম দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইকলিম বা আবহাওয়াভুক্ত এই বাংলা অঞ্চল ছিল।
আইন-ই-আকবরী, জ্যারেট কর্তৃক অনূদিত, ৩য় খণ্ড, পৃ৪৩। উদ্ধৃত, গোলাম হোসেন সলীম, রিয়াজুস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ, আকবর উদ্‌দীন অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৮

১৮ সুবা নামের উৎপত্তি বাদশাহ আকবরের শাসনামলে সূচনা হয়। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে প্রশাসনিকভাবে দশশালা বন্দোবস্তের সময় রাজস্ব বিভাগগুলোকে বিভিন্ন সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। পুনরায় এ রাজস্ব বিভাগগুলোকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক রাজ বিভাগে ভাগ করেছিলেন। কিন্তু সুবা সর্বোচ্চ রাজস্ব বা প্রশাসনিক বিভাগ ছিল। যেমন- কতকগুলো সরকার নিয়ে একটি সুবা গঠিত হতো, পুনরায় কতকগুলো নিয়ম-নীতি নিয়ে একটি সরকার গঠিত হতো, কতকগুলো মহল বা পরগণা নিয়ে একটি দপ্তর গঠিত হতো। মহল বা পরগণা মোগল সম্রাটদের অধীন স্থানীয় প্রধানদের অধীনস্থ এক একটি রাজস্ব বিভাগের প্রাথমিক স্তর ছিল। আর সুবা ছিল সর্বোচ্চ স্তর। আইন-ই-আকবরী , জ্যারেট কর্তৃক অনূদিত, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৫, তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ১৪৮, ১৬২, উদ্ধৃত বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১৯ একটি গিরিপথের নাম তেলিয়াগিরি। এর উত্তরে গভা নদী ও দক্ষিণে রাজমহল। আগে এ গিরিপথ বাংলায় প্রবেশের জন্য সামরিক কৌশলের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আইন-ই-আকবরী (জ্যারেট), ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

২০ সরকার মানদারণের সীমানা হলো- অর্ধবৃত্তাকারে পশ্চিম বীরভূমের নাগোর থেকে রানীগঞ্জ হয়ে দামোদর নদী বরাবর বর্ধমানের উপর দিয়ে খণ্ডঘোষ, চন্দ্রকোনা, জাহানাবাদ, (পশ্চিম হুগলী জেলা) হতে রূপ নারায়ণ নদীর মুখে 'মওঘাট' পর্যন্ত বিস্তৃত। আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, (জ্যারেট) পৃ. ১৪১ উদ্ধৃত, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

২১ বাংলার সুলতান সুলায়মান কররানীর প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়, দক্ষিণ উড়িষ্যার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রসিদ্ধ বিজেতা। আইন-ই-আকবরী, (জ্যারেট) ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮

২২ গোলাম হোসেন সলীম, বাংলার ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

২৩ আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, (সরকার অনূদিত) পৃ. ১৩০-৩১; ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

২৪ সৈয়দ আহমদ খান (সম্পাদিত), তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী, বোজায়ের উর্দু অনুবাদ, পৃ. ২২৯

২৫ ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১; আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

২৬ ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১

২৭ খন্দকার ফজলে রাব্বি, বাংলার মুসলমান (মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৪-৫; Khoundkar Fuzli Rubbee, The Origin of the Musalmans of Bengal, Thacker Spink and Co., Calcutta,1895, p. 85

২৮ ডঃ ফজলুল হাসান ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ.১-২

২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৩০ Statistical Pocket Book of Bangladesh, 1987

৩১ Muhammad Abdur Rahim, op. cit. pp. 7-8

৩২ কে.এম. রাইছ উদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৩৩ কে এম রাইছ উদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৩৪ কে এম রাইছ উদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৩৫ আইন-ই-আকবরী, (সরকার অনূদিত) , ২য় খণ্ড, পৃ.১৩২; ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৩৬ কে এম রাইছ উদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৩৭ Muhammad Abdur Rahim, op. cit., pp. 33-34

৩৮ কে এম রাইছ উদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৩৯ আইন-ই-আকবরী, (সরকার অনূদিত), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩

৪০ Dr. M.H. Khan, op. cit. p. 21

৪১ S.K. Chatergy, The Origin and Development of the Bengali Language, London, 1970, p. 1

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় মুসলমানদের আগমন এবং দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় থেকে আরম্ভ করে এ দেশে মুসলমানদের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে এখানকার মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বখতিয়ার খলজীর পূর্বেও বাংলার সঙ্গে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। তাই " বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম" প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। বাংলায় মুসলমানদের আগমন কখন শুরু হয় তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষাংশে আরবীয় মুসলমান বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে পালতোলা জাহাজে চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র আরব ভৌগোলিকদের বর্ণনা এবং বাংলার নানা অঞ্চলে প্রাপ্ত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির মাধ্যমে তৎকালে বাংলায় মুসলমান আগমনের স্বরূপ সহজে নির্ণয় করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননকার্যের ফলে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে এবং কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে আব্বাসীয় খলিফাদের একটি করে আরবীয় রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটি ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে (১৭২ হিজরি) খলিফা হারুন-উর-রশীদ কর্তৃক আল মুহাম্মাদিয়া টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়।[১] ময়নামতিতে প্রাপ্ত মুদ্রাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যেহেতু প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ খননের বিস্তারিত বিবরণ এখনো প্রকাশ করে নি। সেহেতু তথ্য প্রমাণাদির অভাবে দ্বিতীয় মুদ্রাটির চিহ্নিতকরণ দুষ্কর, তাই মনে হয় এ মুদ্রাটিও আব্বাসীয় যুগের।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মুদ্রাটির উপর ভিত্তি করে অনুমান করেন যে, সেই প্রাথমিক যুগে বাংলায় আরব ধর্ম প্রচারকগণ ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন। এ সম্বন্ধে এনামুল হক বলেন, "হিন্দু সভ্যতার কোন কোন প্রাচীন কেন্দ্রে এই প্রাচীন যুগের আরব ও পারস্যের (ইরান) মুসলিম সাধক ও ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহারে খলীফার এই মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবত যিনি এই মুদ্রা সঙ্গে লইয়া তথায় প্রচার করিতে গমন করেন, তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্ত গত হইয়াছিল। যেরূপেই হউক, পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত খলীফার এই মুদ্রাটি, অন্ততঃ খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তর-বঙ্গের সহিত ইসলামের সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক আরও বলেন, " খলীফার মুদ্রাটি তাঁহারই রাজত্বকালে পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে আসিয়া পৌছিয়া থাকিবে। কেননা, তখনকার দিনে পূর্ববর্তী খলীফার মুদ্রা পরবর্তী খলীফার রাজত্বকালে চলিত না। মুদ্রা তখন ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি প্রধান নিদর্শন ছিল বলিয়াই এইরূপ বিধান দেশে প্রচলিত ছিল। তাই, লোকে অনেক সময় 'খুৎবা' (সাপ্তাহিক ধর্ম-বক্তৃতা) ও 'সিক্কার' (মুদ্রা) পরিবর্তন দেখিয়া, খলীফার পরিবর্তন মানিয়া লইত। তাহা হইলে বলিতে হয়, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদেই এই মুদ্রাটি বঙ্গে আগমন করিয়াছিল। এই মুদ্রাটি যদি ধর্মপালের রাজত্বকালে পাহাড়পুরে না-ও আসিয়া থাকে, ইহা যে খলীফা হারুন-উর-রশীদের রাজত্বের (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) অন্যূন এক শতাব্দীর মধ্যে পাহাড়পুরে আসিয়া পৌছিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কেননা, খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর, পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সেই প্রাচীন যুগে সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়াই এক দেশের টাকা অন্য দেশে যাইত। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহারে সেই সূত্রে খলীফার টাকা পৌছিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কেননা, পাহাড়পুরের প্রাচীন প্রসিদ্ধি বাণিজ্যের জন্য ছিল বলিয়া এ যাবৎ প্রমাণিত হয় নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এই মুদ্রার আমদানী হইয়াছিল বলিয়া অনায়াসে ধরা যাইত। এখন সে-অনুমান করিবার কারণ দেখা যায় না। খুব সম্ভব, এই বৌদ্ধ-বিহারটি তখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।"[৩]

ডঃ এনামুল হকের এ সকল যুক্তিকে ডঃ আবদুল করিম সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলেন, নানা কারণে ডঃ হকের উপর্যুক্ত মত গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু মুদ্রাটি খলিফা হারুন-উর-রশীদ কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়, সেহেতু এই মুদ্রা খলিফার জীবদ্দশায় বা তাঁর খেলাফতের পরে একশত বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে আনীত হয়, এমন মনে করার কোন যথার্থ কারণ নেই। এখনো দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অনেক লোক মুসলমানি আমলের সিক্কা টাকা কবচ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং মুসলমানদের বাংলাদেশ বিজয়ের পরে যে এই মুদ্রা বাংলাদেশে আনীত হয় নি, এ কথা জোর করে বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, পাহাড়পুর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র থাকুক বা না থাকুক, সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্যবসার কেন্দ্রস্থল হতে এ মুদ্রা অভ্যন্তরীণ জনসমাবেশে নীত হওয়া অসম্ভব নয়। তৃতীয়ত, খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে কোন মুসলমান সাধক ও ধর্ম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন কিনা বা আসা সম্ভব কিনা, তা এখনো প্রমাণ সাপেক্ষ এবং চতুর্থত, এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, পাহাড়পুরের মুদ্রাটি ধ্বংসস্তূপের মাটির উপরিভাগে আবিষ্কৃত হয়। খননকৃত বৌদ্ধ বিহারের কোন নিম্নস্তরে পাওয়া যায় নি।[৪] সহজেই বোঝা যায় যে, মুদ্রাটি বৌদ্ধ কীর্তি ধ্বংসের পরেই পাহাড়পুরে নেওয়া হয়। মুদ্রাটি বাংলাদেশে এখন কিভাবে প্রবেশ

Dhaka University Institutional Repository

করে, তা সঠিকভাবে জানার উপায় নেই; কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও এ মুদ্রাটি তেমন সাহায্য করে না।"[৫]

রংপুর জেলার গদগ্রামে সাম্প্রতিক একটি ফার্সি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে । যা মুসলমানদের উত্তর বাংলায় বসতি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬] তবে ডঃ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী বলেছেন, " শিলালিপির নির্ভুল পাঠ থেকে জানা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে এটি মোঘল আমলের শেষ দিকের।[৭] ফলে ঐ প্রাচীন যুগের অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে রংপুর মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিল বা উত্তর বাংলায় মুসলমানদের কোন বড় বসতি ছিল, এসকল প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য একথা প্রমাণ করে না।"[৮]

খ্রিষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে বড় ধরনের কোন মুসলিম বসতি রংপুরে ছিল না, প্রাসঙ্গিক কারণেই এ মন্তব্য মেনে নেয়া যায় না। কারণ রংপুর শহর থেকে প্রায় ৪৮.৩০ কিলোমিটার দূরে ১৯৮৬ সালে লালমনিরহাট সদর থানার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার 'মজদের আড়া' নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ৬৯ হিজরিতে পাওয়া গেছে। যেটি এ যাবৎ প্রাপ্ত বাংলাদেশে ইসলামের প্রাচীনতম নির্শন। ... ... নানা রকম ফুল, নকশা বিশেষ ধরনের ইটগুলোতে তা রয়েছে এবং আরবী অক্ষরে কালিমা তায়্যিবাসহ ৬৯ হিজরি সন লেখা রয়েছে। ... ... ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে এই মসজিদকে কেন্দ্র করে এখানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল। আর এ এলাকাটি 'মজদের আড়া' নামে সুপরিচিত ছিল।[৯]

সুতরাং ধারণা করা হয় যে, ইসলামের প্রারম্ভিক কালে উত্তর বাংলা তথা রংপুর মুসলমানদের শাসনাধীনে না আসলেও মুসলমানদের একটা বড় ধরনের বসতি গড়ে উঠেছিল সেখানে তাতে কোন দ্বিধা নেই। আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাদ্‌জা-তুরে' বর্ণিত কাহিনী 'চট্টগ্রামে ইসলাম' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে আবদুল করিম এভাবে উল্লেখ করেছেন- "এই সময়ের শেষভাগে কান-রা-দজা-গীর বংশধর মত্যাইঙ্গত চন্দয়ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা ২২ বৎসর রাজত্ব করার পর মারা যান। কথিত আছে যে, তাঁহার সময়ে (৭৮৮-৮১০ খ্রী:) কয়েকটি কু-ল অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ রনবী দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভাঙ্গিয়া যায় এবং জাহাজের মুসলমান আরোহীদিগকে আরাকানে নিয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন।"[১০] আরাকানের "রনবী" (আধুনিক রামরী) দ্বীপের আরবীয় মুসলিম বণিকদের জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনার সাথে প্রাপ্ত এ মুদ্রাগুলোর সম্পৃক্ত থাকা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে, সেগুলোতে মুদ্রাগুলো উল্লেখিত সময়েই (৭৮৮ খ্রি:) বাংলায় নীত হয়েছিল। ৭৮৮ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রনবী দ্বীপে জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনাটিও ঘটে। আরব বণিকদল সম্ভবত বাংলার বৃহত্তম নদী গঙ্গার উপকূল বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যবসা-

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্য করতেন এবং তাঁদের দ্বারাই এ মুদ্রাটি পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধ বিহারে আমদানি হয়। শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য করাই আরব বণিকদের লক্ষ্য ছিল না। একই সাথে তাঁরা নিজেদের উপর অর্পিত ইসলাম প্রচারের দায়িত্বও পালন করে যেতেন এবং তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় ও মানবিক এ কাজগুলোকে কর্তব্য বলে মনে করতেন। সুতরাং প্রাপ্ত মুদ্রা সম্বন্ধে ডঃ হকের মন্তব্যকে একেবারে অমূলক বলে অবজ্ঞা করা যায় না। আরাকানী ঘটনাপঞ্জি হতে অবগত হওয়া যায় যে, ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা সুলত ইঙ্গ চন্দয়ত "সুরতন" জয় করে সে দেশে একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাজার উক্তি অনুযায়ী তার নাম হয় চেত্তাগৌং অর্থাৎ যুদ্ধ করা উচিত নয়।[১১]

এ সময় আরাকান রাজা কার বা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অনুচিত বলে মনে করেছিলেন ? মুসলমানদের সঙ্গে ? তখন চট্টগ্রামে কি আরবীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল ? আরবদের প্রভাব প্রতিপত্তি আরাকান রাজ্যের জন্য কি হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছিল ? এসব সম্ভাবনা কাল্পনিক বলে মনে করা যায় না। সে জন্য কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন "সুরতন" শব্দ "সুলতান" শব্দের আরাকানীরূপ আর তদানুযায়ী তারা বলেন, তৎকালীন সময়ে চট্টগ্রামে মুসলমানেরা একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন।[১২]

এ ব্যাপারে আবদুল করিম একমত হতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, " চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে আরবের মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু চট্টগ্রামে মুসলমানেরা আরব রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল বলা অতিরঞ্জন বৈ কিছু নয়। একটি মাত্র শব্দ "সুরতন" যাহার অর্থ পরিষ্কার নয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, আরাকান বংশাবলী পড়িয়া মনে হয়, "সুরতন" শব্দটি "সুলতান" এর বিকৃত রূপ নয়, বরং ইহা অধুনালুপ্ত কোন এক স্থানের নাম বহন করে।[১৩] গঙ্গার মোহনার সন্নিকটে চট্টগ্রাম বন্দর অবস্থিত ছিল। গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলে এর (চট্টগ্রাম) অবস্থানের দরুন আরব বণিকগণ চট্টগ্রামের নাম দিয়েছিল 'শাত-আল-গঙ্গা (বদ্বীপ বা গঙ্গার চরন সীনা), যা কালক্রমে চাটগাঁও চট্টগ্রাম নামে রূপান্তরিত হয়।[১৪] গঙ্গার মোহনায় উপকূলভাগে অবস্থিত থাকায়, এটা ছিল খুবই সুবিধাজনক বন্দর। এই বন্দরকে আরব বণিকগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত করে। এ দেশের মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে, চট্টগ্রামে তাদের নিজেদের কিছু সংখ্যক লোকও অবস্থান করে। এই বণিকদল শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও সম্পদশালী হওয়ায় বন্দর শহরটিতে প্রভাবশালী হয়ে উঠে। বিদেশে নিশ্চয়ই একজন দলপতির অধীনে আরব বণিকগণ দলবদ্ধভাবে বাস করতো। এ আরব দলপতি ছিলেন 'থু-রা-তন'।

আরাকান-রাজ 'সু-লা-তারিং' স্যান-দা-য়্যা (৯৫১-৫৭ খ্রি:) তার অভিযানে একেই পরাজিত করেন বলে দাবি করেন। ডঃ এনামুল হকের 'থু-রা-তন' শব্দটির সুলতান হিসেবে পাঠ কল্পনা-প্রসূত বলে ফেলে

Dhaka University Institutional Repository

(উড়িয়ে) দেয়া যায় না।[১৫] আরব বণিকদের এ প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতেও তাদের প্রভাব এখনো পরিলক্ষিত হয়। যেমন চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহারও আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। একাধিক ''কদম রসুলের'' অস্তিত্ব চট্টগ্রামে দেখা যায়।[১৬]

এছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন- আল-করন, সুলুক বহর, বাকলিয়া ইত্যাদি আরবী নাম এখনো বহন করে।[১৭] এ সবই চট্টগ্রাম তথা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম যোগাযোগের প্রমাণ। আরবীয় বণিকদের চট্টগ্রামে বিশেষ করে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগর ছিল তাদের সমুদ্র পথে পূর্বদিকে যাতায়াতের একমাত্র পথ। এদেশ থেকে আরব বণিকদের মাধ্যমে মসলা, সূতি, রেশমী বস্ত্র, হাতির দাঁত, নানাবিধ রত্ন, এ সব সামগ্রী চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানি হতো।[১৮] সমগ্র আরবে তখন ইসলামের আবির্ভাব একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সে জন্য বণিকদের মাধ্যমে এমন একটা সাড়া জাগানো সংবাদ বিদেশের মাটিতে অর্থাৎ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আরবীয় উপনিবেশগুলোতে পৌছেছে তা অতি সহজেই অনুমেয়। বুযুর্গ বিন শাহরিয়ার মতে, 'আরব দেশে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে সরন্দীপবাসীরা রাসূল (সা:) এর কাছে দূত পাঠান। কিন্তু হযরত উমর (রা:) এর খিলাফতকালে এ দূত মদিনায় পৌছান। হযরত ওমর (রা:) এর সঙ্গেই সে দূতের সাক্ষাৎ হয়। ইসলাম, ইসলামের নবী (সা:) এবং সাহাবীদের সম্বন্ধে আলোচনা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ঐ দূত বেলুচিস্তানের নিকট 'মাকরান' নামক অঞ্চলে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর হিন্দু সঙ্গী সরন্দীপ পৌছে তাঁদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। বিস্তারিত জেনে মানুষের মাঝে ইসলাম সম্বন্ধে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফিরিস্তার মতে, ঐ সময় রাজা ইসলাম গ্রহণ করে।[১৯]

এ ঘটনার মূলে কতটুকু সত্য নিহিত রয়েছে তা বলা দুষ্কর। সত্য-মিথ্যা ঘটনার মূলে যাই থাক না কেন তবে এটা নিশ্চিত যে, এ সকল ঘটনা হতে বাংলাদেশ পৃথক ছিল না। রিচার্ড সায়মন্ড স্বীয় ভাষায় - "The Culture that now Developed in Bengal was entirely different from that of the Hindus. The ports of this country, especially Chittagong had come under the influence of the Arabs as early as the Seventh century A. D., and many of the Arab voyagers and traders had left a permanent impress upon the area. Islam, therefore, took root very easily in this receptive soil," and the resultant culture was greatly influenced by that of Islamic countries.[20]

Dhaka University Institutional Repository

আরব মুসলিম ভৌগোলিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মুসলমান আরব বণিকদের বাণিজ্যপথ কিংবা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে সুলায়মানের নাম উল্লেখযোগ্য । 'সিলসিলাতুত- তাওয়ারীখ' গ্রন্থ ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়।[২১] এ বিষয়ে সুলায়মানের পর আরও কয়েকজন ভৌগোলিক বিবরণ দেন। কিন্তু সকলেই সুলায়মানের 'সিলসিলাতুত তাওয়ারীখ' এর উপর নির্ভরশীল। ইবনে খুরদাদবিহ (মৃ. ৯১২ খ্রি:) তাঁর 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে সর্ব প্রথম আরবদেশ থেকে চীনদেশ পর্যন্ত মুসলমান বণিকদের বাণিজ্য পথের বর্ণনা দেন। তাছাড়া আল মাসুদী (মৃ. ৯৫৬ খ্রি:) এবং আল্-ইদ্রিসী (জন্ম. একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে) প্রমুখ ভৌগোলিকবিদগণ ইবনে খুরদাদবিহ্কে অনুসরণ করে আরব বণিকদের বাণিজ্য পথের বিবরণ দেন।[২২] তাদের বিবরণ মতে, আরাকান থেকে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী বিকীর্ণ অঞ্চলটি খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে আরব বণিকদের কর্ম তৎপরতায় সরগরম হয়ে উঠেছিল।

এ সকল আরব ভৌগোলিক এবং বণিকগণ তাদের বিবরণে এমন একটি দেশ ও বন্দরের নাম বর্ণনা করেছেন, যে দেশকে বাংলাদেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, আর বাংলাদেশের উপকূল বন্দরকে একটি সমুদ্র বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বন্দর সম্পর্কে সর্ব প্রথম আলোচনা করা যাক। পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহের সাথে আরব মুসলিম বণিকগণ সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতো এবং তারা বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের যাত্রা পথে আসতো। তারা তাদের পণ্যের বেচা-কেনা করতো বাংলাদেশের বন্দরে।

এখান হতে শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) হয়ে চীন দেশে পৌঁছতো। আরবদেশ হতে চীন পর্যন্ত সমুদ্রোকূলবর্তী ব্যবসায়িক স্থানগুলোর নামকরণ করেছেন আরব ভৌগোলিকগণ। তাদের দেওয়া বর্ণনা থেকে অবহিত হওয়া যায় যে, আরব বণিকরা তাদের প্রাচ্যযাত্রায় ' সমন্দর', 'ওরনাসীন[২৩] বা রোসাঙ্গ 'আবিনা' বা বার্মা পরিদর্শন করে।

এখানে 'সমন্দর' নামটি উল্লেখযোগ্য। আরব ভূগোলবিদদের প্রদত্ত সমন্দর বন্দরের বর্ণনা আলোকপাত করলে জানা যায় যে, এটা বাংলার উপকূল অঞ্চলের একটি বন্দর ছিল। ইব্নে খুরদাদবিহ্ (মৃ. ৯১২ খ্রি:) লিখেছেন, ''সমন্দর চাউল উৎপাদন করে এবং 'কামরূপ' ও অন্যান্য থেকে ১৫ বা ২০ দিনের নদীপথে এ স্থানে ঘৃত কুমারী কাঠ আমদানি করা হয়।[২৪]

'সমন্দর' সম্বন্ধে আল-ইদ্রিসী আরও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, সমন্দর একটি সমৃদ্ধশালী স্থান, বাণিজ্য কেন্দ্র ও একটি বড় শহর। এস্থানে (ব্যবসা-বাণিজ্যে) প্রচুর লাভবান হওয়া যায়। কনৌজের অধীনে এ বন্দরটি। এটি এমন এক নদীর তীরে অবস্থিত কিংবা কাশ্মীর থেকে উৎপন্ন। এখানে

Dhaka University Institutional Repository

চাউল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তথা গম পাওয়া যায়। পনের দিনের ব্যবধানে অবস্থিত কামরুত থেকে এখানে চন্দন কাঠ এমন নদী পথে আনয়ন করা হয়, যার পানি সুমিষ্ট। উৎকৃষ্টতর চন্দন কাঠ এ দেশের। যার ঘ্রাণ মনোরম। কারণ পর্বতমালায় জন্মায় তা। এ শহরের একদিনের ব্যবধানে একটি দ্বীপ রয়েছে- যাতে অনেক লোক বসবাস করে এবং সেখানে সমগ্র দেশের ব্যবসায়ীরা যথারীতি যাতায়াত করে। সিংহল দ্বীপটি চার দিনের দূরত্বে অবস্থিত। কাশ্মীর নগরী সমন্দর থেকে উত্তর দিকে সাত দিনের ব্যবধানে অবস্থিত। এ নগরী ভারতের সর্বত্র সমাদৃত এবং এটি কনৌজের রাজার আয়ত্ত্বাধীন। কাশ্মীর থেকে কামরুত চারদিনের ব্যবধান এবং কাশ্মীর থেকে কনৌজ প্রায় সাত দিনের ব্যবধানে অবস্থিত।[২৫] এখানে সমন্দর বলা হয়েছে মিঠা পানিকে। এ সমন্দরই শুধুমাত্র স্থান যাকে বাংলার উপকূলীয় কোন স্থানের সাথে অভিন্ন মনে করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে A. H. Dani বলেছেন, "আরব ভৌগোলিকদের সমন্দর ছিল বাংলার উপকূলীয় কোন স্থানে অবস্থিত। খুব সম্ভব এটা মেঘনা মোহনায় অবস্থিত।"[২৬]

তাই বহু যুক্তি প্রমাণ দিয়ে ডঃ এম.এ. রহিম প্রমাণ করে বলেন যে, আরব দেশীয় এ ভূগোলবিদদ্বয়ের (আল-ইদ্রিস ও ইব্‌নে খুরদাদবিহ্) মতে, 'কামরুত' বা 'কামরুন' অঞ্চল হতে নদীপথে এ সমুদ্র বন্দর ছিল ১৫ হতে ২০ দিনের পথ। এ স্থানকে আল ইদ্রিসী 'কামরুত' এবং খুরদাদবিহ্ 'কামরুন' নামে অভিহিত করেন। তবে তাদের উভয়ের আলোচনার মধ্যে মিল রয়েছে যে, এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি-যোগ্য ঘৃতকুমারী কাঠ উৎপাদন করে। 'কামরুত' ও 'কামরুন' শব্দদ্বয় কামরূপেরই অপভ্রংশ। আরব দেশীয় ভূগোলবিদগণ কামরূপের বর্ণনাই বুঝিয়েছেন।

... ... অদ্যাবধি কামরূপে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত কুমারী কাঠ উদগত হয়। এ নামও উৎপাদনের সাদৃশ্য হতে প্রমাণ হয় যে, আরব ভূগোলবিদদের 'কামরুত' বা 'কামরুন' কামরূপ ব্যতিরেকে আর ভিন্ন কোনো স্থানই নয়। কামরূপ বাংলার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার মাধ্যমে সমুদ্র ও সমুদ্র বন্দরগুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল। কামরূপ বাংলার উত্তরে অবস্থিত একটি সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত দেশ। বাংলার বন্দরগুলো ছাড়া সমুদ্রে প্রবেশের ভিন্ন কোনো পথ নেই।

সুতরাং মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের মাঝ দিয়ে সমুদ্র বন্দরের মুখে নীত না হলে কামরূপের পক্ষে ঘৃতকুমারী কাঠ-রপ্তানি করা সম্ভব ছিল না। এ পথে যাতায়াতে প্রায় ১৫ হতে ২০ দিনের সময় নিত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি ঘৃতকুমারী কাঠ রপ্তানি করা হয়ে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার মোহনায় অবস্থিত কোনো বন্দর থেকেই হয়ে থাকবে।

আরব দেশীয় ভূগোলবিদগণ লিখেছেন যে, "সমন্দর সাগর-উপকূলের প্রবেশ পথে একটি বড় নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং তা মুসালা নামক অপর একটি নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তৎকালে ব্রহ্মপুত্র

Dhaka University Institutional Repository

কামরূপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সোনারগাঁয়ের দক্ষিণে মেঘনার সহিত মিলিত হতো এবং এদের মিলিত প্রবাহ সন্দ্বীপের নিকটে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো। সন্দ্বীপের সন্নিকটে এই সমস্ত নদীগুলোর মোহনায় বিখ্যাত সমন্দর বন্দর অবস্থিত ছিল।"[২৭]

আরব ভূগোলবিদগণ এদেশকে 'রাহমী' বা 'রুহমী' নামে আখ্যায়িত করতেন। ইব্‌নে খুরদাদবিহ্ বলেন যে, রাহমী রাজ্য অবস্থিত ছিল সমুদ্রতীরে এবং 'রাহমী' ও অন্যান্য রাজ্যের মাঝে তখন যাতায়াত করতো জাহাজযোগে।[২৮] "এটি কামান রাজ্য (কামরূপ) নামে অভিহিত একটি দ্বীপরাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।"[২৯] সুলায়মানের বর্ণনা নিম্নে প্রণিধানযোগ্য ঃ

রুহমী নামক একটি রাজ্যের সীমান্তে এ তিনটি রাজ্য (জুর্জ, বলহার ও তফক) অবস্থিত, যা (রুহমী) জুর্জ রাজ্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। রাজা খুব সমাদৃত নয়। জুর্জের সাথে তিনি যেমন যুদ্ধে লিপ্ত তেমনই বলহারের সাথেও তিনি যুদ্ধে লিপ্ত। জুর্জ বলহার ও তফকের চেয়ে তাঁর অনেক বেশি সৈন্য সামন্ত আছে। কথিত আছে যে, যখন তিনি যুদ্ধে যাত্রা করেন, তাঁর অনুবর্তী হয় ৫০ হাজার হাতি।

... ... তাঁর দেশে এমন এক রকম বস্ত্র তৈরি হয় যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এ বস্ত্র এতই সূক্ষ্ম ও মিহি যে এর দ্বারা তৈরি একটা পোশাক একটা অঙ্গুরীয় ভেতর অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যায়। এ কাপড় সূতার তৈরি এবং আমরা এর একখণ্ড দেখেছি। এ দেশে কড়ির মাধ্যমে ব্যবসা চলে এবং কড়িই তার প্রচলিত মুদ্রা। তাদের সোনা, রূপা এবং চন্দন কাঠ আছে এবং সমারা (সোমরস ?) নামে একটি জিনিস আছে যার দ্বারা মাদব (মাদক ?) তৈরি হয়।[৩০]

এ স্থানে রুহমী রাজ্য মূলত পালবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপালের (৭৭০-৮১০ খ্রিঃ) রাজ্যরূপে নির্দেশ করা যায়।[৩১] বিখ্যাত ঐতিহাসিক হোদিওয়ালাই সর্ব প্রথম প্রমাণ করে বলেছেন যে, 'ধরহমী' শব্দ ভুলবশত রুহমী লেখা হয় এবং রুহমী রাজ্য পাল বংশীয় রাজা ধর্মপালের রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।' [৩২] আর এ রাজ্য চট্টগ্রাম এলাকায় অবস্থিত।[৩৩]

'রুহমী' রাজ্যের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, 'রুহমী' সম্পর্কীয় আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ যে বাংলাদেশের বেলায় প্রযোজ্য সে ব্যাপারে দ্বিমত নেই। হাতি, অত্যন্ত মিহি ও সূক্ষ্ম সুতি কাপড় (যা মসলিনের সঙ্গে অভিন্ন), গণ্ডার এবং ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে কড়ির প্রচলন, ইত্যাদি সকল সূত্রই বাংলাদেশের দিকে নির্দেশ করে।

পরবর্তী পর্যটক এবং ঐতিহাসিকদের বিবরণ যেমন ইব্‌নে বতুতার সফর নামা, মিনহাজ-ই-সিরাজের তবকাত-ই-নাসিরী এবং টমাস বাউরীর 'বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী (Countries round the Bay of Bengal) দেশসমূহের বর্ণনায়ও বাংলাদেশের অনুরূপ চিত্র ফুটে উঠে ।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

আরব বণিকগণ বিদেশ ভ্রমণে স্বপরিবারে বের হতেন না। তারা সুদীর্ঘ ভ্রমণে কোনো কোনো স্থানে যাত্রা বিরতি করতেন এবং সংশ্লিষ্ট দেশের মহিলাদের বিয়ে করতেন স্বাভাবিক চাহিদানুযায়ী। অনুমান করা হচ্ছে যে, বহু স্থানীয় মহিলা এভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ইবনে বতুতা তাঁর সফরনামায় বিবরণ দিয়েছেন যে, তিনি বাংলার ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের কলোনি আরাকানে দেখেন। তিনি দেখেন মালদ্বীপে এক বাঙালী মুসলিম রাজ বংশের রাজত্ব। তিনি বলেন, " পরমাশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এই দ্বীপপুঞ্জের (মালদ্বীপ) বাদশাহ হচ্ছেন খাদিজা নাম্নী জনৈক মহিলা। তিনি সুলতান জালাল উদ্দিন উমর ইবনে সুলতান সালাহ্ উদ্দিন সালেহ বাঙালীর কন্যা। তাঁর দাদা বাদশাহ ছিলেন; অতঃপর তাঁর পিতা বাদশাহ হন"।[৩৫]

পূর্ববঙ্গের মুসলিম আধিপত্যের ক্রমবর্ধমানতা বাংলা সাহিত্যেও ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। এ আধিপত্য এত বৃদ্ধি পায় যে, মুসলমানদের সাথে সংমিশ্রণের ভয়ে পূর্ববঙ্গের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে বহু কুলীন ব্রাহ্মণ পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় এলাকায় বসতি স্থাপন করে। বাংলা ভাষায় রচিত রামায়ণ কাব্যের লেখক চতুর্দশ শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝার মতে, এক ভয়ঙ্কর ভীতি ব্রাহ্মণদের উৎকণ্ঠিত করে তোলে, এর ফলে পশ্চিম বাংলায় তারা সুখের জীবন পরিত্যাগ পূর্বক চলে আসে। কবি আরও বলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা, যিনি দনুজমর্দন দেবের (সুলতান বলবনের সময়ে সোনারগাঁয়ের একজন জমিদার) একজন সভাসদ ছিলেন, তিনিও পূর্ববাংলা পরিত্যাগকারী ব্রাহ্মণদের একজন ছিলেন।[৩৬] এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বিজয়ের বহু আগেই পূর্ববঙ্গে ইসলামের অগ্রগতি হয়েছিল। এ অগ্রগতির মূলে ছিল আরব বণিকগণ বা অন্যান্য ধর্ম প্রচারকগণ, যারা চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গের মাঝ দিয়ে পূর্ববঙ্গে আগমন করেছিলেন।

বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে কয়েকজন মুসলিম সূফী-সাধকদের জীবন সম্পর্কে বিকীর্ণভাবে প্রচলিত লোক কাহিনী এবং কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে কোন কোন পণ্ডিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এসব দরবেশ ইখতিয়ার উদ্‌দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এ রকমের কাহিনীতে দরবেশদের কারামত তথা অতি মানবীয় শক্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যুক্তি সঙ্গত কারণেই আধুনিক পণ্ডিতদের নিকট এ সকল রহস্যময় কাহিনীগুলো গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কেবলমাত্র এসকল উপকরণ স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাসের গভীরতা এবং সাধারণভাবে তাদের উপর সাধকদের প্রভাব দেখাবার জন্যই রাখা হয়েছে। বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে এবং পরে যে সকল সূফী-দরবেশ বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে এসেছিলেন বলে বিভিন্ন কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি রয়েছে তাদের কয়েকজন হলো নিম্নরূপ:

Dhaka University Institutional Repository

বাবা আদম শহীদ (Baba Adam Shahid)

সুবিখ্যাত ইসলাম প্রচারক সূফী-দরবেশগণের মধ্যে বাবা আদম শহীদ সর্ব প্রাচীন বলে অনুমেয়। সম্ভবত তিনি ছিলেন জাতি হিসেবে তুর্কী। ইরানের কোন এক শহরে জনৈক পীরের নিকট তিনি দীক্ষা নিয়ে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। অতঃপর স্বীয় পীরের আদেশক্রমে পূর্ব ভারতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অন্যান্য দরবেশের মতই তিনি সমুদ্র পথে বাংলায় আসেন। তিনি কোথায় অবতরণ করেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে তিনি প্রথমে মহাস্থান গড়ে আস্তানা স্থাপন করেন আর এখানে বড় একটি দিঘি খনন করেন। যেটি আদম দিঘি নামে সুপরিচিত।

বাবা আদম বিক্রমপুরের রাজা বল্লাল সেনের সময় (১১৫৮-১১৭৯ খ্রি:) এদেশে আসেন। বাংলায় তাঁর শাসনকালে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং আভিজাত্যের বীজ হিন্দুদের মাঝে বপণ করা হয়। অহিন্দুদের বিশেষ করে বাংলাদেশের পূর্ব অধিবাসী বৌদ্ধও উদীয়মান ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলমানদেরকে সেন রাজারা সুনজরে দেখেন নি। তাদের উপর নানা রকম নিগ্রহ চালানো হতো। বাবা আদম এ নিগ্রহের কথা শুনে বিক্রমপুরে আগমন করেন।[৩৭] তাঁর সম্পর্কে জনরব রয়েছে যে, তিনি সাথে কিছু সশস্ত্র সহচর নিয়ে আসেন আর যেখানেই তিনি গিয়েছেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।[৩৮]

কথিত আছে যে, তিনি (আদম শহীদ) যখন মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন, তখন রামপালের অনতিদূরে কানাইচং নামক গ্রামে একজন মুসলমান বাস করতো। সেই মুসলমান তার ছেলের জন্ম উপলক্ষে একটি গরু জবেহ করলে তখনকার হিন্দু রাজা বল্লাল সেন তাঁর উপর নির্যাতন শুরু করেন। তখন সেই মুসলমান ভদ্রলোক মক্কা শরীফে গিয়ে এ ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা দেন। ধর্মীয় সহমর্মিতা নেই এমন একটি দেশের কথা শুনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হন আর বাংলায় আগমন করেন ছয় থেকে সাত হাজার শিষ্যসহ। তিনি রামপালের নিকট শিবির স্থাপন করে গরু কুরবানি করতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে রাজা বল্লাল সেনের সাথে তার সংঘর্ষ বাঁধে। ফলে ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে বাবা আদম শহীদ শেষ অবধি নিহত হন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এক অদ্ভুত লীলায় রাজাও সপরিবারে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন করতে বাধ্য হন।[৩৯] " রাজার হস্তে নিহত হয়ে দরবেশ বাবা আদম 'শহীদ' উপাধি লাভ করলেন, আর বল্লালের ভাগ্যে জুটল 'পোড়া রাজা' উপাধি"।[৪০] এ উপাধি বিশেষণেই রাজা বল্লাল অদ্যাবধি জনগণের মধ্যে পরিচিত হয়ে আসছেন। সর্বজনমান্য এ সূফী দরবেশ ঢাকা বিভাগের মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপালে চির-নিদ্রায় শায়িত আছেন। যেটি বাবা আদমের সমাধিরূপে পরিচিত। তা একটি মসজিদের সম্মুখে

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান। মসজিদটিতে একটি আরবী লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। সুলতান জালাল উদ্‌দীন কতেহ শাহের (১৪৮২-১৪৮৭ খ্রি:) রাজত্বকালে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ৮৮৮ হিজরি মোতাবেক ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কাফুর নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়।[৪১] অন্তত এ শিলালিপি থেকে এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে 'বাবা আদম' শহীদ হন। কারণ দরবেশদের মৃত্যুর পরই তাদের দরগাহ্ এবং দরগাহ্ সংলগ্ন মসজিদ নির্মিত হয়। সুতরাং বাবা আদম শহীদের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি।[৪২]

শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (Shah Muhammad Sultan Rumi)

সূফী দরবেশ শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী তুরস্ক থেকে বাংলার নেত্রকোণা জেলার মদনপুর নামক এলাকায় ৪৪৫ হিজরি মোতাবেক ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আগমন করেন।[৪৩] আরও জানা যায় তাঁর সাথে একশত কুড়িজন শিষ্য ও অনুচর এখানে পদার্পণ করেন। সৈয়দ শাহ্ সূর্খুল আনতিয়াহ হলেন তার আধ্যাত্মিক পীর। তিনিও শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমীর সাথে মদনপুরে এসেছিলেন বলে অবগত হওয়া যায়।

কথিত আছে যে, শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমীর অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তিতে অভিভূত হয়ে একজন কোচ রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সূফী-দরবেশ এবং তাঁর ভবিষ্যত আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীদের খেদমতের জন্য সকল গ্রাম উৎসর্গিত করেন।[৪৪]

সেন বংশের পতনের পর কোচ রাজারা নেত্রকোণায় প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে সিদ্ধ পুরুষ ভূমির অনুদান লাভ করেন।[৪৫] সুতরাং সে সময় তিনি ছিলেন জীবিত। এ সূফী দরবেশের সমাধি নেত্রকোণা জেলার মদনপুরে বিদ্যমান রয়েছে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পুনর্দখল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৬৭১ খ্রিষ্টাব্দে সমাধির খাদিম একটি ফার্সি সনদ প্রদর্শন করে সম্পত্তি রক্ষা করেন।[৪৬]

এ সূফী দরবেশের প্রায় চল্লিশ জন শিষ্যের সমাধি মদনপুরে রয়েছে বলে অনুমেয়। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শাহ্ শেরআলী তাতার, শাহ্ দায়াব উদ্‌দীন গাজী, শাহ্ সাহেব ও সুয়া বিবি। তাঁর সমাধির কাছে বিস্তৃত ভূমিতে একটি পাকা মসজিদ, একটি মুসাফিরখানা এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ মাখদুম রূপোশ (Shah Makhdum Ruposh)

রাজশাহী জেলার পীর-দরবেশগণের মধ্যে হযরত শাহ্ মাখদুম রূপোশ মতান্তরে মাগফুর দরবীশ বা শাহ্ মাখদুম জালাল উদ্‌দীন রূপোশ সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল কুদ্দুস জালালউদ্‌দীন। মাখদুম শব্দের অর্থ ধর্মীয় নেতা এবং রূপোশ অর্থ আচ্ছাদিত। তিনি ইরাকের বাগদাদ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে ইয়ামন প্রদেশে।[৪৮] তিনি হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর বংশধর।[৪৯] তিনি নিশাপুর নামক স্থানে শিক্ষা লাভ করেন। অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি ইয়ামনের শাসনকর্তা ছিলেন। অন্যান্য সূফী দরবেশের ন্যায় তিনিও জন্মভূমি ত্যাগ করে ১২৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় বিশেষ করে রাজশাহী জেলায় আসেন। আল্লাহ্‌তায়ালার উপাসনা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় রত থাকেন। তিনি বাগদাদে অবস্থান কালে আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।[৫০]

এতদাঞ্চলের মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার ও কু-আচার দূর করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি উৎপীড়িত বহু হিন্দু নর-নারীকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানে যত্নবান হন। এভাবে ধীরে ধীরে তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁদের সহায়তায় তিনি রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র ভূমিতে মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারিত করতে সমর্থ হন । মহাকাল দেও এর মন্দির মহাকাল গড়ে (রামপুর বোয়ালিয়া) অবস্থিত ছিল। নরবলী দেয়া হতো সেখানে। দু'জন সামন্ত রাজা গড়ের অধিপতি ছিলেন। যেমন- অংশু দেও চান্দ ভণ্ডী ও অংশু দেও খেজ্জুর চান্দ খড়গ বর্মভোজ। এ অঞ্চলে শাহ্ তুর্কান নামে এক দরবেশ শিষ্যদের নিয়ে ইসলাম প্রচার করতে এসে উক্ত দু'রাজার হাতে নিপীড়িত হয়ে শাহাদত বরণ করেন। এ সংবাদ পেয়ে শাহ্ মাখদুম রূপোশ অনুচর সমভিব্যাহারে এসে একটি দুর্গ তৈরি করেন। তিনি এখান থেকেই অভিযান পরিচালনা করে মহাকাল রাজ্য জয় করে ইসলাম প্রচার করেন। দেও রাজও স্বয়ং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৫১] ১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজশাহী দরগাহ্ পাড়ায় ইন্তেকাল করেন।[৫২] বর্তমানে তাঁর সমাধিটি সাধারণ মানুষের তীর্থক্ষেত্রে পরিগণিত হয়েছে ।

শাহ্ নিয়মাতুল্লাহ্ বুতশিকন (Shah Naymatullah Buthshikan)

শাহ্ নিয়মাতুল্লাহ্ বুতশিকন ছিলেন ঢাকার অন্যতম ধর্ম প্রচারক। তিনি সাধারণত 'মূর্তিনাশক' নামে অভিহিত ছিলেন।[৫৩] তিনি পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহুপূর্বে ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন বলে অবগত হওয়া যায়। শাহ্ নিয়মাতুল্লাহর নামের সাথে 'বুতশিকন' শব্দটি সংযুক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ তাঁর অঙ্গুলি হেলনে হিন্দু দেবমূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তাঁকে পরবর্তীকালে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয় । এখানে তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন সে সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা যায় না। তবে কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই ঢাকা অঞ্চলে তিনি আগমন করেছিলেন।

কিংবদন্তী থেকে আরও জানা যায়, ঢাকা নগরী সন্নিহিত এলাকায় তিনি ইসলাম প্রচারে অগ্রসর হলে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা তাঁকে বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে থাকে। তিনি একদিন উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময় হিন্দুরা দেব-মূর্তি নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হাজির হন সেখানে। প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার জন্য তারা শোভাযাত্রা নিয়ে যাচ্ছিল। তারা দরবেশের আস্তানার কাছে এসে বাদ্যের আওয়াজ বৃদ্ধি করে ভীষণ শোরগোলের সৃষ্টি করে। যার ফলে দরবেশের উপাসনায় বিঘ্ন ঘটে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিমায় মূর্তিগুলোর প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ফলত মূর্তিগুলো পথের উপরই ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ভীত হয়ে শোভাযাত্রীরা পালিয়ে যায়। হিন্দুদের মনে ভাবান্তর দেখা দেয় এ অভাবনীয় দৃশ্যে । এ ঘটনার পর হিন্দুরা দলে দলে তাঁর আস্তানায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন বলে জানা যায়।[৫৪] অনুমিত হয় এ ঘটনার কারণেই তাঁকে বুতশিকন বা মূর্তিনাশক উপাধি দেয়া হয়। শাহ্ নিয়মাতুল্লাহর মাযার বর্তমান ঢাকা নগরীর পুরানা পল্টন এলাকায় দিলকুশা বাগে অবস্থিত। পাঠান আমলে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ মাযারের পার্শ্বে বিদ্যমান রয়েছে।[৫৫]

শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার (Shah sultan Mahisawar)

সুবিখ্যাত সূফী দরবেশ শাহ্ সুলতান মাহী সওয়ার ছিলেন বলখের এক শাহ্যাদা বা যুবরাজ। রাজ প্রাসাদের বিলাস-ব্যাসন আরাম-আয়েশ পরিহার করে তিনি কঠোর সংযমের জীবন বেছে নেন এবং ইসলামের খিদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ইহলৌকিকতা পরিত্যাগ করে তিনি দামেশকের শায়খ তৌফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর শায়খ তৌফিক তাঁকে ইসলামের সেবার জন্য বাংলার অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে প্রেরণ করেন। বর্ণিত আছে যে, সমুদ্রযানে সন্দ্বীপ হয়ে তিনি বাংলায় উপস্থিত হন। " যেহেতু তিনি মৎস্যাকৃতি নৌকাযোগে অথবা মাছের পিঠে চড়ে আগমন করেন, যে কারণে তিনি মাহী সওয়ার অর্থাৎ মৎস্যারোহণকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।"[৫৬]

তিনি কিছুকাল সন্দ্বীপে অবস্থান করার পর ঢাকা জেলার হরিরাম নগরে আসেন এবং অত্যাচারী কালী পূজারী রাজা বলরামের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। রাজা সংঘর্ষে নিহত হন। ফলত তদীয় মন্ত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর এ মহাপুরুষ মহাস্থানের দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে তিনি রাজা পরশুরাম ও তার ভগ্নী শীলাদেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । রাজা যুদ্ধে নিহত হন এবং শীলাদেবী করতোয়া

Dhaka University Institutional Repository

নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।[৫৭] জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, রাজা পরশুরাম ছিলেন অত্যাচারী এবং বিশেষ করে তিনি মুসলমান প্রজাদের উপর ছিলেন খুবই কঠোর। সুতরাং জনসাধারণ তাঁর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এ থেকে এইচ বেভারিজ সিদ্ধান্ত করেন যে, পরশুরামের অত্যাচার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সুলতান মাহী সওয়ার জনগণের একটি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমন কি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এ গণ বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিল ।[৫৮] মহাস্থান জয়ের পর দরবেশ সেখানে একটি মসজিদ ও আস্তানা প্রতিষ্ঠা করে প্রচার-কেন্দ্র গড়ে তোলেন। মৃত্যুর পর তাঁকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়। এ দরবেশের সমাধিটি গড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

মাখদুম শাহ্ দৌলাহ্ শহীদ (Makhdum Shah Dawlah Shahid)

কিংবদন্তী অনুযায়ী মাখদুম শাহ্ দৌলাহ মহানবী (সা:) এর সাহাবা মুয়াজ বিন জাবাল (রা:) এর পুত্র ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। দুই শাহ্যাদার অন্যতম ছিলেন মাখদুম শাহ্দৌলাহ। পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি ইয়ামন ত্যাগ করেন। তাঁর সহচরদের মধ্যে ছিলেন তাঁর এক ভগ্নী ও ভগ্নীর সন্তান-সন্ততিসহ একদল শিষ্য। পথে জালালউদ্দিন বুখারীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং এ সূফী দরবেশ তাঁকে দু'টো কবুতর উপহার দেন। অতঃপর পূর্বদিকে অগ্রসর হন তিনি। আর পাবনা জেলার শাহ্যাদপুরের নিকটবর্তী পোতাজিয়ায় পৌছেন। মাখদুম শাহ্দৌলাহ ও তাঁর অনুচরবর্গ সেখানে বসতি স্থাপন করেন। মসজিদ নির্মাণ করেন এবং ইসলাম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এ নব বসতি স্থাপনকারীদেরকে উৎখাত করার জন্য হিন্দু রাজা তাদেরকে আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে মাখদুম শাহ্দৌলাহ ও তাঁর কয়েকজন অনুচর শহীদ হন। হিন্দু রাজার হাতে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কায় মাখদুমের ভগ্নী একটি পুকুরের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মদান করেন। তখন থেকে সেই পুকুরের নাম সতী বিবির ঘাট (অর্থাৎ - সতী বিবির স্নানস্থান)। মাখদুমের দেহচ্যুত শির বিহারে নেওয়া হয়। হিন্দুরা তাঁর শিরে স্বর্গীয় দ্যুতি দেখে মুসলমানদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদের সাহায্যে এ শির সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। খাজা নূর শাহ্ নামীয় মাখদুমের এক ভাগ্নে জীবিত ছিলেন, তিনি শাহযাদপুরে তাদের নির্মিত মসজিদের নিকটে এ সাধু-পুরুষের মস্তকবিহীন দেহ সমাধিস্থ করেন। তাঁর সমাধির পাশে তাঁর ভাগ্নে ও সহচরদেরকে কবর দেওয়া হয়।[৫৯]

মাখদুম শাহ্দৌলাহ ও তাঁর অনুসারীদের সর্বমোট ২১টি সমাধি শাহযাদপুরে বিদ্যমান। বর্ণিত আছে যে, মাখদুম শাহদৌলাহর শাহ্যাদা উপাধি অনুসারে শাহযাদপুর নামকরণ করা হয়। তিনি শাহ্যাদা ছিলেন ইয়ামনের। ডঃ এম.এ. রহিম ও ডঃ আবদুল করিম বিভিন্ন তথ্য বিবরণ দেখিয়ে বলেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে মাখদুম শাহদৌলাহ বাংলায় আগমন করেন এবং তিনি মুয়াজ-বিন-জাবালের পুত্র ছিলেন না, বরং তিনি হয়তো ছিলেন তার একজন বংশধর।[৬০] শাহ্যাদপুরে তাঁর দরগাহে অদ্যাবধি শত শত দর্শক উপস্থিত হয় এবং তা বাংলায় ইসলামের জন্যে তাঁর মহান আত্মবিসর্জনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুসলমান শাসকরা দরগাহ্ সংলগ্ন মসজিদের জন্য ২০৭.৩৩ একর নিষ্কর জমি দান করেছেন।[৬১]

হযরত বায়েজিদ বিস্তামী (Hazrat Bayzid Bistami)

(মৃ. ৮৭৪ খ্রি:)

প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী সুবিখ্যাত সূফী হযরত বায়েজিদ বিস্তামী খ্রিষ্টীয় নবম শতকে বাংলায় আগমন করেন। চট্টগ্রাম শহরের পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের এক পর্বত চূড়ায় তাঁর স্মারক সমাধি বিদ্যমান। খুব সম্ভব তিনি চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ৮ম শতকের শেষ বা ৯ম শতকের প্রথম দিকে বিস্তাম নগরে জন্মগ্রহণ করেন।[৬২] তিনি ছিলেন ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর তিনি বিদেশ ভ্রমণে বের হন। আর কোন এক সময়ে উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশে হাজির হন। তখন এ অঞ্চলে আবু আলী কলন্দর ধর্ম প্রচারে নিমগ্ন ছিলেন।[৬৩] বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণের তিনি বিরোধিতা করতেন। সূফী তরিকার ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্বে আরোপ করে তিনি শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। হযরত বায়েজিদ বিস্তামী তাঁর সাধন পদ্ধতির অভিনবত্বে অভিভূত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আর অল্প সময়ের মধ্যেই তা আয়ত্ব করে খিলাফত লাভ করেন। তিনি গুরুর আদেশে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ শেষে চট্টগ্রামে আসেন। চট্টগ্রাম জেলার নাসিরাবাদ এলাকায় একটি টিলার উপর আস্তানা তৈরি করেন। হিংস্র প্রাণী ও ঝোপ-জঙ্গলে ঘেরা এ জায়গাটি খানকার জন্য পছন্দ করেন। চারদিকে তাঁর সাধনা মহত্ত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ে। আর স্বল্প সময়ের মধ্যেই খানকার চারপাশে জনবসতি গড়ে উঠে। মাযারের সন্নিকটে একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদের কাছে একটি জলাশয় আছে। জলাশয়ে বংশ পরম্পরায় বহু বছরের পুরানো বিরাটকায় কচ্ছপ বাস করে। কচ্ছপ সম্বন্ধে বেশ ক'টি জনশ্রুতি রয়েছে। যেমন- যখন হযরত বায়েজিদ এ পাহাড়ী জন মানবহীন অঞ্চলে আসেন, তখন এ এলাকায় দু'টি দৈত্য বাস করতো। তারা বিভিন্নভাবে বায়েজিদকে উত্যক্ত করলে আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তিনি একটি বাঁশের চোঙায় ভরে তাদের শাস্তি দেন। তারা পরিশেষে নতি স্বীকার করলে তাদেরকে বায়েজিদ ক্ষমা করে দেন এবং পুকুরে কচ্ছপ বানিয়ে তাদেরকে রেখে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক বর্ণনা মতে, তখন এ এলাকায় দু'টি জ্বিন বাস করতো। এখানে বায়েজিদ আসার কারণে তাদের অবাধ বিচরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। নানা পন্থায় তারা বায়েজিদকে বিরক্ত করতে থাকে। পরে তারা বায়েজিদের ব্যবহারে অভিভূত হয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে আর তার সেবায় সচেষ্ট থাকে। বায়েজিদের অনুপস্থিতে তাদের কী হবে, তারা এ চিন্তা করে তাঁর কাছে আশীর্বাদ চায়। পরে বায়েজিদ আশীর্বাদ করেন যে, নিকটবর্তী পুকুরে তারা কচ্ছপ হয়ে বসবাস করবে এবং তাদের লালন-পালন করবে সকলে। তাদের কেউ কোন দিন ক্ষতি করবে না।[৬৪] হযরত বায়েজিদ তাঁর ইসলাম প্রচার কার্যাদি সমাপ্তি করে পীরের আদেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বিস্তাম নগরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাযার সেখানে বিদ্যমান।[৬৫]

শায়খ জালাল উদ্‌দীন তাবরিজী (Shaikh Jalal uddin Tabrizi)
(মৃ. ১২২৫ খ্রি:)

সুহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরিকার সূফী-দরবেশদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বাংলায় এসেছিলেন; তিনি হলেন শায়খ জালাল উদ্‌দীন তাবরিজী।[৬৬] পারস্যের (ইরান) তাবরিজ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এ দরবেশের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আবদুর রহমান চিশতী তাঁকে আবুল কাসিম মাখদুম শায়খ জালাল উদ্‌দীন তাবরিজী নামে বর্ণনা করেন।[৬৭]

প্রথমে শায়খ আবু সাঈদ তাবরিজীর এবং তাঁর ইন্তেকালের পর শায়খ শাহাব উদ্‌দীন সুহ্‌রাওয়ার্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৬৮] শুধুমাত্র তাঁর কৃতিত্ব উত্তরবঙ্গে মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার। ইখতিয়ার উদ-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের পর সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন ইওজ খলজীর শাসনকালের কোন এক সময় লখনৌতি শহরে উপনীত হন এবং এখান থেকে পাণ্ডুয়ায় সতের মাইল দূরত্বে আস্তানা স্থাপন করেন। ফলে সমগ্র বাংলায় ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় তার দ্বারা বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ প্রভাবিত হয়। তিনি সাত বছর পর্যন্ত পীরের খেদমত করেন। শায়খ আবদুল হকের অভিমতে হজ্জ সমাপনের জন্য তাঁর ওস্তাদ শায়খ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রতি বছর মক্কা মদিনায় গমন করতেন । আর তাঁর সাথে জালাল উদ্‌দীন তাবরিজীও যেতেন। পীর অসুস্থ থাকায় ঠাণ্ডা খাবার খেতে পারতেন না । সুতরাং স্বীয় পীরকে গরম খাবার দেয়ার জন্য শিষ্য জালাল উদ্‌দীন মাথায় একটি চুল্লী বহন করতেন। যখনই পীরের ক্ষুধা পেত সাথে সাথেই চুল্লী নামিয়ে গরম খাবার পরিবেশন করতেন। তাঁর অসীম ধৈর্য, একাগ্রচিত্ততা ও দীর্ঘ যত্নে অভিভূত হয়ে হযরত শিহাব উদ্‌দীন তাঁকে 'খিরকা-ই-খিলাফত' দান করেন।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ জালাল উদ্‌দীন বাগদাদ থেকে বহুদেশ ভ্রমণের পর ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখান থেকে মুলতানে অবস্থান কালে তাঁর ঘনিষ্ঠ সতীর্থ খাজা কুতুব উদ্‌দীন বখতিয়ার কাকী ও শায়খ বাহাউদ্‌দীন যাকারিয়ার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান নাসির উদ্‌দীন কুবাচা। ঐ সময় জালাল উদ্‌দীন তাবরিজী মুলতান ত্যাগ করে দিল্লীতে আসেন।

এ দরবেশ দিল্লী পৌঁছলে শামসুদ্দীন ইলতুত্‌মিশ শায়খুল ইসলাম নাজিমউদ্‌দীন সুগরাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তাঁকে স্বাগতম জানাতে এসেছিলেন। সুলতান তাঁকে প্রাসাদের সন্নিকটে অবস্থান করার আদেশও দিয়েছিলেন। ফলে শায়খুল ইসলাম ঈর্ষান্বিত হয়ে শায়খ জালাল উদ্‌দীন (রহঃ) এর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনেন; তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগটি ছিল কলঙ্কিনী এক মহিলার সাথে অসচ্চরিত্রতার অভিযোগ।[৭০] পরিশেষে অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ ঘটনায় জালাল উদ্‌দীন মর্মাহত হয়ে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে দিল্লী ত্যাগ করে বাংলায় আগমন করেন।

শায়খ জালাল উদ্‌দীন ভারতের অন্তর্গত উত্তর প্রদেশের ' ইটাওয়া ' জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাফুর। তিনি রমজান খান নামীয় একজন বণিকের সহায়তায় শিক্ষা লাভ করেন। আর ঐ বণিকের সুকর্মের অংশীদার হয়ে গৃহ পরিত্যাগ করেন। শুধু একটি কালো পোশাক পরে তিনি বাংলায় এসেছেন । তাঁর হাতে একটি পাত্র ও একটি ঘড়ি ছিল।[৭১] 'সিয়ারুল আরিফীন' গ্রন্থের লেখক বলেন, যখন শায়খ জালাল উদ্‌দীন বাংলায় পৌঁছান, তখন এ দেশের অধিবাসীগণ তাঁর নিকট ভিড় জমায় এবং তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেন। তিনি এখানে খানকাহ ও একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু জমি ও বাগান কিনেন তিনি। আর লঙ্গর খানার খরচ নির্বাহের জন্য তা দান করেন। তিনি বহু অবিশ্বাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।[৭২]

তিনি উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন একজন বিখ্যাত সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁর ত্যাগ, সাধনা, নিষ্ঠা ও গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। বিরাট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং মানব হিতৈষামূলক সেবার দ্বারা তিনি বাংলায় অলৌকিক কার্য সাধন করেন। উৎপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত হিন্দু ও বৌদ্ধরা ত্রাণ লাভের জন্য দলে দলে তাঁর আশ্রয়ে ইসলাম কবুল করেন। এভাবে তিনি উত্তর বাংলায় এক শক্তিশালী মুসলিম সমাজের ভিত্তিভূমি রচনা করেন। বাংলায় নব প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শাসন সংহত ও মজবুত করার ক্ষেত্রেও তার যথেষ্ট অবদান ছিল। এ দরবেশের অসামান্য প্রভাব হিন্দু -মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর ছিল। সর্বজন স্বীকৃত যে, তিনি ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওতলায় ইন্তেকাল করেন এবং ওখানেই তাঁর সমাধি বিদ্যমান।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ জালাল উদ্‌দীন সমাজ জীবনে অপরিসীম ও স্থায়ী প্রভাবের দরুন তাঁর স্মৃতি অদ্যাবধি বাংলার মানুষের মনে রেখাপাত করছে। ফলে কালক্রমে সত্যপীরের ধর্ম ও পূজা হিন্দু সমাজে প্রবর্তিত হয়। এভাবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ উদার ও প্রগতিশীল হয়ে উঠে।

হযরত শাহ্ জালাল (রহ:) (Hazrat Shah Jalal (R.)

হযরত শাহ্ জালাল (রহ:) বাংলার একজন মহান ও বিশিষ্ট সূফী-সাধক ছিলেন। সিলেট এবং উত্তর-পূর্ব বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কৃতিত্ব তাঁকেই দেয়া হয়। তাঁর পূর্ণ নাম হলো শায়খ জালাল উদ্‌দীন মুজাররদ। জীবনে তিনি বিয়ে করেন নি। তাঁকে এজন্য মুজাররদ বলা হয়। কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন তা নিয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কারো মতে তিনি ইয়ামন জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁকে 'ইয়ামনী' বলা হয়।[৭৪] আবার কারো মতে তিনি কুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।[৭৫] দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী তাঁরই 'হযরত শাহ্ জালাল (রহ:)' নামক গ্রন্থে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, হযরত শাহ্ জালালের জন্মস্থান ইয়ামন।[৭৬]

হযরত শাহ্‌জালাল (রহ:) এর জন্ম সন নিয়েও অনেক মতান্তর রয়েছে। ইবনে বতুতা বলেন তিনি দেড়শত বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের সময় ৭৪৬ হিজরি উল্লেখ করা হয়েছে। এ হিসেবে তিনি ৫৯৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ শহীদুল্লাহ এর মতে তিনি ৫৯৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।[৭৭] ডঃ মেহেদী হাসান বলেন- তিনি ৫৯৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁর জন্ম ৫৯৫ হিজরি উল্লেখ করা হয় । উল্লিখিত ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ৬ষ্ঠ হিজরির শেষ দশকে তাঁর জন্ম।[৭৮]

হযরত শাহ্‌জালাল (রহ:) -এর পিতার নাম ছিল মুহাম্মদ তাঁর মাতার নাম সাঈদা। তিনি ছিলেন তাঁর মাতুল সায়ীদ আহমাদ ইয়ামনীর শিষ্য। গুরুর নির্দেশে তিনি শতশত সহচর নিয়ে ইসলাম প্রচারে সচেষ্ট হন। ঐ সময় মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মোগলরা ধ্বংস করেছিল মুসলিম দেশগুলো। হযরত শাহ্‌জালাল (রহ:) তাঁর সহচরসহ ইসলামের উদ্দেশ্যে পথে পথে জিহাদ করেছিলেন। ইসলামি হুকুমাত কায়িম রাখার জন্য বিজিত দেশগুলোতে তাঁর সাথীদের কিছু কিছু রেখে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। শুধু তিনি ৩৬০ জন শিষ্যসহ সিলেটে উপস্থিত হন এবং পরাজিত করেন সিলেটের হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দকে।[৭৯] সিলেট বিজয়ের পর সেখানে হযরত শাহ্‌জালাল (রহ:) অবস্থান করে এবং মানব সেবা ও ধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইবনে বতুতার বিবরণে তাঁর আত্মসংযম, ধর্মনিষ্ঠা ও সেবাধর্মী জীবনের পরিচিতি জানা যায়। ইবনে বতুতা যখন শাহ্‌জালাল (রহ:) এর সঙ্গে দেখা করেন, তিনি তখন খুবই বৃদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। তিনি শীর্ণকায় লম্বাকৃতির ছিলেন এবং তাঁর ছিল অল্প দাঁড়ি। প্রায় চল্লিশ বছর তিনি একাধারে রোযা রাখতেন। আর দশ দিন অন্তর রোযা খুলতেন। তাঁর একটি গাভী ছিল, সেই গাভীর দুধই ছিল তাঁর খাদ্য । সারা রাত তিনি ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। ইবনে বতুতা আরও বর্ণনা করেন যে, এ শায়খের শ্রমের দরুন ঐ এলাকার অধিবাসীগণ ইসলামে দীক্ষিত হয় । আর এ কারণে তাদের মধ্যে তিনি বসতি স্থাপন করেন। তিনি সেখানে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

এ খানকাহ মূলত সূফী-দরবেশ, দুস্থ ও পরিব্রাজক মানুষের আশ্রয়স্থল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁকে বিশেষকরে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতো। তারা নানারকম উপঢৌকন তাঁর জন্য আনতো এবং তাঁর আস্তানায় অনেক লোককে ঐগুলো দিয়ে খাওয়ানো হতো।[৮০] শাহ্জালাল (রহঃ) এর ধর্ম প্রচারের উদ্যম ও নিঃস্বার্থ সেবার ফলে এই সুদূর অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল এবং বাংলার অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এটা উন্নীত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর মহান কার্যাবলীর দ্বারা মুসলিম বাংলার নির্মাতাদের মাঝে উচ্চ আসন লাভের অধিকারী । তাঁর ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ, আদর্শ জীবন ও দুঃস্থ মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার জন্য তিনি বাংলার অমুসলমানদেরও ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। ফলে, অদ্যাবধি তিনি সাধারণ লোক সমাজে চির অমর হয়ে রয়েছেন এবং তাঁর স্মৃতি শতশত লোক-সঙ্গীতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই সূফী -দরবেশ ১৫০ বছর বয়সে ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সিলেটে তাঁর সমাধি অদ্যাবধি সর্ব শ্রেণীর মানুষের নিকট তীর্থস্থান।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহঃ) (Shaikh Sharfuddin Abu Tawama (R.)

(মৃ. ১৩০০ খ্রিঃ)

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহঃ) ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ সূফী-সাধক ও মনীষী। বুখারার এক উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের[৮১] অনুসারী । সঠিকভাবে তাঁর মাতা-পিতার পরিচয় জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণের মতে ইসলামি দাওয়াত নিয়ে তাঁর পূর্বসূরীগণ বুখারায় হিজরত করেন। যে সকল মুসলিম পরিবার আরব দেশের ইসলামি রেনেসাঁর ফলে বুখারায় বসতি স্থাপন করেন। আবু তাওয়ামার পূর্বে পুরুষ তাদের একটি। এ সকল পরিবারের প্রধান উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল ইসলাম প্রচার করা।[৮২] তিনি খোরাসানে শিক্ষা লাভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর বিদ্যাবত্তার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হাদিস ফিক্হ, ধর্মতত্ত্ব, প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এছাড়া রসায়নবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। পর্যায়ক্রমে খোরাসানে তিনি উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। যৌবনের শুরুতেই আবু তাওয়ামা

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষা শেষ করে জ্ঞান দানের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষকতার পেশা বেছে নেন। সুলতান গিয়াস উদ্-দীন বলবনের রাজত্বের প্রারম্ভে (১২৬০ খ্রি:) তিনি দিল্লীতে আগমন করেন।[৮৩] আবু তাওয়ামা দিল্লী এসে ইসলামী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।[৮৪] বিদ্বান ব্যক্তিরা ধর্ম-বিজ্ঞানে তাঁর উপদেশ মেনে চলতেন আর সাধারণ লোক থেকে আরম্ভ করে আমির, মালিক সকলেই তাঁর প্রতি ছিলেন বিশেষভাবে অনুরক্ত।[৮৫]

সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন (১২৬০ খ্রি:) তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা প্রদর্শন করে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হন। আর তাঁর সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার সংশয় করেন। ফলে আবু তাওয়ামাকে সুলতান সুকৌশলে সোনারগাঁয়ে যাবার পরামর্শ দেন। সেকালে বাংলাদেশ ছিল দিল্লীর সুলতানের অধীনে। সুলতানের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তিনি সোনারগাঁয়ের দিকে যাত্রা করেন।[৮৬] শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বাংলাদেশে আগমনের পথে বিহারের মুনায়র নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি এখানে শায়খ ইয়াহ্ইয়া মুনায়রীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইয়াহ্ইয়া মুনায়রীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র শরফুদ্দীনের মেধা ও ব্যুৎপত্তিতে তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। শায়খ আবুতাওয়ামা তাঁকে স্বীয় শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সুতরাং পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে শায়খ শরফুদ্দীন মুনায়রী সোনারগাঁয়ের পথে শায়খ আবু তাওয়ামার সঙ্গী হন।[৮৭]

আবুতাওয়ামা সোনারগাঁও এসে শিক্ষা প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ভিত্তি স্থাপন করেন। বহু দূর দূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসুগণ জ্ঞান আহরণের জন্য ছুটে আসেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই এদেশের ইসলামি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র সোনারগাঁয়ে পরিণত হয়। আবুতাওয়ামা বোখারার অধিবাসী ছিলেন বিধায় তিনি সহীহ্ বোখারীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তথ্যাদি সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন। তাঁরই প্রচেষ্টার কারণে হাদিস শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয় সোনারগাঁও।[৮৮]

শায়খ আবু তাওয়ামার রচিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. আল উলুমুল নাকলিয়া (Traditional Science)

২. আল উলুমুল আকলিয়া (Rational Science)

আল উলুমুল নাকলিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

১) ইলমুল কিরাত (২) ইলমুত তাফসীর ও কুরআন সম্পর্কিত বিষয় (৩) ইলমুল হাদিস (৪) ইলমুল ফিক্হ (৫) ইলমুত তাওহীদ (৬) ইলমুল মীরাস (৭) ইলমুল আদব (৮) ব্যাকরণ (৯) ইতিহাস (১০) সীরাতে রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবীদের জীবনী।

Dhaka University Institutional Repository

আল উলুমুল আকলিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

(১) দর্শন (২) যুক্তিবিদ্যা (৩) জ্যোতিষবিদ্যা (৪) মনোবিজ্ঞান (৫) পদার্থ বিজ্ঞান (৬) রসায়ন (৭) উদ্ভিদ বিজ্ঞান (৮) ভূতত্ত্ব (৯) চিকিৎসা বিজ্ঞান (১০) ভূগোল (১১) গণিত (১২) প্রাণী বিদ্যা (১৩) প্রযুক্তি বিজ্ঞান (১৪) ব্যবসা এবং (১৫) কৃষি বিজ্ঞান

এ প্রসঙ্গে জেনারেল ম্যালম্যান তাঁর Education and Society গ্রন্থে যে মন্তব্য করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখেন, " Even a person earning a small pittance of Rs 20/- permansem would provide education for his children be fitting the progeny through Greek and Latin was recieved by the young man of subcontinent through persian and Arabic and after seven years course of study, the Muslim youth be came as proficient in Grammar, Dialectics and logics as an Oxford Graduate of these days and he could discuss the teachings of Socrates., plato, Aristotle, Gabu and Avicenna with Great ease and self possession."[৮৯]

আবু তাওয়ামা জ্ঞান বিতরণ ও ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে সমাজ সেবায়ও আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বড় আকৃতির একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। আর এতে নওমুসলিম মুহাজির ও মুসাফিরগণেরও টাকা ছাড়া থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আবু তাওয়ামা তাঁর কর্মক্ষেত্র সোনারগাঁও অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে তিনি আসামসহ সমগ্র বাংলায় ইসলামের আলো প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে একজন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কের অগ্রণী ভূমিকা পালনে বিভিন্ন ব্যতিক্রমধর্মী কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।[৯০] তৎকালীন সোনারগাঁওয়ের এ শিক্ষাকেন্দ্র বাংলার মুসলিম সমাজের চিন্তা আকিদা-বিশ্বাস সংশোধনেও যথার্থ কুরআন-হাদিস অনুসারী ইসলামি সমাজ গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

শায়খ আবু তাওয়ামা এভাবে বাংলায় ইসলামি শিক্ষা-সাধনা ও জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করে তিনি ৭০০ হিজরি মোতাবেক ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[৯১] তাঁর মৃত্যুতে আমির ওমরাহ এমনকি দিল্লীর রাজ প্রাসাদেও শোকের ছায়া নেমে আসে। সোনারগাঁও এর মোগড়াপাড়া হাইস্কুলের পশ্চিম কোণে অনেকগুলো সমাধির মধ্যে তাঁর সমাধি রয়েছে।

শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (রহ:) (Shaikh sharfuddin Yahya Muneri (R:)

(১২৬২-১৩৮০ খ্রি:)

তাঁর মূল নাম আহমদ। উপাধি শরফুদ্দীন, তাঁর খিতাব মাখদুমুল মুলক বিহারী। তাঁর পূর্ণ নাম হলো মাখদুমুল মুল্ক শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী। ৬৬১ হিজরি সালের শা'বান[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

মোতাবেক ১২৬২ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি বিহারের পাটনা জেলার অন্তর্গত 'মুনায়র'[৯৩] গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতার নাম হযরত শায়খ ইয়াহ্ইয়া আর মাতার নাম রাজিয়া বিবি। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসী। কুরাইশ গোত্রের আবদ মুন্নাফ তাঁর পিতৃকুল এবং ইমাম জা'ফর সাদিকের বংশধর ছিলেন তাঁর মাতৃকুল।[৯৪] পিতৃগৃহেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। এরপর মক্তবে ভর্তি হন। তাঁর ইসলামি উচ্চ শিক্ষার প্রতি বাল্যকাল থেকেই গভীর অনুরাগ ছিল আর এ ব্যাপারে চমৎকার প্রতিভার পরিচয় দেন।[৯৫] তিনি পনর বছর পর্যন্ত স্বদেশে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর জ্ঞানের পিপাসা এতই প্রবল ছিল যে, মাত্র পনর বছর বয়সে তিনি সুবিখ্যাত সূফী-সাধক ও পণ্ডিত শায়খ শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামার ছাত্র হিসেবে সোনারগাঁও আগমন করেন । তিনি সোনারগাঁয়ে পড়াশুনায় এত নিবিড়ভাবে নিমগ্ন থাকতেন যে, বাড়ি থেকে প্রেরিত চিঠি পড়ার সময় পর্যন্ত পান নি। তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর চিঠিগুলো খুলে একটির মধ্যে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ পান।[৯৬] অর্থাৎ ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ মাখদুম ইয়াহ্ইয়া ইহজগত ত্যাগ করেন। তিনি এ দুঃসংবাদ শুনে খুবই মর্মাহত ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যান।

শরফুদ্দীন সুদীর্ঘ পনের বছরকাল শায়খ আবু তাওয়ামা (রহ:) এর সংস্পর্শে থেকে ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পরিপূর্ণতা লাভ করেন। তাঁর তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা ও গুণাবলীর স্বীকৃতিস্বরূপ আবু তাওয়ামা (রহঃ) এর স্বীয় কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রীর গর্ভে তিন পুত্র জন্ম নেন। পরক্ষণে তাঁর দু'পুত্র ও স্ত্রী মারা যান।[৯৭] পরবর্তী সময়ে বাংলায় তিনি এসেছিলেন কি না তা জানা যায় না। কিন্তু সুলতান সিকান্দার শাহের সাথে তাঁর চিঠি-পত্র যোগাযোগ ছিল।[৯৮] তিনি পত্রের মাধ্যমে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে সুলতানকে উপদেশ দিতেন।[৯৯]

প্রকৃতপক্ষে শায়খ শরফউদ্দীন মুনায়রী ছিলেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষকের যোগ্য শিষ্য এবং সোনারগাঁও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানের নিদর্শন। তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশ সত্যি গর্ববোধ করতে পারে। ১২৯৩ খ্রি: শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী ওস্তাদের আশীর্বাদ নিয়ে মুনায়র প্রত্যাবর্তন করেন আর শিক্ষা দান ও ধর্ম প্রচারের কাজে নিজকে নিয়োজিত করেন। সিদ্ধ সূফী-সাধক ও পণ্ডিত হিসেবে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তিনি হিন্দুস্তানে এক অপূর্ব সম্মান লাভ করেন। শায়খ মুনায়রী রচিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ তাঁর গভীর বিদ্যাবত্তা ও পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তিনি ছিলেন এ উপমহাদেশের স্বনামধন্য সিদ্ধ সাধকদের অন্যতম।[১০০] তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর প্রশংসা করতে গিয়ে শায়খ আবদুল হক দেহলভী বলেন যে, 'শায়খ শরফউদ্দীন মুনায়রী

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের বিখ্যাত সূফী পুরুষদের অন্যতম। তিনি প্রশংসার অতীত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও উচ্চ প্রশংসিত। সূফী মতের মূলমন্ত্র ও সত্যের রহস্য তাঁর গ্রন্থাবলীর বিষয়বস্তু।'[১০১] ৭৮২ হিজরি মোতাবেক ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিহার শরীফে ইন্তেকাল করেন। বর্তমানে সেখানেই তাঁর সমাধি বিদ্যমান। লোকজন সেখানে নিয়মিত যিয়ারত করে থাকেন।[১০২]

শায়খ রিজা বিয়াবানী (রহ:) (Shaikh Rija Biyabani)

(মৃ. ১৩৫৩ খ্রি:)

তিনি উত্তরবঙ্গের একজন যথার্থ প্রভাবশালী ইসলাম প্রচারক ও সূফী ছিলেন। চতুর্দশ শতকের (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রি:) গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। যদিও তিনি সুলতান ফীরূজ শাহ্ তুগলক কর্তৃক একডালা দুর্গ অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। তথাপি ঐ সময়ে এ মহান সূফীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করে দরবেশের জানাযায় শরীক হন।[১০৩] এ ঘটনা হতে বুঝা যায় স্বীয় কামালিয়াতের মহিমায় শায়খ রাজা বিয়াবানী কিভাবে দেশবাসীর অন্তর জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মাখদুম শাহ্ জালাল উদ্‌দীন জাহানিয়া গাশত (রহ:) (Makhdum Shah Jalal Uddin Jahania Gasht (R:) (১৩০৭-১৩৮৩ খ্রি:)

এ সূফী সাধকের আসল নাম মীর সৈয়দ জালাল উদ্‌দীন। তিনি ১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দে বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ জালাল উদ্‌দীন বুখারীর দৌহিত্র আহমদ কবীরের পুত্র।[১০৪] তিনি উত্তর ভারতের নানা এলাকা ভ্রমণ শেষে বাংলায় আগমন করেন। তৎকালীন বাংলার প্রাণকেন্দ্র পাণ্ডুয়ায় তিনি কিছুদিন অবস্থান করে রংপুরে আসেন। রংপুর জেলায় প্রথম ইসলাম প্রচারক হিসেবে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রংপুরের ৬.৪৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে মাহীগঞ্জ নামক স্থানে এখনো একটা আস্তানা আছে।[১০৫] তিনি মূলত শাহ্‌জালাল মাহী সাওয়ার নামে সুপরিচিত । অনেক দেশ পরিভ্রমণ করায় তাঁকে 'জাহানিয়া জাহান গাশ্‌ত' উপাধি দেয়া হয়েছে। মাহীগঞ্জ অঞ্চলের নামকরণ তাঁর নামানুযায়ী হয়েছে। সেখান থেকে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ পরিচালনা করেন। অতঃপর তিনি পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করেন। ৭৮৫ হিজরি মোতাবেক ১৩৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের 'উচ' নগরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ আবদুল্লাহ কিরমানী (রহঃ) (Shah Abdullah Kirmani)

(১২৬৩ সালে জীবিত)

তাঁর পূর্ণ নাম সায়্যিদ আবদুল্লাহ ওয়ালী হুসায়নী কিরমানী। তিনি ছিলেন খাজা মঈন উদ্‌দীন চিশতীর (১১৪২-১২৩৫ খ্রিঃ) শিষ্য। তিনি বাংলায় আগত প্রথম যুগের চিশতীয়া সূফীদের অন্যতম। তাঁর জন্ম ইরানের কিরমান নগরে। কিরমান অঞ্চলের শাসক ছিলেন তাঁর পিতা সুলতান বরখোরদার শাহ্।[১০৬]

শায়খ আবদুল্লাহর পিতা ছিলেন একজন ন্যায়বান শাসক ও ধর্মনিষ্ঠ দীনদার সূফী-সাধক। তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে রাজনীতি ও যুদ্ধ বিদ্যার সাথে সাথে দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায়ও দীক্ষিত হন। তাঁর প্রতিভার পরিচয় অতি শৈশবেই পরিলক্ষিত হয়। তখন বাংলায় তুর্কী রাজত্বের কেবলমাত্র গোড়া পত্তন হচ্ছিল। এমন সময় তিনি এ দেশে আগমন করেন। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় ইসলাম প্রচারিত হয় বলে জানা যায়। ৯৫৫ হিজরির ৪ঠা সফর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।[১০৭]

শায়খ আঁখি সিরাজউদ্‌দীন উসমান (Shaikh Akhi Sirajuddin Uthman)

(মৃ. ১৩৫৭ খ্রিঃ)

শায়খ আঁখি সিরাজউদ্‌দীন উসমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম যুগের চিশতিয়া সূফীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এ দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে তিনি গভীর প্রভাব রেখে যান। তিনি ছিলেন পরম আধ্যাত্মিক পূর্ণতাসম্পন্ন একজন সূফী-সাধক; তিনি খ্যাতনামা চিশতিয়া সূফী-পুরুষদের একটি সম্প্রদায় বঙ্গদেশে রেখে যান আর রেখে যান তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারীদের নিকট মানব সেবামূলক কার্যাবলীর দৃষ্টান্ত ।[১০৮]

তিনি ছিলেন হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (রহঃ) (১২০৬-১২২৫ খ্রিঃ) একজন প্রিয় শিষ্য। তাঁর পীর তাঁর আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও অধিক জ্ঞানের স্বীকৃতি স্বরূপ। স্নেহাসিক্ত চিত্তে তাঁকে 'আয়না-এ-হিন্দুস্তান' (হিন্দুস্তানের আয়না) উপাধিতে আখ্যায়িত করেন।[১০৯] তিনি এ সমস্ত জ্ঞান গরিমার অধিকারী হলে পীর তাঁকে খিলাফত দান করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের । হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। পীরের ইন্তেকালের চার বছর পর তিনি সাদুল্লাহ্‌পুর (লখনৌতির অপর নাম) মহল্লায় আগমন করেন আর গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় আস্তানা তৈরি করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আস্তানার নিকটে দরিদ্রদের জন্যে একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে অভিভূত হয়ে হিন্দু মুসলমান ছোট-বড় নির্বিশেষে দলে দলে লোকেরা তাঁর আস্তানায় সমবেত হয়। তদানীন্তন কালে গৌড়ের শাসক শ্রেণী ও অভিজাত মহলের অনেকেই তাঁর নিকট এসে মুরীদ হন। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বহু হিন্দু তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৭৫৯ হিজরি মোতাবেক ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর সমাধি প্রাচীন গৌড়ের সাগরদিঘি নামক জলাশয়ের তীরে অবস্থিত।

শায়খ আলাউল হক (রহ:) (Shaikh Alaul Haq (R.)

(১৩০১-১৩৯৮ খ্রি:)

শায়খ আলাউল হক (রহঃ) ছিলেন শায়খ আখি সিরাজ উদ্‌দীন উসমান (রহ:) এর সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য। লখনৌতির এক বিত্ত ও প্রভাবশালী পরিবারে ৭০১ হিজরি মোতাবেক ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১১০] তাঁর পিতার নাম উমর ইবনে আসাদ। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। তিনি বীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের (রহ:) বংশধর বলে জানা যায়।[১১১] ফার্সি ভাষায় লিখিত আউলিয়া জীবনী জাতীয় গ্রন্থাদিতে শায়খ আলাউল হক ও তাঁর বংশের অন্যান্যদের বাঙ্গালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আখবারুল আখিয়ার এর বর্ণনা মতে, তাঁর পিতা ছিলেন সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৭-৯২ খ্রি:) কোষাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত । আর তাঁর আত্মীয় -স্বজনগণও ছিলেন বাদশাহর উজির ও আমির-ওমরাহ। তাঁর এক পুত্র পাণ্ডুয়া রাজ দরবারের উজির ছিলেন আ'যমখান নামীয় ।[১১২] তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং সেকালের বিত্তশালী আলিমগণ তাঁর সাথে বিতর্ক করতে সাহস পেতেন না। এমনকি আখি সিরাজও তাঁর সম্মুখীন হতে সংকোচ বোধ করছিলেন। শায়খ আখি সিরাজের ইন্তেকালের (১৩৫৭ খ্রি:) পর শায়খ আলাউল হক নিজ পীরের ধর্মীয় ব্রত অনুসরণে ইসলামের উন্নতি সাধন করেন। পাণ্ডুয়াতে তিনি একটি খানকাহ, লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

এগুলোর ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি মুক্ত হস্তে দান করেন। এরূপে তাঁর আদর্শ জীবন এবং সেবামূলক কার্যাবলীর দ্বারা মানুষের মনে প্রাণে এত বেশি প্রভাব বিকীর্ণ করেছিলেন যে, সুলতান সিকান্দার শাহ্ পর্যন্ত তাঁর প্রতিপত্তিতে শঙ্কিত-ভীত হয়ে সুলতান তাঁকে রাজধানী থেকে নির্বাসিত করেন। ফলে সেখান হতে তিনি সোনারগাঁয়ে বসবাস করেন। তিনি এখানেও খানকাহ ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন । আর ধর্ম ও জ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।[১১৩] এখানেও তিনি অতি সহজেই মন জয় করে নেন মানুষের। খুব সম্ভব তিনি ১৩৯২ খ্রিষ্টাব্দে সিকান্দার সাহের মৃত্যুর পর পাণ্ডুয়ায় ফিরে আসেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্যে পাণ্ডুয়া তখনকার দিনে ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে বহু লোকজন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। তিনি ৮০০ হিজরি মোতাবেক ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পাণ্ডুয়াতে ইহধাম ত্যাগ করেন। আর তিনি একটি সূফী পরিবার উপহার দিয়ে যান।[১১৪]

চিত্রে শায়খ আলাউল হকের সূফী পরিবার -[১১৫]

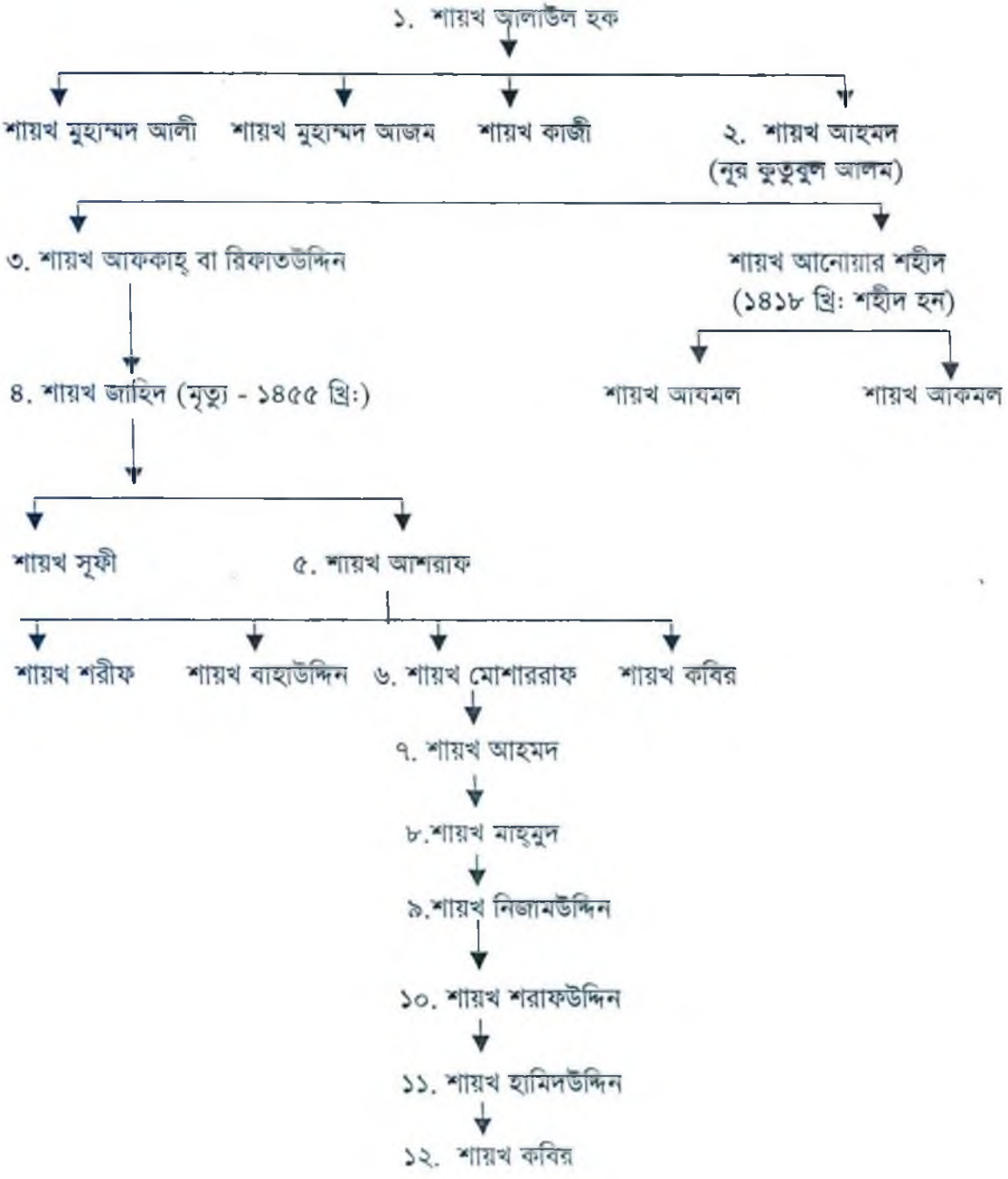

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ নূর কুত্‌বুল আলম (রহঃ) (Shaikh Nur Qutb-Ul-Alam)

(মৃঃ ১৪১৫ খ্রিঃ)

শায়খ নূর কুতুব-উল-আলম ছিলেন বিখ্যাত সূফী দরবেশ শায়খ আলাউল হকের সুযোগ্য পুত্র ও সার্থক আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। তাঁর পূর্ণ নাম আহমদ নূরুদ্দীন নূরুল হক। কিন্তু জন সাধারণের নিকট নূর কুত্‌বুল আলম (অতীন্দ্রিয় জগতের সংযোগকারী) নামেই সমধিক সুপরিচিত ছিলেন। বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উত্তর-পশ্চিম এবং ভারতের পশ্চিম বাংলার মালদহ শহরের কেবল ৩.২২ কিলোমিটার দক্ষিণে পাণ্ডুয়ায় সম্ভবত তিনি ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, আইন-ই-আকবরী অনুযায়ী তাঁর জন্ম পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোরে। তবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ মহা সাধকের বহি-র্বাংলায় জন্ম গ্রহণের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি নূর কুত্‌বুল আলম বা জগতের ধ্রুবতারা উপাধি পান। পিতার ন্যায় তিনিও ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও বিদ্যাবত্তায় সুপণ্ডিত । তিনি ছিলেন সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন আজম শাহের সহপাঠী । আর তারা উভয়ে শেখ হামিদউদ্দিন গঞ্জনসিন (কুঞ্জনসীন) নাগরীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন।[১১৬]

নূর কুত্‌বুল আলম ও গিয়াস উদ্‌দীন আজম শাহের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সাধক পিতার পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বাবধানে বাল্যকাল হতেই তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। পাণ্ডুয়াতে তিনি একটি মাদ্‌রাসা, একটি চিকিৎসালয় ও একটি লঙ্গরখানা পরিচালনা করতেন। জানা যায় যে, এ মাদ্‌রাসা ও চিকিৎসালয়ের জন্য সুলতান হোসাইন শাহ ভূমি দান করেছিলেন।[১১৭] তাঁর এই মাদ্‌রাসা ও খানকাহ কিছুদিনের মধ্যেই বাংলায় ইসলামি জ্ঞান অনুশীলনের প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। তৎকালীন পাণ্ডুয়ায় শায়খ নূর কুত্‌বুল আলমের এ মাদ্‌রাসাটি বাংলার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১১৮] শায়খ নূর কুত্‌বুল আলমের ইসলাম প্রচারের দু'টি পন্থা ছিল। যেমন ঃ -

১. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকল জনসাধারণকে উত্তম ব্যবহারের দ্বারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে তোলেন।

২. তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব সুলতান বা শাসকদের উপর বিস্তার করে খাঁটি ইসলামি প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখার প্রচেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় শায়খ নূর কুত্‌বুল আলম বাংলার নানা এলাকায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। যার দরুন্স পাণ্ডুয়ায় ইসলামি শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে উপমহাদেশে সুখ্যাতি লাভ করেছিল। শায়খ নূর-কুত্‌বুল আলমের মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। 'সিরাত আল আসরার' এর মতে, তিনি ৮১৮ হিজরি মোতাবেক ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১১৯] সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের সমকালীন একটি উৎকীর্ণ লিপি হতে জানা যায় যে, নূর কুত্‌বুল আলম ৮৩৫ হিজরি মোতাবেক ১৪৫৯ খিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তবে গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী তিনি ৮১৮ হিজরি মোতাবেক ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১২০] পাণ্ডুয়ায় পিতার সমাধির নিকটে তিনি সমাধিস্থ হন। পিতা ও পুত্রের এ মাযার ছোট দরগাহ নামে সুপরিচিত।

মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রহ:) (Mir Saiyed Ashraf Jahangir Simnani)

মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রহ:) ছিলেন বাংলার আধ্যাত্মিক জগতের একজন খ্যাতনামা সূফী ও পণ্ডিত। তিনি মধ্য এশিয়ার সিমনানের রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। তরুণ বয়সেই ধন-সম্পদ আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে তিনি তাপসের জীবন অবলম্বন করেন। অতঃপর জন্মভূমি ত্যাগ করে তিনি দিল্লীতে আগমন করেন এবং সেখানে সুপ্রসিদ্ধ সূফীদের সংস্পর্শে বসবাস করেন। তিনি শায়খ ইয়াহ্‌ইয়া মুনায়রীর শিষ্যত্ব গ্রহণের ব্যাকুল বাসনায় বিহারের দিকে রওয়ানা দেন। কিন্তু পথিমধ্যে সংবাদ পেলেন যে, তিনি জীবিত নেই। তখন বাংলায় আগমন করে তিনি শায়খ আলাউল হকের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তিনি (অর্থাৎ মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী) পাণ্ডুয়ায় ছয় বছরকাল অবস্থান করে বাংলার এই সুবিখ্যাত সিদ্ধপুরুষের নিকট আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করেন। সাফল্যের সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষা সমাপ্তি করার পর তিনি খিরকাহ লাভ করেন এবং তাঁর ওস্তাদ কর্তৃক জৌনপুরের খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি জৌনপুরে 'কাচৌচা শরীফের খানকাহ' নামে পরিচিত খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন।[১২১] কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর তার প্রভাব জৌনপুরের সুলতান ইব্‌রাহীম শর্কীর দরবারেও প্রসারিত হয়। তিনি ইব্‌রাহীম শর্কীকে রাজা গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ব্যাপারেও অনুপ্রাণিত করেন। অধুনা নূর কুত্‌বুল আলম ও আশরাফ সিমনানীর পত্রাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে।[১২২] তা থেকে জানা যায় যে, নূর কুত্‌বুল আলম সুলতান ইব্‌রাহীম শর্কীকে গৌড়

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণ করতে অনুরোধ জানালে সুলতান আশরাফ সিমনানীর পরামর্শ চান। এ থেকে অনুমেয়, বাংলার বাইরে অবস্থান করলেও তিনি বাংলার মুসলমানদের সমস্যার সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। এ সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও সূফীর মৃত্যু হয় জৌনপুরে আর সেখনেই তাঁর সমাধি বিদ্যমান।

শায়খ হোসাইন যুক্কারপোশ (Shaikh Hussain Zukkarposh)

পূর্ণিয়ার সুবিখ্যাত দরবেশ শায়খ হোসাইন যুক্কার পোশ বাংলার সূফী দরবেশ শায়খ আলাউল হকের শিষ্য ও খলিফা ছিলেন।[১২৩] তাঁর পিতার নাম বাবা কামাল এবং মায়ের নাম কাকো। তাঁরা ছিলেন উভয়েই গয়া জেলার সূফী-সাধক। তাঁর মায়ের জন্ম হয়েছিল একটি দরবেশ পরিবারে এবং তাঁর পিতার নাম হযরত সুলায়মান লস্কর-জমিন ও মা ছিলেন বিবি হান্দা। বিবি-হান্দা ছিলেন বিখ্যাত জেতলুলী দরবেশ মাখদুম শিহাব উদ্দীন পীর জাগযোতের কন্যা।[১২৪] পাণ্ডুয়ায় শায়খ হোসাইন যুক্কার পোশ ছিলেন নীর জাহাঙ্গীর সিমনানীর সহপাঠী। শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর শায়খ আলাউল হক কর্তৃক তিনি খলিফা নিযুক্ত হন । পূর্ণিয়ায় তিনি তাঁর ধর্মীয় ব্রতের কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁর ছেলে বসবাস করছিলেন পাণ্ডুয়াতে এবং তিনি সেখানে গণেশ কর্তৃক নিহত হন। জাহাঙ্গীর সিমনানী শোকানল পিতাকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন।[১২৫]

পূর্ণিয়ায় শায়খ হোসাইন যুক্কার পোশের মাযার অবস্থিত। যুক্কার পোশ অর্থ ধূলি ধূসরিত। সম্ভবত তিনি অতি সহজ-সরল ও দরিদ্র জীবন যাপন করতেন বলে তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১২৬]

শায়খ বদরুল ইসলাম (Shaikh Badrul Islam)

শায়খ বদরুল ইসলাম ছিলেন গৌড়ের শায়খ নূর কুতবুল আলমের সমসাময়িক মহান দরবেশ। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। ফলে রাজা গণেশ তাঁর প্রতি রুষ্ট হন এবং তাঁর উপর নিপীড়ন চালাতে থাকেন। রিয়াজুস্ সালাতীন গ্রন্থে তাঁর উপর রাজা গণেশের নিপীড়ন সম্পর্কিত নিম্নের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

একদা শায়খ মুঈনউদ্দীন আব্বাসের পিতা শায়খ বদরুল ইসলাম রাজা গণেশকে অভিবাদন না করেই তিনি তার সামনে বসে পড়েন। তাঁর এহেন আচরণের জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন, কোন শিক্ষিত লোক পৌত্তলিকদেরকে অভিবাদন করা শোভনীয় নয়। তাছাড়া তোমার মত নিষ্ঠুর ও রক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পিপাসু বিধর্মীর, যিনি মুসলমানদের রক্তপাত করছে। শায়খ বদরুল ইসলামের এ নির্ভীক উত্তরে রাজা গণেশ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হন। কিন্তু তখন তার করার কিছুই ছিল না।

অন্য একদিন রাজা নিচু ও সংকীর্ণ একটি দ্বার বিশিষ্ট কক্ষে বসে শায়খকে ডাকলেন। সেখানে শায়খ পৌঁছে রাজার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রথমে পা ঘরের মধ্যে রেখে পরে মস্তক অবনত না করেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাজা গণেশ রাগান্বিত হয়ে শায়খ বদরুল ইসলামকে তাঁর ভাইদের সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবার নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ শায়খকে হত্যা করা হয় এবং অন্যান্য আলিম ওলামাকে নৌকাযোগে নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে দেয়া হয়।[১২৭] মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী ও জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কীর নিকট লিখিত পত্রে এ শহীদ ওলামাদের কথা উল্লেখ করেন।

বদর শাহ্ (Badar Shah)

বদর শাহ্ চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন সুবিখ্যাত দরবেশ হিসেবে সুপরিচিত। অদ্যাবধি তাঁর প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। তিনি সাধারণত বদর শাহ্ , বদর আলম, বদরপীর, বদর আউলিয়া ও পীর বদর প্রভৃতি নামে পরিচিত। নদী মাতৃক এ পূর্ব-বাংলায় তাঁর প্রভাব এতই বেশি যে, মাঝি মাল্লারা এখনো নৌকায় যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর নাম উচ্চারণ করেই ছাড়ে।[১২৮] সপ্তদশ শতাব্দীর কবি মোহাম্মদ খান তাঁর পরিবারের ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে - তাঁর পূর্ব পুরুষ জনৈক হাজী খলীল, মাহী সওয়ার পীরের সাথে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। তখন তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান কদল খান গাজী ও বদর আলম। এ দু'জন সূফী দরবেশ শত্রুদের পরাজিত করে চট্টগ্রাম বিজয় এনেছিলেন।[১২৯]

বদর শাহ্ চট্টগ্রামের রক্ষক হিসেবে বিবেচিত হন। এ দরবেশ সিলেটের হযরত শাহ্ জালাল (রহ:) এর সমসাময়িক ব্যক্তি এবং তিনি সোনারগাঁও এর শাসক ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের আমলেই চাটগাঁয়ে পদার্পণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখিত ইতিহাস হতে জানা যায় যে, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের আমলে ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের দ্বারা সর্ব প্রথম চট্টগ্রাম বিজিত হয়।[১৩০] সুতরাং বদর শাহ্ ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামে সমাধিস্থ তাঁর অন্যতম সাথী মুহসিন আউলিয়ার কবর গাত্রের শিলালিপি হতে জানা যায় যে, ১৩৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর (মুহসিন আউলিয়া) মৃত্যু হয়েছিল। কাজেই এর ৫৭ বছর পূর্বে তাঁর অন্যতম সঙ্গী বদর শাহের মৃত্যু হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।[১৩১]

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ শফি উদ্‌দীন (Shah Safi uddin)

খুব সম্ভব শাহ্ শফি উদ্‌দীন ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে হুগলীর পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন। জানা যায় যে, তিনি একদল শক্তিধর বাহিনী সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি উলুগ-ই-আযম জাফরখান গাজীর ভাগ্নে এবং প্রধান শিষ্য ছিলেন শাহ্ বু-আলী কলন্দরের। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর পিতার নাম বরখুরদার এবং তিনি ছিলেন রাজ দরবারের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আর সুলতান ফীরূজ শাহের ভগ্নিপতি। তিনি বাংলায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। হুগলীতে এসে তিনি দেখতে পেলেন যে মুসলমানদের উপর সেখানকার হিন্দুরাজা পাণ্ডব অত্যাচার করছেন। জনৈক মুসলমান তার ছেলের খাৎনা উপলক্ষে একটি গরু জবাই করে; এ কারণে পাণ্ডব রাজা সেই বালককে হত্যা করেন। এর প্রতিবাদের জন্য দরবেশ তাঁর মামা ফীরূজ শাহের একদল সৈন্য প্রার্থনা করেন। শায়খ শরফউদ্‌দীন বু'আলী কলন্দরের (মৃত্যু ১৩২৪ খ্রি:)। আশীর্বাদ নিয়ে শাহ্ শফি উদ্দীন এই সৈন্য বাহিনীর মাধ্যমে এবং জা'ফর খান গাজী ও যাহরাম সাকাকারের সাথে মিলিত হয়ে পাণ্ডব রাজাকে পরাজিত করেন।[১৩২]

মওলানা আতা (Maulana Ata)

(মৃ.- ১৩৬৩ সালের পূর্বে)

মওলানা আতা দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। সমাধিতে চারটি উৎকীর্ণ শিলালিপি রয়েছে এবং তাঁকে একজন মহান সূফী-দরবেশ ও সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩৩] খুব সম্ভব তিনি ১৩০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দিনাজপুর আগমন করেন। মওলানা আতা একটি সমজিদ নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেছিলেন । কিন্তু তা সম্পন্ন করার আগেই ইহধাম ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর এ অসম্পূর্ণ কাজটি সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রি:) সম্পন্ন করেন।[১৩৪] তাঁর দরগাহ থেকে চারটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপির তারিখগুলো হচ্ছে ১৩৬৩, ১৪৮২, ১৪৯১ ও ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুস্পষ্টভাবে এসব শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর নাম হচ্ছে মওলানা আতা এবং তিনি প্রাথমিক যুগের একজন দরবেশ ছিলেন। সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে তিনি ১৩৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। অদ্যাবধি তাঁর দরগাহে একটি তীর্থস্থান রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়্যিদুল আরিফীন (রহ:) (Saiyedul Ariafin (R.)
(১৪শ শতক)

এ সূফী সাধকের আসল নাম তাঁর সম্মান বাচক উপাধির মাঝে চাপা পড়ে গিয়েছে, একটু লক্ষ্য করলেই তা' বুঝা যায়। সাইয়্যিদুল আরিফীন (দরবেশদের নেতা) নাম না হয়ে উপাধি বিশেষণ হওয়ার সম্ভাবনাই যে বেশি তা' বলাই বাহুল্য।[১৩৫] জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, মধ্য এশিয়া বিজয়ী বীর তৈমুর লং-এর আমলে (১৩৬১-১৪০৫ খ্রি:) অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে তাঁরই নির্দেশে তিনি এ দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।

কিংবদন্তী হতে জানা যায়, ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র বাংলায় পরিভ্রমণ করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল যেখানে ইসলামের আলো অদ্যাবধি প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি, সেই অঞ্চলে তিনি আস্তানা স্থাপন করবেন। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে, সমগ্র বাংলায় ইসলামের প্রসার লাভ করেছে। তবে তিনি বহু সংখ্যক নদ-নদী বেষ্টিত বরিশাল জেলা ভ্রমণকালে এমন বহু স্থান দেখেন, যেখানে একজনও মুসলমান নেই। এমনি একটি স্থান যার নাম ছিল কালিগুঁড়ি।[১৩৬] তিনি এখানেই স্বীয় আস্তানা স্থাপন করেন। পটুয়াখালী ও বরিশালের এ অঞ্চলে তিনি বহু অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। সুতরাং এ এলাকার মুসলমানরা হযরত সাইয়্যিদুল আরিফীন (রহ:)-কে বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের সর্ব প্রথম ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম গণ্য করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁকে এস্থানেই সমাহিত করা হয়। অদ্যাবধি তাঁর দরগাহটি তথায় পাকা অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।[১৩৭]

রাস্‌তি শাহ্ (Rashti shah)

খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কুমিল্লা জেলার সুবিখ্যাত ইসলাম প্রচারক ছিলেন রাস্‌তি শাহ। তিনি বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রহ:) -এর বংশধর বলেন সুপরিচিত। জানা যায় যে, তিনি ভারত-সম্রাট ফীরূজশাহ্ তোগলকের রাজত্বকালে (১৩৫১-৮৮ খ্রি:) বাংলায় আগমন করেন।[১৩৮] এ দরবেশ বাদ্‌শাহর নিকট শাহ্‌তলী মৌজা নিষ্কর পেয়েছিলেন। তথায় তিনি নিষ্কর ভূমি পেয়ে স্বীয় আস্তানা স্থাপন করেন এবং ইসলামের মহান বাণী জনসাধারণের মাঝে পৌঁছাতে প্রয়াস পান। তিনি দক্ষিণ কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালী এলাকার অনেক লোককে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাঁর নামানুসারে সে অঞ্চলের নাম হচ্ছে রাস্‌তি শাহ্।[১৩৯] কালিবাড়ী ষ্টেশনের পূর্ব দিকে শ্রীপুর গ্রামে তাঁর সমাধি বিদ্যমান। সর্ব প্রথম তিনি নোয়াখালী জেলায় তাবলীগের কাজ করেন এবং শেষের দিকে কুমিল্লার শ্রীপুর এসে খানকাহ্ ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অলৌকিক কাহিনী ও কারামত কিংবদন্তীর ন্যায় বিক্ষিপ্ত রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ মুহাম্মদ বাগদাদী (Shah Muhammad Baghdadi)

রাস্তি শাহের সমসাময়িক অন্যতম ইসলাম প্রচারক ছিলেন শাহ্ মুহাম্মদ বাগদাদী। তিনি বাগদাদ নগরে জন্মগ্রহণ করেন, যেহেতু তাঁর নামের বিশেষণ থেকেই তা প্রমাণিত হয়।[১৪০] তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পীরের নির্দেশে তিনি শাহ্তলী অঞ্চলে আগমন করেন। আর ইসলাম প্রচার করেন। দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহের কাছ থেকে তিনি শাহ্তলী মৌজা নিষ্কর সম্পত্তি হিসেবে পান এবং তিনি সেখানে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেন। শাহ্ মুহাম্মদ বাগদাদী ও রাস্তি শাহ্ উভয়ে তাঁরা চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে আর তাঁরা একযোগে দ্বীনের খেদমতের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে তাঁদের প্রচেষ্টায় কুমিল্লা জেলায় ইসলামের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়।[১৪১] কুমিল্লা জেলার শাহ্তলী রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী শাহ্তলী খন্দকার বাড়িতে তাঁর সমাধি বিদ্যমান।

শাহ্ লঙ্গর (রহ:) (Shah Langor (R.)

শাহ্ লঙ্গরের আসল নাম জানা যায় না। তবে লঙ্গর শব্দটি প্রকৃতপক্ষে কোন নাম হতে পারে না। বোধ হয় এটি লঙ্গরখানা শব্দের অংশ বিশেষ। সাধারণ্যে তিনি শাহ্ লঙ্গর নামে সুপরিচিত। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন, কোথা থেকে কিভাবে বাংলায় আসেন, কোথায় শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন, এ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য জানা যায় না। জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি ছিলেন বাগদাদের রাজপুত্র এবং সংসার বিরাগী রাজপুত্র বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করে সূফীবাদে দীক্ষিত হলেন।[১৪২] চতুর্দশ শতকের শেষপাদে বা তাঁরও বহু পূর্বে তিনি বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। সেকালে এ দরবেশ সোনারগাঁয়ের উত্তর দিকে মুয়ায্যমপুর গ্রামে এসে স্বীয় আস্তানা স্থাপন করেন। সম্ভবত ইসলাম প্রচারের সূচনায় হযরত জালাল উদ্দীন তাবরিজীর মতোই এ দরবেশও তাঁর আস্তানায় দরিদ্রের জন্য একটা লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এ জন্যেই উপকৃত দরিদ্র জনগণ শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে "শাহ্ লঙ্গর " আখ্যা দিয়েছিল।[১৪৩]

বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার মুয়ায্যমপুর গ্রামে তাঁর সমাধি বিদ্যমান। এ সমাধির নিকটেই একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদ গাত্রের উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় যে, গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৩১-১৪৪২ খ্রি:) মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এই সুলতানের আমলে কিংবা তৎপূর্বে ইন্তেকাল করেন।[১৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ বখতিয়ার মাইসূর (Shaikh Bakhtiar Maisur)

বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে যে সকল সূফী দরবেশ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন তন্মধ্যে শায়খ বখতিয়ার মাইসূর অন্যতম। তিনি ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়ে তথা ১৩'শ কিংবা ১৪'শ শতকের দিকে এদেশে আগমন করেন। বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায় যে, এ মহাপুরুষ নোয়াখালী জেলার ধর্ম প্রচারক মওলানা সায়্যিদ আহমদ তান্নুরীর সাথে দিল্লী হতে বাংলায় আসেন। কেউ কেউ তাঁকে ১৩'শ শতকের আবার কেউ তাঁকে চৌদ্দ শতকে বাংলায় ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে মনে করেন।[১৪৫] "দ্বীপ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান অপরিসীম"।[১৪৬] কিংবদন্তী রয়েছে যে, তিনি সমুদ্র পথে মাছের পীঠে চড়ে এ দেশে আসেন। তবে এ কথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তাঁর মুর্শীদের নির্দেশে তিনি সমুদ্র উপকূল বিশেষ করে দ্বীপাঞ্চলে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন এবং তিনি এতে সফলতা লাভ করেন। সন্দ্বীপ ও হাতিয়া অঞ্চলে তিনি তাঁর কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন। তাঁর সমাধি সন্দ্বীপের রোহিনী নামক স্থানে বিদ্যমান।[১৪৭]

সৈয়দ নেকমর্দান (রহঃ) (Saiyed Nekmordan (R.)
(১৪শ শতক (অনুমিত)

তিনি ছিলেন দিনাজপুর জেলার সুবিখ্যাত সূফী-দরবেশ। তাঁর পূর্ণ নাম সৈয়দ নাসিরউদ্‌দীন শাহ্ নেকমর্দান। তবে তিনি জনগণের মধ্যে নেকমর্দান নামে সুপরিচিত । কারণ তিনি অত্যন্ত পরহিযগার ছিলেন বিধায় তাঁকে সেকমর্দান নামে অভিহিত করা হয়।[১৪৮] পরবর্তী সময়ে তাঁর এ নাম থেকেই তাঁর বাসস্থান এলাকার নামও 'নেকমর্দান' হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। সৈয়দ নেকমর্দান সম্বন্ধে কিংবদন্তী রয়েছে যে, সেকালে এ অঞ্চলে নাথপন্থীদের প্রাধান্য ছিল এবং সেখানে নাথ পন্থীদের গুরু গোরক্ষনাথের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভীমরাজ ও পৃথ্বীরাজ নামক দু'জমিদার ভ্রাতা ছিলেন এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষাক। কোন মুসলিম পর্যটক এদের সমসাময়িককালে আগমন করলে এ ভ্রাতৃদ্বয় তাদের প্রতি নির্মম অত্যাচার করতেন। এর কারণ হচ্ছে এ অঞ্চলে মুসলমান পরিব্রাজক এবং দরবেশগণ হিন্দু জনসাধারণের উপর এমন গভীর প্রভাব ফেলে যাতে তারা কোন পথ দিয়ে গমনাগমন করার সময়ে হিন্দুরা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতো। এতে দরবেশদের প্রতি জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় নির্মমভাবে অত্যাচার করতো আর এ সংবাদ সৈয়দ নেকমর্দানের কর্ণকুহুরে পৌঁছে। ফলে সুদূর বিদেশ থেকে তিনি এ অঞ্চলে আসেন। দু'অত্যাচারী জমিদার তাঁকে কিছু করতে পারেনি। শেষ অবধি ওদের পতন ঘটে।[১৪৯] অবশ্য তারা একবার নেকমর্দানকে হত্যা করার প্রচেষ্টা করেছিল। এ সংবাদ প্রচারিত হলে আরব পারস্য হতে আগত অনেক

Dhaka University Institutional Repository

সাধুলোক দু'অত্যাচারী ভ্রাতাকে নিহত করেন। সেকাল থেকে এ অঞ্চল (বর্তমান ঠাকুরগাঁও) -কে নেকমর্দ বলা হয় এবং সৈয়দ নাসির উদ্‌দীন শাহ্-কে নেকমর্দের পীর বলে অভিহিত করা হয়।[১৫০] পরিশেষে দিনাজপুরের এ অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠে। প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক দিনাজপুরের নেকমর্দান। তাঁর সমাধি ও খানকাহ ঠাকুরগাঁয়ের রাণী সংকৈল থানার নেকমর্দন নামক স্থানে বিদ্যমান। তাঁর সম্পর্কে দিনাজপুর গেজেটিয়ারে বর্ণিত আছে - ... ... " One of the best known of these saints appears to have been Saiyed Nekmardan, in memory of whom, a great fair or mela is still held at Nekmard in the Ranisankail thana, No proper monument of this saint is preserved, but Nekmard, the place where he lived is regarded as especially holy." [১৫১]

স্থানটির পূর্ব নাম ভবানন্দপুর ছিল। এরও পূর্ববর্তী নাম করবর্তন ছিল ইত্যাদি। কিন্তু পুন্যাত্মা দরবেশের আগমন, অবস্থান এবং তদীয় শিষ্যদের বসতি স্থাপনের কারণে ভবানন্দপুরে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠে এবং যুগযুগ দরবেশের নামানুসারে স্থানটিরও নাম নেকমর্দন হয়।[১৫২]

চিহিল গাজী (Chihil Ghazi)

চিহিল ফার্সি শব্দ এর অর্থ চল্লিশ আর গাজী অর্থ জিহাদকারী। মূলত চিহিল গাজী কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। কারণ কোন এক সময় ধর্ম প্রচারকালে জিহাদ করায় " গাজী" উপাধি পেয়েছিলেন। সুতরাং চিহিল শব্দ ব্যবহৃত হয় চল্লিশ জন দরবেশ অর্থে। আর এখন 'চিহিল' বলতে কোন একজন দরবেশ বোঝানো হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে কোন্ সময় 'চিহিল গাজী' (চল্লিশ জন গাজী) দিনাজপুর আগমন করছিলেন বলা দুষ্কর। যাহোক তাঁরা রণনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন এবং ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত।[১৫৩]

আরব, ইরান ও বাগদাদ প্রভৃতি দেশ হতে যে সকল ধর্ম প্রচারক সূফী-দরবেশ বাংলায় আগমন করে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। আর এদেশের জন সাধারণের সম্মুখে ইসলামের আদর্শ ও মাহাত্ম্য তুলে ধরেন, তাঁদের মধ্যে দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশে একদল দরবেশ স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পূর্ব থেকেই এ স্থানটি হিন্দু প্রভাবে ভরপুর ছিল। স্থানীয় শাসকগণ বহু বাঁধা দেওয়া সত্ত্বেও সূফী-দরবেশদের এ প্রচার কার্য কেউ রোধ করতে পারেনি। বরং অনেকে শাহাদতবরণ করেছেন রাজার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে । চল্লিশজন শহীদ হয়েছেন। পাশাপাশি এ চল্লিশজন যোদ্ধাকে সমাহিত করা হয়। সকল কবর কালের গতিতে মিশে গেছে। এ চিহিল বা চল্লিশ গাজীর নাম এখনো জানা যায়নি। কিন্তু এদের দলপতির নাম হচ্ছে শায়খ জয়নুদ্দীন সোহেল বাগদাদী। সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী তিনিই চিহিল গাজী নামে

Dhaka University Institutional Repository

সুপরিচিত।[১৫৪] তাঁর পীর ছিলেন কুতুব উদ্‌দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ) (১১৮৬-১২৩৭ খ্রিঃ)। ১২৩৭ খ্রিঃ পীরের ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর স্বপ্নাদেশ পেয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তের শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিহার হতে দিনাজপুরে আসেন। এখানে আস্তানা প্রতিষ্ঠা করে জন সাধারণের মাঝে ইসলাম প্রচার করেন এবং তের শতকের শেষে তাঁর ওফাত হয়।[১৫৫] তাঁর সমাধিটি দিনাজপুর শহর থেকে ৪.৮৩ কিলোমিটার উত্তরে বিদ্যমান। এছাড়া দিনাজপুর জেলার নানা অঞ্চলে আরও যারা ইসলাম প্রচার করেন তারা হলেনঃ- গোরা সৈয়দ সাহেব, পীর মানিক জাহান, হযরত বালা শহীদ, গোরা শহীদ সাহেব, মওলানা আফতাব উদ্‌দীন কুতুব, শায়খ সিরাজউদ্‌দীন আউলিয়া হোসাইন মুরিয়া বাগদাদী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তাদের জীবন কথা ও ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত বর্ণনা জানা যায় না ।

শাহ্ তুর্কান শহীদ (রহঃ) (Shah Turkan Shahid (R.)

হযরত শাহ্ তুর্কান শহীদ (রহঃ) মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে এদেশে আগমন করেন। বিশেষ করে তিনি উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায় স্বীয় আস্তানা স্থাপন করেন। তখনও তাঁর আগমনকালে উত্তরবঙ্গে প্রতাপশালী হিন্দু শাসকদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তৎকালীন বাংলার রাজা বল্লাল সেনের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে এ সিদ্ধ পুরুষ কিছু সংখ্যক সহচর ও শিষ্য নিয়ে কঠিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি অকুতোভয়ে ইসলামের মান মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুদ্ধ করে আত্মোৎসর্গ করেন। এ জন্য তিনি শহীদ নামে আখ্যায়িত হন।[১৫৬]

করতোয়া নদীর অদূরে শেরপুর নামক স্থানে তাঁর যুগল-সমাধি বিদ্যমান রয়েছে। এ যুদ্ধে তাঁর মস্তক দেহচ্যুত হয়। যেখানে তাঁর শির মোবারক সমাহিত করা হয় তাঁকে বলা হয় 'শির মোকাম' এবং দেহ বা ধড় যে স্থানে দাফন করা হয় তাকে বলা হয় 'ধড় মোকাম'। এভাবে স্বীয় জীবন দান করে তিনি ইসলাম প্রচারের পথ সুগম করেছেন। শাহ তুর্কানের সমাধি সর্বদা বহু লোকজন শ্রদ্ধা সহকারে যিয়ারত করে থাকেন। এ সূফী-দরবেশ সম্পর্কে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক W.w. Hunter উল্লেখ করেছেন ঃ-

" Turkan shahid was a Gazi Salin in the battle by the Hindoo king Ballal Sen. One Shrine is called 'Sir Mokam' where the head fell and the other 'Dhar Mokam' where his body fell. The Shrines or Darghas of Turkan Shahid are highly revered."[১৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা তাকীউদ্‌দীন আল্ আরাবী (রহঃ) (Maulana Takiuddin Al Arabi (R.)

মওলানা তাকীউদ্‌দীন আল্ আরাবী (রহঃ) এর জীবন কথা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে নামের শেষে উপাধি দেখে মনে হয়, তিনি ছিলেন আরব দেশীয়। কিন্তু তিনি যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এ দেশে পদার্পণ করেন এবং রাজশাহী জেলার মাহিসুনে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ মিলে ।[১৫৮] মওলানা তাকী উদ্‌দীন আল আরাবীয়ার শিষ্য ও ছাত্র ছিলেন সোনার গাঁয়ের সুবিখ্যাত সূফী শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রীর পিতা শায়খ ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাহিসুনের মাদ্‌রাসায় শায়খ মুনায়রী শিক্ষা লাভ করেন। ৬৯০ হিজরি মোতাবেক ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ মুনায়রী ইন্তেকাল করেন।[১৫৯] এ থেকে অনুমেয় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে মওলানা তাকী উদ্‌দীন বাংলাদেশে আসেন আর মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন রাজশাহীর মাহিসুনে। খুব সম্ভব তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা যেটি এদেশের প্রথম মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে আরবী ও ইসলামি শিক্ষা বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া হতো। তিনি আরব দেশ থেকে বাংলাদেশে আসেন ইসলাম প্রচার ও ইসলামি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে। ইসলামি বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন পারদর্শী খ্যাতি সম্পন্ন উচ্চ পর্যায়ের আলিম। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছাত্ররা ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে এসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাহিসুনের মাদ্‌রাসায় বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে একত্রিত হতো।[১৬০] এদেশেই তিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন না কী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। নিশ্চিতভাবে তা জানা যায় না। কিন্তু তিনি কতকাল জীবিত ছিলেন এবং ইন্তেকাল করেন কোথায় তাও জানা যায় না; কোন উপায়ও নেই জানার।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে এবং পরে তথা সূফী-সাধক ও পীর আউলিয়ার বাংলায় আগমনের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও অসংখ্য পীর আউলিয়ার আগমন ঘটেছিল বলে জানা যায়। এদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য।

পীর গোরাচাঁদ (Pir Gorachad)

খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলার দক্ষিণবঙ্গ[১৬১] অঞ্চলে আগত ইসলামের মশালবাহী প্রথম সূফী সাধকের প্রকৃত নাম হচ্ছে সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কী। সাধারণ্যে তিনি "পীর গোরাচাঁদ" নামেই সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।[১৬২] 'তাযকিরাতুল কিরাম' ও 'তারীখ্-ই-খুলাফা-ই-আরব বা ইসলাম' নামক ইতিহাসদ্বয় থেকে জানা যায় যে, ৬৬৪ হিজরি মোতাবেক ১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার জমজম মহল্লায় এ সাধকের জন্ম হয়। ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে ভারত সম্রাট গিয়াসউদ্‌দীন তুগলকের রাজত্বকালে

Dhaka University Institutional Repository

(১৩২০-১৩২৪ খ্রি:) তদীয় পীর শাহ্ হাসানসহ তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সম্রাট যখন বিদ্রোহ-দমনের জন্য বঙ্গে উপস্থিত হন, তিনিও তখন সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে আগমন করেছিলেন। পরে তিনি আর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন নি। বরং এখানেই তিনি বসবাস করতে থাকেন। ৭২৪ হিজরি অর্থাৎ ১৩২৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট গিয়াসউদ্দীন তুগলক লক্ষণাবতী (গৌড়) আক্রমণ করেছিলেন। সুতরাং এ সময়ে পীর গোরাচাঁদ চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার শুরু করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৬৩] জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, সাইয়েদ আব্বাস আলী মককী যে সময়ে চব্বিশ পরগণায় আগমন করেন; তখন চন্দ্রকেতু নামক এক হিন্দু রাজা সে অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। স্থানীয় মুসলিম শাসনকর্তার সহায়তায় তিনি রাজা চন্দ্রকেতুর ধ্বংস সাধন করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি হাতিয়াগড়ে গিয়ে স্থানীয় রাজা মহিদানন্দের পুত্র অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দ নামক আরও দু'জন স্থানীয় হিন্দু সামন্তের সাথে তাঁর বিরোধ ও যুদ্ধ বাঁধে। এতে বকানন্দ নিহত ও স্বয়ং পীর গোরাচাঁদ আহত হন। তিনি আহত অবস্থায় বালেন্ডার নিকটবর্তী হাড়োয়া গমনের পর সেখানেই ইন্তেকাল করেন বলে জানা যায়। মাযারের উপর গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ্ এক সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন এবং ৫০০ একর জমিও দরগার ব্যয় নির্বাহের জন্যে লাখেরাজ স্বরূপ দান করেন।[১৬৪]

শরীফ শাহ্ (রহ:) (Sharif shah (R.)

হযরত শরীফ শাহের প্রচেষ্টায় বাংলার দণিক্ষবঙ্গে তথা বাগেরহাট, খুলনা, যশোর ও চব্বিশ পরগণায় ইসলাম প্রচারিত হয়। তিনি কোন্ দেশ হতে এবং কোন সময়ে এদেশে আগমন করেন সঠিকভাবে তা জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে, সাইয়েদ আব্বাস আলী মককীর সমসাময়িককালে কিংবা তার অনতিকাল পরে এখানে আসেন। কলকাতার দক্ষিণে ক্যানিং এলাকায় ঘুটিয়ারী শরীফে অবস্থিত শরীফ শাহের দরগাহ বিশিষ্ট তীর্থ কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছে এ অঞ্চল। প্রচলিত জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি সুন্দরবন এলাকায় ব্যাপক ইসলাম প্রচার করেন।[১৬৫] এখানে প্রতি বছর ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। এতে দূর-দূরান্ত থেকে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন লোক আগমন করে থাকেন । এ থেকে অনুমিত হয় যে, তাঁর দ্বারা ব্যাপক ইসলাম প্রচারের স্বীকৃতি মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

তাপসী রওশন আরা মক্কী (রহঃ) (Taposi Rowshan Ara Makki (R.)
(১২৭৯-১৩৪২ খ্রিঃ)

বাংলার দক্ষিণবঙ্গ তথা বাগেরহাট, খুলনা যশোর ও ২৪ পরগণা অঞ্চলে ইসলাম প্রসারের সাথে রওশন আরার নাম বিজড়িত। স্থানীয় কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, তিনি ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়েদ করিম উল্লাহ ও মাতার নাম মেহেরুন্নেসা। রওশন আরার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আব্বাস[১৬৬] আলী তাপসের জীবন যাপনের জন্যে যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেন। রওশন আরা একজন শিক্ষিতা ও বিদূষী মহিলা ছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্‌দীন তুগলকের শাসনামলে ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বীয় ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূসহ শায়খ শাহ্ হাসানের সাথে দিল্লীতে আগমন করেন।[১৬৭] শাহ্ হাসান ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁর শিষ্যদের মধ্য হতে ১৬৫ জনকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। রওশন আরা, তদীয় ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ এবং আরও কয়েকজন বাংলায় আসেন। সে সময়ে অর্থাৎ ১৩২৫-২৬ খ্রিঃ গিয়াসউদ্‌দীন তুগলক বাংলায় অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁরা তারাগুনিয়ায় বসতি স্থাপন করেন এবং ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে রওশন আরা ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১৬৮]

জাফর খান গাজী (Zafor Khan Gazi)
(মৃ. ১৩১৪ খ্রিঃ)

লক্ষণাবতী ও সাতগাঁও রাজ্য অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারের সাথে এ দরবেশের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁর প্রকৃত নাম উলুগ-ই-আযম হুমায়ূন জাফর খান বাহরাম ইৎসীন। খুব সম্ভব তিনি লক্ষণাবতীর সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউসের (১২৯১-১৩০১ খ্রিঃ) অধীনস্থ ছিলেন একজন সেনাপতিরূপে।[১৬৯] সুলতানের আদেশে তিনি বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে যান। তিনি বরেন্দ্র ও রাঢ় অঞ্চলে ব্যাপক ইসলাম প্রচার করেন। দিনাজপুর জেলার দেবীকোটে প্রাপ্ত মসজিদটির ধ্বংসস্তূপের মাঝে অক্ষত অবস্থায় একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, জাফর খান গাজীর আদেশে মুলতানবাসী মালিক জিজীওন্দ কর্তৃক মসজিদটি ১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়। সমাধি গাত্রের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, ৭১৩ হিজরি মোতাবেক ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ফীরূজশাহের (বাংলার) শাসনকালে ইসলামের ও রাজন্যবর্গের সাহায্যকারী ও বিশ্বাসীদের পৃষ্ঠপোষক হযরত খান জাহান আলী (রহঃ), জাফর খান গাজী, বড় খান গাজী কর্তৃক 'দ্বার-আল-খায়রাত' নামে একটি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করা হয়েছে।[১৭০] ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে অন্য একটি শিলালিপিতে জাফর খান গাজীকে 'সিংহদের সিংহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি প্রতিটি অভিযানে

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের নানা শহর দখল করেছেন আর তিনি তাঁর তরবারী ও বর্শার মাধ্যমে বিধর্মী বিদ্রোহীদেরকে ধ্বংস করেছেন।[১৭১] জাফর খান গাজী (রহ:) এর নির্মিত সুউচ্চ একটি মিনার হুগলীর ছোট পাণ্ডুয়ায় রয়েছে। ত্রিবেণী বিজয়ের পর সম্ভবত ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জাফর খান গাজী গভীরভাবে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর ধর্মের সম্প্রসারণ কল্পে তিনি সংগ্রাম করেছেন। তাঁর সমাধির খাদিমদের দ্বারা সংরক্ষিত তাঁর 'কুরসী-নামায়' মুসলমানদের জন্য এ সূফী গাজীর সেবা ও ত্যাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। জাফর খান গাজী তাঁর ভাগ্নে শাহ্ সূফীকে সাথে নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় পদার্পণ করেন। রাজা মান নৃপতিকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন। তবে তিনি হুগলীর রাজা ভূদেবের সাথে একটি যুদ্ধে নিহত হন। জাফর খান গাজীর ছেলে উগয়ান খান অবশ্য রাজা ভূদেবকে পরাজিত করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন।[১৭২]

উপরি-উক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল ইসলামের বিজয়, ইসলামের প্রসার ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা । এ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তিনি বলিষ্ঠ হস্তে তরবারি ধারণ করেছিলেন। তিনি উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারের দীর্ঘতম প্রতিবন্ধকতা দূর করে অসীম সাহসিকতার সাথে ইসলামের অগ্রযাত্রা প্রবাহমান রাখেন। ১৩১৪ খ্রিষ্টাব্দে এ মুজাহিদ ত্রিবেণীতে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁকে সেখানকার একটি প্রস্তর নির্মিত দেবালয়ে সমাধিস্থ করা হয়।

বড়খান গাজী (BaroKhan Gazi)

বড় খান গাজী ও উগয়াখান গাজী হচ্ছেন ত্রিবেণী বিজেতা উলুগ-ই-আযম জাফর খান গাজীর দু'ছেলে। বাগেরহাট, খুলনা, যশোর ও চব্বিশ পরগণায় বড় খান গাজী সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী রয়েছে। এ মুজাহিদের সঙ্গে হিন্দু নৃপতিদের যুদ্ধের কাহিনী মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বর্ণিত আছে। ''কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল ' কাব্যে এবং 'গাজী কালু চম্পাবতী' নামক পু"থিতে এ গাজীর সাথে যশোরের রাজা মুকুটরায় ও দক্ষিণবঙ্গের রাজা দক্ষিণা রায়ের যুদ্ধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে''।[১৭৩] গাজী এ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এ মুকুট রায় গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৮-১৩৯১ খ্রি:) রাজত্বকালে সামন্ত রাজা মুকুটরায় হতে পারেন বলে মনে হয়। উলুগ-ই-আযম জাফর খান গাজীর ত্রিবেণী বিজয়ের পর দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিরোধ দুর্গ ভেঙ্গে যায়। তখন তাঁর সুযোগ্য পুত্র এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন আর দক্ষিণ দিকে বিজয় অভিযান পরিচালনা করবেন এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং মনে হয় জাফর খান গাজীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বড় খান গাজী দক্ষিণ অঞ্চলের জেলা সমূহে ইসলাম প্রচার করেন। আর ভূদেবকে পরাজিত করেন এবং তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন।[১৭৪]

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খান জাহান আলী (রহ:)[১৭৫] (Hazrat Khan Jahan Ali (R.)

(১৩৭৯-১৪৫৯ খ্রি:)

তিনি বঙ্গের ইতিহাসে সাধারণত খান জাহান আলী এবং দক্ষিণ বঙ্গের জনগণের মাঝে পীর খাজালী নামে সমধিক পরিচিত । তিনি ছিলেন বাংলার মুজাহিদ দরবেশগণের অন্যতম। জনশ্রুতি মতে তাঁকে মুসলিম শাসন সম্প্রসারণ ও ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে মূল্যবান কৃতিত্ব রেখে গেছেন। আধুনিক যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার দুর্গম অঞ্চলগুলো জয় করেন এবং ঐ এলাকা সমূহ আবাদি করে গড়ে তোলেন । আর এ অঞ্চলসমূহ আয়ত্বাধীনে আনয়ন করার পর, তিনি লোক সমাজে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মনোনিবেশ করেন।[১৭৬] বাগেরহাটে তাঁর সমাধিগাত্রে যে উৎকীর্ণ শিলালিপি প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলোর সাথে জনপ্রবাদে বর্ণিত ঘটনাবলীর যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাঁকে খান জাহান, ইহজগত ও পরজগতের শিক্ষা গুরু, ধার্মিকদের অনুরাগী, বিদ্বান, ইসলাম ও মুসলমানদের সহায়তাকারী আর অবিশ্বাসী ও বিধর্মীদের শত্রুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে করে তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে (৮৬৩ হিজরি /১৪৫৯ খ্রি:) তাঁর সমাধির উপর একটি সৌধ নির্মাণের বিবরণও দেয়া হয়েছে।[১৭৭] এ অঞ্চলের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরে ধর্মপরায়ণতা, সাধুতা ও জনসেবা দ্বারা এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে, তিনি মূলত এ অঞ্চলের সনদপ্রাপ্ত পুনর্বাসনকারী কর্মচারী এবং পরে শাসনকর্তা হলেও জনসাধারণ তাঁর জীবনকালেই তাঁকে অলি-দরবেশ বলে মান্য করতো এবং তাঁর অনুকরণে বহু রাস্তা নির্মাণ, অসংখ্য দিঘি খনন এবং অনেক মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন । বাগেরহাট শহরটি তাঁরই নির্মিত এবং তিনিই এর নাম রাখেন খলিফাতাবাদ।[১৭৮]

তাঁর বিরাট একটি কীর্তি হলো বাগেরহাটের প্রকাণ্ড ষাট গম্বুজ মসজিদ। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁর জীবিতকালে একজন সিদ্ধপুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধা লাভ করেন এবং অদ্যাবধি হিন্দু-মুসলমান সমভাবে গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম স্মরণ করে থাকে। চৈত্র-পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতি বছর (এপ্রিল) এই কামেল পুরুষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্তে হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হয়। এ সময় তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয় ।[১৭৯]

বস্তুত বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দক্ষিণবঙ্গে ইসলামের জয়যাত্রা সূচিত হয়। এই জয়যাত্রার নেপথ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে ছিলেন সূফী সাধক, জ্ঞানী, দয়ালু ও জননেতা হযরত খান জাহান আলী (রহ:)।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ :

১ K.N. Dikshit, Memoirs of the Archaeological survey of India, No, 55, Delhi, 1938, p. 87; Abdul Karim, Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D. 1538), 2nd Revised Edition, Baitush sharaf Islamic Research Institute, Chittagong, 1985, p. 26; F.A. Khan, Recent Archaeological Excavations in East Pakistan, Karachi, p. 11; Muhammad Abdur Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol. I, (1201-1576), University of Karachi, 1963, p. 46.

২ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, প্রথম সংস্করণ, আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৯৪৮, পৃ. ১২

৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১২

৪ K.N. Dikshit, Ibid, p. 87

৫ ডঃ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪০

৬ Mehrab Ali, Eksha Teish Hijrir Shilalipi (Inscription of 123 A.H.) Dinajpur Museum Series No. 4

৭ A.K.M. Yaqub Ali, Aspects of Society and Culture of Barind 1200-1576 A.D., Ph. D. Thesis, (Unpublished) Rajshahi University, 1981, p. 456

৮ Abdul Karim, op. cit, p. 27

৯ দৈনিক বাংলা, ২০ এপ্রিল, ১৯৮৬, পৃ. 8

১০ JASB, 1844, p. 36; Abdul Karim, Ibid, p. 33; আবদুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ. ২০

১১ JASB, 1844, p. 36; Abdul Karim, Ibid, p. 33

১২ E. Haq and A. Karim, Arakan Rajsabhaya Bangla Sahitya (Bengali Literature in the Arakanese Court), Calcutta, 1935, p. 34

১৩ আবুল করিম, পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৫

১৪ Bernavilli suggests that the name Chittagong Originated from the Arabs, S.N.H. Rizvi(ed.), East Pakistan District Gazetteers, Chittagong, East Pakistan Government Press, Dacca, 1970, p. 1

১৫ Muhammad Abdur Rahim, op. cit., pp. 43- 44

১৬ যেমন চট্টগ্রাম শহরের কদম মোবারক, শেখ ফরীদের চশমা, পটিয়া থানায় বাগিচায় মসজিদ এবং বাঁশখালী থানায় কদম রসুল গ্রাম ইত্যাদি। আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

১৭ আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৫৯

১৮ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৫২

১৯ K.A. Nizami (Dr. M. Zaki (ed.)), Arab Accounts of India, (During the fourteenth Century), Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, Aligarh, 1981, p.51

২০ Richard Symonds, The making of Pakistan, Allies Book Corporation, Karachi, 1966, p. 197

২১ Sir H.M.Elliot and professor John Dowson, The History of India as told by its own Historians, Vol. I, Kitab Mahal, Allahabad, 1964, p. 2

২২ সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ও ইসলাম, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৩৯৪, পৃ. ২৪

২৩ আরাকানের প্রাচীন নাম রোখাঙ্গ এর অপভ্রংশ

২৪ S. Muhammad Husayn Nainar, Arab Geographer's knowledge of southern India, University of Madras, 1942, p. 89

২৫ Ibid, p. 87

Dhaka University Institutional Repository

২৬ Ahmad Hasan Dani, Early Muslim Contact with Bengal, Psroceedings of the Pakistan Historical conference, Karachi, 1951, p.191

২৭ Muhammad Abdur Rahim, op. cit, p. 39

২৮ ইবনে খুরদাদবিহ্, কিতাব আল-মাসালিক, পৃ. ১৬ হতে উদ্ধৃত, ড. এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

২৯ মাসুদী, মুরুজ আল জাহাব, পৃ. ৩২ হতে উদ্ধৃত, ড. এম.এ. রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৩০ Sir. H.M. Elliot and Professor John Dowson: op. cit. p. 5

৩১ R.C. Majumdar (ed.),The History of Bengal, Vol. I, The University of Dacca, 1963, p.176

৩২ S.H. Hodivala, Studies in Indo Muslim History, Bombay, 1939, p. 4

৩৩ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ.৫৪

৩৪ Sir, H.M. Elliot and Professor John Dowson, Ibid, p. 25; আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

৩৫ ইবনে বতুতা, আজায়েবুল আসফার, ২য় খণ্ড, খাঁন বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন অনূদিত, দিল্লী, ১৯১৩, পৃ. ৩২১

৩৬ কৃত্তিবাস, রামায়ণ, ভূমিকা (আত্মকথা), কলিকাতা, ১৯২৬, পৃ.২

৩৭ সম্পাদনা পরিষদ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১১০

৩৮ JASB, Vol. XLII(42), 1873, p. 285; JASB, 1889, p.12

৩৯ JASB, Vol. LVII, 1889, p. 18-19

৪০ চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো, পাকিস্তান পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৩৫

৪১ Muhammad Enamul Haq, a History of sufi-ism in Bengal, Asiatic society of Bangladesh, Dacca, 1975 p. 211; A.H. Dani, Muslim Architecture in Bengal, Asiatic Society of Pakistan Publication No. 7, Dacca Museum, 1961, p. 154; Journal of the Indian Society of Oriental Art, (JISOA), Vol. IX, 1941, p. 26; JASB, New series, Vol. VI, Calcutta, 1910, p. 28, Shams-uddin Ahmad, Inscription of Bengal, Vol. IV, Rajshahi, 1960, p. 120. JASB, 1889, p. 23

৪২ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

৪৩ Bengal District Gazetteers Mymensingh, F.A. Sachse, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1917, p. 152

৪৪ Ibid, p. 152; Abdul Karim, op. cit. p. 120; আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৪৫ E.A.Gait, History of Assam, 2nd edition, Calcutta, 1926, p. 46

৪৬ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃ.. ১৩৫

৪৭ গোলাম সাকলায়েন, আমাদের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৫৭-৫৮

৪৮ ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম সংস্করণ,ঢাকা, ১৯৬৯,পৃ. ১৭০ ; Banglapedia (National Encyclopedia of Bangladesh), Vol. 9, Sirajul Islam (ed.), Asiatic Society of Bangladesh, 2003, p. 198

৪৯ অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব, মুসলিম বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা, পৃ. ১৪

৫০ গোলাম সাকলায়েন, পূর্ব পাকিস্তানের সুফী-সাধক, বাংলা একাডেমী , ঢাকা , ১৩৬৮, পৃ. ৮১

৫১ গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৫২ ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৫৩ গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

৫৪ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

৫৫ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯; আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

৫৬ ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,১ম খণ্ড, (১২০৩-১৫৭৬ খ্রিঃ) (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৭৪

৫৭ JASB, 1875, p. 183-84; JASB, 1878, pp. 88-95; Eastern Bengal and Assam District Gazetteers Bogra, J.N. Gupta, Allahabad, 1910, p. 154-55; ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০-৪১; আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, আমাদের সূফী-সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২০

৫৮ JASB,1873, p. 285; J.N. Das Gupta, Bengal in the 16th Century, Calcutta University, 1914, p. 46

৫৯ JASB, Vol.3, 1904, pp. 270-71

৬০ ডঃ আবদুল করিম, (মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত) বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৩; ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

৬১ JASB, First part, Vol. No. 3, 1904, p. 267

৬২ Dr. Enamul Haq, op. cit, p. 240

৬৩ কলন্দর - ভ্রাম্যমান ফকিরদেরকে কলন্দর বলা হয়। ইরানে কলন্দরীয়া তরিকার জন্ম হয়। স্পেনের জনৈক ইউসুফ বা পারস্যের (ইরান) শেখ জামাল উদ্দীনকে কলন্দরীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা যায় না। কলন্দরের কোন নির্দিষ্ট আবাসস্থল ছিল না। ধর্মীয় বা সমাজের সঙ্গেও তাদের সংশ্রব ছিল না। কলন্দররা মুসলিম জাহানের প্রায় সর্বত্রই ছিল এবং বাংলা পাক-ভারতেও কলন্দরের অস্তিত্ব ছিল। আবদুল করিম, মুসলিম-বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৯৩-৯৪

৬৪ সম্পাদনা পরিষদ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩; পৃ. ১৮৬

৬৫ A.J. Arberry (tran,) Muslim Saints and Mystics (Episodes from the Tadhkirat al-Auliya' ("Memorial of the Saints") by Farid al-Din Attar, Persian Heritage SeriesNo. I, Routledge and Kegan Paul, London, 1966, p. 100

৬৬ গোলাম সরওয়ার, খাজিনাতুল আসফিয়া, নৌল কিশোর, লক্ষ্ণৌ, ১৩২৫ হিঃ, পৃ. ২৭৮

৬৭ আবদুর রহমান চিশতী প্রণীত, মিরাত-উল-আসরার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি নং- ১৬এ, আর; ঢাকা আলীয়া পাণ্ডুলিপি নং এম,এ, ১২/১৯-২০

৬৮ ডঃ আবদুল করিম (মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত) , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

৬৯ শায়খ আবদুল হক দেহলভী, আখবারুল আখিয়ার (উর্দু অনুবাদ), করাচী, ১৯৬৩, পৃ. ৪৪

৭০ আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৮০৫, পৃ. ৪৪-৪৫

৭১ ডঃ আবদুল করিম, (মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

৭২ মাওলানা জামালী, সিয়ারুল আরিফীন, দিল্লী, ১৩১১ হিঃ পৃ. ১৭১

৭৩ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

৭৪ Shams-ud-din Ahmad, Inscriptions of Bengal, vol. IV, Rajshahi, 1960, p.169

৭৫ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ৯৭

৭৬ তিনি এতে ৩৪ জন গবেষক, গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার এবং গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত শাহ্ জালালের জন্মস্থান ইয়ামন। দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), হযরত শাহ্ জালাল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪-৭

Dhaka University Institutional Repository

৭৭ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৭৮ সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (২য় খণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭,পৃ. ৩৭৬

৭৯ মুহাম্মদ আব্দুল মতিন, শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী ও নূর-কুতবুল আলম (রঃ) ঃ সাধকত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ৭৮

৮০ H.A.R. Gibb-Ibn Battuta, Travels in Asia and Africa, London, 1929, p. 144-45

৮১ কুরআন ও হাদিস থেকে কানুন নির্মাণে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে চারটি মাযহাব বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। হাম্বলী মাযহাব এর মধ্যে অন্যতম। হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (৭৮০-৮৫০ খ্রি:)। বাগদাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই পরলোকগমন করেন। ইমাম শাফীর শিষ্য তিনি। তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে তিনি এসে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। সেকালে মু'তাজিলা সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত প্রবল, তাদের মতবাদের অভিনবত্বের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষায় বদ্ধ পরিকর। এ কারণে খলিফা মুতাসিম তাকে কারারুদ্ধ করেন; পরক্ষণে খলিফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে মুক্তি দেন। আহলে হাদিসের গোঁড়া সমর্থক ইমাম আহমদ। সম্পূর্ণরূপে হাদিসের উপর নির্ভর করে তিনি দুর্বল (যয়ী'ফ) হাদিসও উপেক্ষা করেন নি। তিনি যে নিয়ম পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে যুক্তির কোন স্থান নেই বললেই চলে। তিনি কুরআন ও হাদিসের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করেন। যেখানে ইমাম আবু হানিফা স্বাধীন চিন্তা যুক্তি ও বিচারের অবাধ ব্যবহার করেন, সেখানে ইমাম আহমদ যুক্তি ও বিচারের পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে হাদিসের শাব্দিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। এ মতবাদে উদারতা তেমন একটা নেই বলে এটা বিশেষ বিস্তার লাভ করতে পারেনি। ডঃ রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির,বগুড়া, ১৯৮১, পৃ. ১৩৮

৮২ Dr. Muhammad Ishaq, India's Contribution to the Study of Hadith Literature, The University of Dacca, 1976, p.53

৮৩ ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২; আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

৮৪ নূর মুহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী ,ঢাকা , ১৯৯২, পৃ. ৩১৬

৮৫ Calcutta Review, vol. LXXI, 1939, p. 196; শাহ্ ওয়েবের 'মানাকিব আল-আসফিয়া।' মকতুবাত-ই- সাদীতে সংযোজিত হয়েছে, পৃ. ৩৩৯; ওয়েব ছিলেন শায়খ শরফউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রীর পিতৃব্য

৮৬ Calcutta Review, Ibid, p. 195

৮৭ Calcutta Review, Ibid, p. 196 ; ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৮৮ মাওলানা আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭০ , পৃ. ৬৭১

৮৯ মুহাম্মদ রুহুল আমিন, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ:), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ৪০৩

৯০ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৮

৯১ Dr. A.K.M. Ayub Ali, History of Traditional Education in Bangladesh, Islamic foundation Bangladesh, 1983, P. 31

৯২ The Calcutta Review, Third Series, Vol. LXXI , April-June,1939, p. 195

৯৩ বর্তমানে 'মুনায়র' গ্রামটি 'মিনায়র' নামে সুপ্রসিদ্ধ। বিহার লেকে গ্রামটি ৯৬.৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রাচীন উৎস ও বর্ণনা হতে জানা যায় যে, এর মূল উচ্চারণ 'মুনায়র' ছিল। এর উচ্চারণ ইংরেজিতেও লিপিবদ্ধ রয়েছে । যেমন- 'Munayren' (Calcutta Review, p. 195) এ কারণে তাঁর নামের শেষে 'মুনায়রী' ব্যবহার করা হয়েছে।

৯৪ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৬৩

৯৫ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

৯৬ Calcutta Review, Ibid, p. 197

৯৭ Calcutta Review, Ibid, p. 197; সায়্যিদ জমীর উদ্দীন আহমদ, সিয়াতুশ শরফ, লক্ষ্ণৌ, পৃ. ৫২

৯৮ শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী:), ভারতী বুক স্টল, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৭

৯৯ Abdul Karim, op. cit, p. 129

১০০ আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১০১ শায়খ আবদুল হক দেহলভী, আখবারুল আখিয়ার, দিল্লী, ১৯১৩ , পৃ. ১৪৭; Calcutta Review, 1969, p. 213

১০২ শইখ শরফুদ্দীন, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১৫৯

১০৩ গোলাম হোসেন সলীম, রিয়াজুস্ সালাতীন, এশিয়াটিক সোসাইটি,কলিকাতা, ১৮৯৮, পৃ. ৯৭, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), তৃতীয় সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৮৫, পৃ.৩৬

১০৪ ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

১০৫ শায়খ আবদুল হক দেহলভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

১০৬ Dr. Enamul Haq, op. cit. pp. 197-98

১০৭ গোলাম সাক্লায়েন, আমাদের সুফী সাধক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭,পৃ. ২৩৯

১০৮ শায়খ আবদুল হক দেহলভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০; ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

১০৯ শায়খ আবদুল হক দেহলভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

১১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০, আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

১১১ গোলাম সরওয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮

১১২ শায়খ আবদুল হক দেহলভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

১১৩ গোলাম সরওয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৯, শায়খ আবদুল হক দেহলভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

১১৪ Blochmann , Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1873, p. 262

১১৫ M. Abid Ali Khan and by (ed.) H.E. Stapleton, Memoirs of Gaur and Pandua, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1924, pp. 111-112; ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

১১৬ এই শেখ হামিদউদ্দিন নাগোরী যোধপুরের বিখ্যাত সূফী শেখ হামিদউদ্দিন থেকে ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন শেখ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর একজন শিষ্য। Pakistan Historical society, পত্রিকা, ১৯৫৪, পৃ. ৩৮৪

১১৭ মুহম্মদ কাসিম ফিরিশতা, তারীখ-ই- ফিরিশতা, ২য় খণ্ড, লক্ষ্ণৌ, তা . নে., পৃ. ৩০২

১১৮ মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন মিঞা, গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুব-উল-আলম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩৭

১১৯ আবদুর রহমান চিশতী, 'মিরাত আল আসরার', Memoirs of Gaur and Pandua গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১১১

১২০ M. Abid ali Khan, op. cit. p. III.

১২১ শায়খ আবদুল হক দেহলভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬; এ গ্রন্থটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে লিখিত; মৌলভী রহমান আলী, তাজকিরাতুল আউলিয়া ই-হিন্দ, লক্ষ্ণৌ, ১৯১৪, পৃ. ১৪৪-৪৯

১২২ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

১২৩ Prof. Hasan Askari, op. cit., p. 37

১২৪ Ibid, p. 37

১২৫ Ibid, p. 37

১২৬ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

১২৭ গোলাম হোসেন সলীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

১২৮ চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১২৯ ডঃ আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-২৩

১৩০ East Pakistan District Gazetteers, Chittagong, S.N.H. Rizvi (ed.), op.cit. p. 21

১৩১ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

১৩২ JASB, 1847, p. 394; JASB, 1874, p. 287, JASB, 1909, p.248-51; District Gazetteers Burdwam, p. 190

১৩৩ JASB, 1872, p. 104-107; Ahmad Hasan Dani, Inscription of Bengal No-55 and JASB , 1873, p. 290

১৩৪ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

১৩৫ চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

১৩৬ কালিণ্ডড়ি - সাইয়্যিদুল আরিফীন (রহ:) বাউফল অঞ্চলে যে মেয়েটিকে প্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন, তিনি ছিলেন কালিণ্ডড়ি সম্প্রদায়ের। তাঁর নাম ছিল কালি। তাঁরই নামানুসারে গ্রামটির নাম হয় কালিণ্ডড়ি। ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৩৯

১৩৭ রশীদ আহমদ, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, মর্ডান লাইব্রেরী, ঢাকা , ১৯৭৪, পৃ. ৮১

১৩৮ চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

১৩৯ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৪১

১৪০ চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

১৪১ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

১৪২ Ahmad Hasan Dani, Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal (Down to A.D. 1538), Appendix to the Journal of the Asiatic society of Pakistan, Vol. II, Dacca, 1957, p. 158

১৪৩ চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৪৪ Ahmad Hasan Dani, Ibid, p. 158

১৪৫ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

১৪৬ চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১৪৭ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ.১২২

১৪৮ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

১৪৯ মেহরাব আলী, দিনাজপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৮৮-৯০

১৫০ গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

১৫১ Eastern Bengal District Gazetteers, Dinajpur, F.W. Strong (ed.), The Pioneer Press, Allahabad, 1912, pp. 20-21

১৫২ Ibid, p. 139

১৫৩ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

১৫৪ গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

১৫৫ মেহরাব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

১৫৬ গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

১৫৭ W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol. I, New Delhi, 1974, p. 60

১৫৮ Dr. Kalika Ranjan Qanungo, History of Bengal, vol. IV, Dhaka, 1960, p. 37

১৫৯ সৈয়দ মোর্তজা হোসাইন আমুল উলায়ী , (মুহাম্মদ আবদুল মজিদ সাহিত্য ভূষণ অনূদিত) সহীফায়ে সিদ্দিকীয়া, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৮৫; Calcutta Review, Vol. 7, Ibid, p. 198, উদ্ধৃত বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ- আশ্বিন, ১৩৭১, পৃ. ১৫

১৬০ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

১৬১ দক্ষিণবঙ্গ বলতে সাধারণত বাগেরহাট, খুলনা, যশোর এবং পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলাকেই বোঝানো হয়েছে। এছাড়া বরিশাল বিভাগের বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালী জেলাকেও অনায়াসে দক্ষিণ বঙ্গের আয়ত্বাধীনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তনে ইসলামের আলো, দ্বিতীয় সংস্করণ,পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৮ ,পৃ ৯৮

১৬২ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খন্ড,ঢাকা, ১৩৭১ ,পৃ. ২৫৭; আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, ১০৫; চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

১৬৩ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

১৬৪ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

১৬৫ চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬; আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

১৬৬ " আব্বাস" ডঃ আবদুল গাফ্ফার সিদ্দিকী বলেন, পীর সাইয়েদ আব্বাস আলীকে 'গোয়াচাদ শাহ' বলা হতো

১৬৭ Muhammad Abdur Rahim, op. cit,, p. 126

১৬৮ Muhammad Abdur Rahim, Ibid, p. 126; চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫; আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫; সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২৩-২৮

১৬৯ শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় , পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৭০ JASB, Vol. XVI, 1847, p.389; Ahmad .Hasan Dani, Inscription of Bengal, No-II

১৭১ Ahmad Hasan Dani, Inscription of Bengal, No-9, ৬৯৭ হিজরি / ১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেবীকোটের অন্য একটি উৎকীর্ণ লিপিতে সুলতান কায়কাউসের শাসনামলে জাফর খান কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মানের উল্লেখ পাওয়া যায়; Ahmad Hasan Dani, Inscription of Bangal, No-5

১৭২ JASB, Vol. XVI, 1847, p.394

১৭৩ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭; চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

১৭৪ JASB, Vol. XVI, 1847, p.389

১৭৫ গবেষণার মূল বিষয় হওয়ায় উক্ত বর্ণনা যথাস্থানে দেয়া হবে

Dhaka University Institutional Repository

১৭৬ JASB,Vol, XXXVI (36), 1867, p.118

১৭৭ Ahmad Hasan Dani, Inscription of Bengal, No, 28

১৭৮ ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪

১৭৯ JASB, Vol, XXXVI, 1867, p,118

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

৩.১ সামাজিক অবস্থা

মানুষ সামাজিক জীব।[১] নানা শ্রেণী ও নানা পেশার লোকজনের মিলনই হচ্ছে সমাজ।[২] সেজন্য স্বীয় প্রয়োজন ও স্থিতিশীলতার তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।[৩] কোন দেশের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে সেখানকার সকল শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে জানা অতীব প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানীদের পরিভাষায় সমাজ কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সামাজিক স্তর বিন্যাস। যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নানা শ্রেণীর মানুষের অবস্থান জানা যায়।[৪] সে হিসেবে আমাদের বাংলার সামাজিক অবস্থা জানতে হলেও উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলার সামাজিক অবস্থা বলতে আমরা বঙ্গের মধ্য-যুগকেই অন্তর্ভুক্ত করেছি। কেননা হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশ মধ্য-যুগেই ঘটে। সুতরাং বাংলার মধ্যযুগীয় সামাজিক অবস্থা এখানে আলোকপাত করা হলো :-

বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রধানত মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। প্রকৃত পক্ষে এ দুটো ধর্মকে কেন্দ্র করেই সামাজিক রীতিনীতি গড়ে উঠেছিল।[৫] তৎকালীন মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হিসেবে সুলতান ছিলেন সমাজ জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সুলতানের এ সামাজিক মর্যাদা ও প্রাধান্যকে হিন্দুরাও মেনে নিয়েছিল।[৬] মুসলিম সমাজ জীবনের সুলতানকে বিশেষ নেতারূপে কতকগুলো দায়িত্ব পালন করতে হতো। ঈদের নামাজে তিনি খোতবা দিতেন আর সুলতান হিসেবে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তাছাড়া সুলতানগণ স্বীয় রাজ্যে মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও খান্‌কাহ ইত্যাদি নির্মাণ করতেন। রাজদরবারের আনুষ্ঠানিকতার প্রতি বিশেষরূপে গুরুত্ব দিতেন। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সুলতানগণ রাজ দরবারে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন । মুসলিম শাসকগণ শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তদানীন্তনকালীন নির্মিত প্রাসাদ ও মসজিদগুলো তাদের শিল্প ও স্থাপত্যের অগ্রগতির কথাই প্রমাণ করে। তৎকালীন মুসলিম সমাজের লোকদেরকে আমরা দুটো স্তরে ভাগ করতে পারি। যেমন - ১. প্রাথমিক স্তর ২. দ্বিতীয় স্তর ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.১ প্রাথমিক স্তর :

ক. সাধারণ শ্রেণী

ছোট ছোট কারিগর, উৎপাদক, কৃষক এবং শ্রমিকদের নানা শ্রেণী সমাজের সাধারণ অধিবাসীরূপে গণ্য হতো। নিম্নস্তরের মুসলমান সমাজের লোকেরা সাধারণত সেনাবাহিনীতে যোগদান করা কিংবা রাজ সরকারে কেরানীরূপে চাকরি করা ইত্যাদি পছন্দ করতো। বেশীরভাগ হিন্দুরা ছিল কৃষিজীবী ।

মুসলমান শাসন প্রাক্কালে মুসলমানদের চাকরি-বাকরির অজস্র পথ প্রশস্ত ছিল। নিয়মিত অনিয়মিত বিরাট সেনাদলকে মুসলমান শাসনকর্তারা দেখাশুনা করতেন। অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাদল সরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং তাদের অধীনে অনেক পেয়াদাও ছিল, বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে। অধিকন্তু মুসলমান বণিক ও জমিদারদেরও পাইক-পেয়াদার বাহিনী থাকতো। সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেয়াদা অত্যাবশ্যক ছিল। এদের কর্তব্যকর্ম ছিল কাজীর আদেশ পালন করা এবং অপরাধীদেরকে ধরে আনা। কবি বিজয়গুপ্ত বলেন যে, অপরাধী রাখাল বালকদেরকে ধরে আনার জন্য কাজী শত শত পেয়াদা প্রেরণ করেন।[৭]

জনৈক পেয়াদা সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। এক বিধবা কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিচারের ব্যাপারে কাজী সিরাজউদ্‌দীন সুলতান গিয়াসউদ্‌দীন আজম শাহকে বিচারালয়ে আহ্বানের জন্য একজন পেয়াদা পাঠান। যখন এ পেয়াদা রাজ-প্রাসাদের নিকটবর্তী হয় তখন সুলতানের সামনে যেতে তার সাহস হারিয়ে ফেলে। সে নিরুপায় হয়ে আজান দিতে আরম্ভ করে এবং সে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সুলতানের নিকট কাজীর তলবনামা পেশ করে।[৮]

উপর্যুক্ত উদাহরণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান শাসন প্রাক্কালে শাসনকর্তা এবং সরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে পাইক, পেয়াদা ও অন্যান্য পদে মুসলমানদের চাকরির যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছিল। মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো এবং বাণিজ্য জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করতো । তারা সে যুগের দক্ষ নাবিক ছিল । যার দরুণ হিন্দু ব্যবসায়ীরাও তাদেরকে নাবিক হিসেবে নিয়োগ করতো । বিজয়গুপ্তের একটি কথা থেকে অনুমেয়; হিন্দু বণিক চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য জাহাজে অনেক মুসলমান নৌচালক ও নাবিক ছিল। এর কারণ এই যে, মুসলমানরা সমুদ্র যাত্রা সংক্রান্ত কার্যকলাপে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিল।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানের অনেকের দর্জি পেশা ছিল। মনে হয় তারা এ পেশাকে একচেটিয়া গ্রহণ করে নিয়েছিল; কেননা হিন্দুরা তাদের কাপড়-চোপড় মুসলমান দর্জিদের দিয়েই তৈরি করতো। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, "যবন (মুসলমান) দর্জি শ্রীবাসের কাপড় সেলাই করে। (শ্রী চৈতন্যের জনৈক শিষ্য)"[১০]।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও মুসলমান দর্জির উল্লেখ আছে। কবি বলেন যে, দর্জি কাপড় কাটে এবং কাটা অংশগুলো মহা-সমারোহের সঙ্গে সেলাই করে।[১১] মুসলিম বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী শিল্প ছিল সুতী বস্ত্র উৎপাদন এবং এই পেশায় খুবই দক্ষ ছিল মুসলমান তাঁতীরা ।

মুকুন্দরামের মতে 'মুকেরী' বলা হয় ঐ সকল মুসলমানকে, যারা গবাদিপশু নিয়ে কারবার করতো। ডঃ জে.এন. দাসগুপ্ত 'মুকেরীদেরকে রাখাল ও মেষপালকদের মতো গবাদি পশু চালক বলে ধারণা করেন।' বাস্তবিকপক্ষে 'মুকেরী'রা ছিল সাধারণত গবাদি পশুচালক কিংবা রাখালদের থেকে ভিন্ন প্রকারের; তবে 'রাখাল' শব্দটি বাংলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও প্রচলিত ছিল গৃহপালিত পশু চালকদের জন্য, হুবহু তা ব্যবহার করা হতো মুকেরীদের জন্য। এরা পালন করতো গবাদি পশু আর ব্যবসা চালাতো। মাঝে মাঝে এরা গরুর পাল নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেত এবং বিক্রয় করতো কৃষকদের নিকট। বাংলায় আজও এ রকমের গবাদি পশুর ব্যবসায়ী পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান সমৃদ্ধিশালী দেশ হওয়ায় গবাদিপশু পালন এবং এর ব্যবসা ছিল খুব লাভজনক। পিঠা তৈরি ও বিক্রয় কাজে নিয়োজিত ছিল মূলত এক শ্রেণীর মুসলমানরা। এরা পরিচিত ছিল 'পিঠারী নামে'। সত্যই এরা ছিল রুটি প্রস্তুতকারক। জনৈক কবি লিখেছেন, এক শ্রেণীর মুসলমান মাছের ব্যবসা করতো। এদেরকে 'কাবারী' বলা হতো।[১২]

এখন 'কাবারী' নামটি মুসলমান মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য অপরিচিত। ফার্সি প্রবাদানুযায়ী 'কাবর' অর্থ কাষ্ঠ ব্যবসায়ী। হিন্দী প্রবাদে কাবারী, বলতে বোঝায় ভাঙ্গা আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী কিংবা যে ব্যক্তি ভাঙ্গা কাঁচের বা চিনামাটির টুকরা কুড়ায়। এখন বাংলার 'মাহীফারূশ' নামে পরিচিত মৎস্য ব্যবসায়ীরা। অনেক মুসলমান তাঁতীদের জন্য তাঁত তৈরির কাজ গ্রহণ করে। এরা 'সানকর' নামে আখ্যায়িত। বাংলাদেশে উচ্চমানের বয়ন শিল্প এবং এর চাহিদা খুবই যেহেতু ব্যাপকভাবে এর ব্যবসা-বাণিজ্য বিদ্যমান। কাজেই এ লাভজনক পেশা মুসলমানেরা বেছে নেয়। স্বল্প সংখ্যক মুসলমান তীর ধনুক তৈরির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো এবং তারা তীরকার কিংবা ধনুক প্রস্তুতকারকরূপে সুপরিচিত। তৎকালীন বাংলায় তীর ও ধনুক যুদ্ধকার্যের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ।

মুসলমানরা যারা খাতনা করার পেশা অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে বলা হতো 'হাজ্জাম'। মুকুন্দরাম লিখেছেন, 'হাজ্জামরা' তাদের কাজে এত ব্যস্ত থাকতো যে, তারা বিশ্রামের সময় পর্যন্ত পেতো না।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালী সমাজে মুসলমানের মধ্যে জন্মের হার ছিল খুব বেশি এবং এর ফলে এ প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায় । মুসলমানের মধ্যে কারিগরদের একটা দল ছিল যারা 'কাগচা' (কাগজিয়া) রূপে পরিচিত। এরা তৈরি করতো কাগজ। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে মুসলমানরা সর্বপ্রথম কাগজের প্রচলন করে এবং গ্রন্থের ব্যাপক প্রচারের জন্য পুস্তক নকল করার রীতি প্রবর্তন করে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে অবলোকন করা যায় যে, মোল্লারা ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য খুব সম্মানের আসন লাভ করে। গ্রাম্য সমাজে বিশেষ করে তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তারা কুরআন ও হাদিস পর্যালোচনা করতেন এবং সমাজ থেকে ইসলাম বিরোধী রীতি-নীতিগুলো দূরীকরণার্থে কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। কবি বিজয়গুপ্ত থেকে অবহিত হওয়া যায়, এমনকি মোল্লাদেরকে কাজীরা পর্যন্ত উচ্চ সম্মান দিত। বিজয়গুপ্ত আরও উল্লেখ করেছেন, কাজী সদাসর্বদা সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে মোল্লার পরামর্শ নেন। কুরআন হাদিস পর্যালোচনা করে মোল্লা সব সময় নানা বিষয় মীমাংসা করেন।

তারা সকল সমস্যার সমাধান ধর্মীয় গ্রন্থকে মনে করতো। কুরআনের আশ্রয় নিত তারা বিপদের সময়। অবশ্য এতে ঐ যুগের সাধারণ বাঙালী মুসলমানের আদিম সংস্কার ও সহজ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম আমলে মোল্লা ছিলেন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। তাঁর এলাকার তিনি ছিলেন মুসলমানের ধর্মীয় গুরু, পণ্ডিত, ধর্মশিক্ষাদাতা এবং ইমাম। মুসলমানের ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ তিনি যথাযথ সম্পন্ন করেন।

খ. মধ্যবিত্ত শ্রেণী

অধুনা সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। যথা - রাজনৈতিক চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিভা। এ প্রকার লোকেরা শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত ও তারা বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের জীবিকা উপার্জন করে থাকে। তারা সূক্ষ্ম প্রতিভা ও শিক্ষার গুণে দেশের একটি রাজনৈতিক শক্তি এবং সম্প্রতি কালের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে সময়ে দেশে স্বৈরাচারী শাসন প্রচলিত ছিল, তখনকার সমাজে এ রকম রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী অবিদিত ছিল। বাংলাদেশে এ সংজ্ঞা অনুযায়ী মধ্যযুগে কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না ।

বাঙালী সমাজে যদিও একটি কার্যকরী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, তথাপি সমাজে এ রকম এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, যারা বর্তমান কালের মত সেকালেও তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জীবিকা অর্জন

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। তারা বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ছিলেন এবং লেখার কাজে কিংবা কোনো শিল্পকলায় তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করতেন।

তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও পেশার গুণে, দৈহিক শ্রম দ্বারা উপার্জনকারী সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন এ শ্রেণীর লোকেরা। কিছুটা প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এই শিক্ষিত শ্রেণী সমাজে। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন।[১৪] ঐ যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত ছিল মূলত বুদ্ধিবৃত্তিমূলক পেশার কাজে নিযুক্ত লোকদের সমন্বয়ে। মোটামুটি নিম্নপদস্থ কর্মচারী, কেরানী, চিকিৎসক, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, কবি, সঙ্গীত শিল্পী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ যুগে যথেষ্ট সমাদর ছিল শিল্পকলার। অভিজাত শ্রেণী এবং শাসকগণ ইমারত নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেন। তখন যথেষ্ট চাহিদা ছিল আড়ম্বর ও ভোগ বিলাসের দ্রব্যাদির। উত্তম ও মূল্যবান দ্রব্যাদির উৎপাদনে তারা উৎসাহিত করেন এবং বিভিন্ন প্রকার কারিগরি উৎকর্ষের ব্যবস্থা করেন।

স্বভাবতই শিল্প ও কারিগরদের সুনিপুণ শ্রমের জন্য উপযুক্ত বেতন দেয়া হতো। এতে তারা সুন্দর ও মর্যাদাজনক জীবন-যাপনে সক্ষম হতো। মসলিন, রেশমী ও অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্যাদির উল্লেখ থেকে এই সত্য প্রমাণিত হয়। আমীর খসরু বাংলাদেশে উৎপাদিত অতি উৎকৃষ্টমানের সুতীবস্ত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[১৫]

মীর্জা নাথন একখণ্ড মসলিন কাপড় চার হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। এতে দেখা যায় যে, সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র উৎপাদনে উন্নতমানের নৈপুণ্যের প্রয়োজন হতো। এমনকি বিদেশীরা পর্যন্ত হাতে তৈরি এই সমস্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রের উচ্চ মূল্য দিত। এই বস্ত্র এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশে রপ্তানি হতো।[১৬] মুসলিম আমলে বাংলার কারিগরদের সমৃদ্ধির পরিচয় সুতীবস্ত্রের উৎকৃষ্টতা ও এর পর্যাপ্ত উৎপাদন থেকে পাওয়া যায়। ' ইনশা-ই-মাহরু' থেকে জানা যায় যে, সুলতান ফীরূজশাহ তুগলকের রাজত্বকালে প্রাচুর্য ও সস্তার সময় একজন তাঁতী একখণ্ড কাপড় বোনার জন্য ৩০ 'জিতল' পায়।[১৭]

নিঃসংকোচে এ উক্তি করা যেতে পারে যে, দক্ষ উৎপাদক ও কারিগররা তাদের কাজের জন্যে উৎকৃষ্ট পারিশ্রমিক লাভ করতেন। তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও উঁচুমানের জীবনযাত্রার দরুণ তারা সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে গণ্য হতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলার শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যাদিতে প্রাবল্য এবং এদেশের দ্রব্যাদির ব্যাপক চাহিদার কারণে অন্যান্য দেশ কর্তৃক বন্দর ও শহরগুলোতে অনেক ব্যবসায়ী ও বণিক সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিলেন। বিদেশী পরিব্রাজকদের অভিমত অনুযায়ী বাংলার বণিকরা খুব ধনী ছিলেন এবং তারা শৌখিনতাপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। জনৈক চৈনিক রাষ্ট্রদূত লিখেছেন যে, বাঙালী

Dhaka University Institutional Repository

বণিকদের প্রত্যেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন এবং এদের প্রত্যেকের ব্যবসায় মূলধনের মূল্য ছিল ১০,০০০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।[১৮]

সম্পদ ও শৌখিনতাপূর্ণ জীবন যাপনের ভিত্তিতে বড় বড় ব্যবসায়ী ও বণিকগণ সমাজের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তবে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ছিল না। তারা এ কারণে ঐ যুগের অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করতে পারেননি । মুসলমানের মাঝে হালদার (হাওলাদার) বা ক্ষুদ্র জমিদার ও জোতদারদের বর্ণনা রয়েছে বাংলা সাহিত্যে। এ সকল জোতদার ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়। বাংলার লোকদের পোশাক পরিচ্ছদ ও চালচলন সম্বন্ধে চৈনিক রাষ্ট্রদূত এবং ইউরোপীয় বণিকরা যে বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে অনুমিত হয় যে, স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপন করতেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা।

তারা উত্তম পোশাক পরিচ্ছদে ভূষিত হতেন। বাঙালী অধিবাসীদের সম্পর্কে মহুয়ান লিখেছেন, "পুরুষরা তাদের মস্তক মুণ্ডন করেন এবং গোল গলাবন্ধ বিশিষ্ট লম্বা ও ঢিলা পোশাক পরিধান করেন; মাথায় তারা সাদা পাগড়ী ব্যবহার করেন এবং কোমরে চওড়া রঙীন রুমাল বাঁধেন। তাঁরা সুঁচালো চামড়ার জুতা পরেন"।[১৯]

এটা ছিল তখনকার উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষ করে রাজকর্মচারী ও শিক্ষিত মুসলমানদের পোশাক। বাংলার অধিবাসীদের পোশাক সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে বারবোসা বলেন, " সাধারণ অধিবাসীরা খাটো সাদা শার্ট পরিধান করে, এটি উরু পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। তারা তিন কিংবা চার পাঁচ বিশিষ্ট শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে থাকে। তারা সকলেই চামড়ার জুতা পরিধান করে এবং কেউ কেউ রেশমী অথবা সোনালী সুতায় কাজ করা পাদুকা পরে থাকে।"[২০]

গ. অভিজাত সম্প্রদায় ও উচ্চশ্রেণী

অভিজাত সম্প্রদায়ের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য মুসলিম শাসনকালে পরিলক্ষিত হয়। অভিজাত সম্প্রদায় বংশগত ছিল না। এটা বংশগত মর্যাদার চেয়ে প্রতিভার উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। নিম্নতম মর্যাদা থেকে বাংলার বেশিরভাগ মুসলমান অভিজাত ব্যক্তিবর্গ তাদের জীবন আরম্ভ করেছিলেন। তারা আমির ওমরাহর মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন কেবলমাত্র প্রতিভার বলেই এবং কেউ কেউ এদের মধ্যে রাজকীয় মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। এমনকি, ক্রীতদাসরা আমিরের পদ মর্যাদা লাভ ও সিংহাসন

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারেরও বহু নজির আছে। যে হাবশীগণ ক্রীতদাসরূপে ইলিয়াস শাহী সুলতানদের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[২১]

এটা উল্লেখযোগ্য যে, যখন কোনো ব্যক্তি সামান্য অবস্থা থেকে আমির ওমরাহ পদে উন্নীত হয়েছেন, তখন স্বভাবতই তার সন্তান সন্ততিদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। পিতার প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে তারা অভিজাত শ্রেণীতে একটি স্থায়ী আসন দখল করতে সক্ষম হতো। সুলতান তার দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদেরকে 'খান-ই-আজম','খান-ই-জাহান', 'মজলিস-ই-আলা', 'মজলিস-ই-নূর', 'মালিক আল-মুয়াজ্জম' ও ' মজলিস-আল-মুয়াজ্জম' প্রভৃতি উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করতেন।[২২]

সামরিক ও প্রশাসনিক সাফল্যের উপর ভিত্তি করে আভিজাত্য প্রধানত গড়ে উঠেছিল। অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার প্রয়োজনীয় গুণাবলী হলো সামরিক নৈপুণ্য ও প্রশাসনিক দক্ষতা। শুধু অভিজাত আমির ওমরাহর মর্যাদা মুসলমানের মাঝেই আবদ্ধ রাখা হয়নি। হিন্দুরাও মেধা ও প্রতিভার গুণে উচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আরোহণ করতেন।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর গুণী ও যোগ্য ব্যক্তির জন্য মুসলমান সুলতানগণ সরকারী চাকরির দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। সমাজে ধর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানের যোগ্য স্বীকৃতি তৎকালীন মুসলমান শাসনকালে দেয়া হয় এবং সমাজে ভক্তি ও শ্রদ্ধা স্বরূপ শেখ, সৈয়দ ও উলামা উপাধিতে ভূষিত করেন। তারা তাদের নৈতিক শক্তির প্রভাব জনসাধারণের উপর স্থাপন করেন। তাদের যদিও কোনো অর্থ সম্পদ অথবা প্রশাসনিক পদমর্যাদা ছিল না, তবুও তাদের খুব সমাদর ছিল শাসকদের নিকট। তাদের বিশেষ সম্মানের কারণ ছিল দু'টি - তাদের স্বাভাবিক ধর্মনিষ্ঠা ও শিক্ষানুরাগ এবং ঐ সময়ে বাঙালী সমাজে তাঁদের অসামান্য প্রভাব। সমাজের উচ্চ স্তরের নেতৃস্থানীয় ও প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী ছিলেন পীর দরবেশ ও উলামা।

এ বর্ণনা থেকে সৈয়দ, উলামা ও শেখদের সামাজিক গুরুত্ব এবং তাদের নেতৃত্ব ও প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় সমাজে। সাধারণ লোকেরা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করত ধর্মপ্রাণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে এবং এই বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি প্রদান করেন মুসলমান শাসনকর্তারা। তারা রাষ্ট্র থেকে নিষ্কর জমি ও বৃত্তি ভোগ করতেন এবং ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে।

বিলাসিতা ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় অভিজাত আমির ওমরাহ ও অন্যান্যদের জীবন যাপনে। ধার্মিক শ্রেণী অর্থাৎ শেখ ও উলামা ব্যতিরেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ধন সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে ছিলেন এবং তারা জাঁকজমক ও আড়ম্বের ব্যাপারে শাসকদের নিদর্শন অনুকরণ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিজস্ব ক্ষুদ্রাকৃতি দরবার, জমিদার, আমির ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ছিল। এসকল দরবারে শিল্পী, কবি, গায়ক প্রতিভাশালী ও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের আবাসস্থলে পরিণত হয়। প্রায়ই তারা আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান করতেন এবং গায়িকা, নর্তকী ও সঙ্গীত শিল্পীরা তাদের অভিনয়, শিল্পকলা ও নৃত্যগীত দ্বারা আপ্যায়িত করতো সভার লোকদের।

সঙ্গীত বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় ছিল। বাঙালীরা সঙ্গীতের এত বেশি চর্চা করে যে, বায়বোসা তা' দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, বাঙালীরা যন্ত্রসঙ্গীতে ও গানে খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।[২৩] বাহারিস্তান-ই-গায়েবী প্রণেতা মীর্জা নাথন লিখেছেন যে, বাঙালী গায়করা তাদের সুমিষ্ট সঙ্গীতের দ্বারা যশোরে অবস্থানরত মোগল কর্মচারী ও সৈন্যদের চিত্তবিনোদন করেছিল।[২৪]

বাংলাদেশে মুসলমান শাসনকালে নৃত্যকলা ও সঙ্গীত ছিল বহু প্রচলিত। প্রত্যেকটি সামাজিক উৎসবে এসকল ছিল অপরিত্যাজ্য অঙ্গ। চৈনিক তথ্য থেকে অবহিত হওয়া যায় যে, কোনো অভিজাত ব্যক্তি যখন কোনো ভোজে মেহমান আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন মেহমানদের মনোরঞ্জনের জন্য নর্তকী ও অভিনেত্রীদের ব্যবস্থা থাকতো। পুষ্প খচিত নক্‌শা করা হালকা লাল রঙের কাপড় অভিনেত্রীরা পরিধান করতো। তারা তাদের শরীরের নিম্নভাগ রঙিন রেশমী বস্ত্র দিয়ে আচ্ছন্ন রাখতো।

চীনাদূত বাংলার সঙ্গীত ও নৃত্যকলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, "সুরাপান ও ভোজানুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলতে বাঙালীরা ছিল সুগায়ক ও নৃত্যপটিয়সী।"[২৫] 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' ও বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে বর্ণিত আছে যে, বাংলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা স্বর্ণপাত্রে খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং তাদের মধ্যে একটি রীতি ছিল এই যে, যিনি ভোজানুষ্ঠানে যত বেশি স্বর্ণ থালার পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন, তিনি সমাজে তত বেশি উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হতেন।[২৬]

একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতিবান ও প্রগতিশীল সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন মুসলিম বাংলার অভিজাত শ্রেণী। উচ্চশিক্ষিত ও সুরুচি সম্পন্ন ছিলেন উলামা ও শেখগণ এবং তারা উদ্যোগী ছিলেন সমাজের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির জন্য।

ঘ. দরবারী জীবন

বাংলার রাজোচিত আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন মুসলমান শাসনকর্তারা। বাংলা মুসলমান শাসনামলে অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যে উন্নত ছিল এবং তাদের আয়ত্তে দেশের অজস্র সম্পদ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্য দেশীয় অন্যান্য লোকদের মতো, বাঙালীরাও তাদের শাসকদের সমারোহের দ্বারা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে প্রভাবিত হতো।

সিংহাসন কে দখল করলো তা' নিয়ে তারা খুব একটা মাথা ঘামাত না; বরং সিংহাসন ও শাসকদের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাঙালীদের এই মনোভাব বাবর পর্যবেক্ষণ করেন। তার উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । বাবর লিখেছেন, " বাংলাদেশে এ ধরনের একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, উত্তরাধিকারী সূত্রে সিংহাসন লাভ করা খুব কমই হয়ে থাকে। রাজার জন্য একটি নির্দিষ্ট করা সিংহাসন রয়েছে এবং একইভাবে প্রত্যেক আমির ও উজির এর জন্য পদ বা আসন স্থির করা আছে। শুধু এ সিংহাসন এবং আসনগুলো বাংলার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। যে কেউ রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন তাকেই সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীদের পক্ষ থেকে রাজা হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। তৎক্ষণাৎ সকল আমির ওমরাহ , সৈন্য ও প্রজাগণ তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাকে মান্য করে থাকে। পূর্ববর্তী রাজার মতোই তাকে তারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে ও দ্বিধাহীনভাবে তাঁর আদেশ মান্য করে চলে। বাংলার অধিবাসীরা বলে থাকে, " আমরা সিংহাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যিনিই সিংহাসন দখল করেন, আমরা তার একান্ত অনুগত ও বাধ্য।"[২৭]

নিজামউদ্দিন আহমদ বখশী ও বাবরের এই বর্ণনা সমর্থন করেন। বাঙালীদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "কথিত আছে যে, কয়েক বছর ধরে বাঙ্গালা'তে একটা রীতি প্রচলিত ছিল যে, যে কেউ রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করত, সকলে তারই বশ্যতা স্বীকার করত।"[২৮] যাহোক, বাঙালী শাসকদের রাজোচিত শান-শওকত ও জাঁকজমকের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা যায় ।

দেহরক্ষী দলের প্রধান বাংলার 'ছত্রী' (ছাতাধারী) নামে আখ্যায়িত হতেন। কেশবছত্রী এ পদ সুলতান হোসেন শাহের আমলে অলংকৃত করেন। তখনকার যুগে প্রকাণ্ড হারেম রক্ষণাবেক্ষণ আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। হারেম রীতিনীতি অনুসরণ করতেন হিন্দু মুসলমান সমস্ত শাসকগণ। এ প্রথা বাংলার মুসলমান শাসনকর্তাগণ অব্যাহত রাখেন। মূলত হারেম গঠিত একাধিক স্ত্রী ও বহুসংখ্যক ক্রীতদাসী নিয়ে। গায়িকা ও নৃত্য পটিয়সী যুবতীরাও হারেমে স্থান পেতো। রাজপ্রাসাদের রাজা রাণী শাহযাদা ও শাহযাদীদের সেবার্থে শত শত দাসী ও খোঁজা ছিল। 'জেনানা মহল' এত বিরাট ছিল যে, এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নারী পরিদর্শিকা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হতো।[২৯]

'রিয়াজুস সালাতীনের' লেখক গোলাম হোসেন সলীমের মতে, সুলতান গিয়াসউদ্‌দীন আজম শাহ্ সারাহ, গুল ও লালাহ্ নামে তিনটি ক্রীতদাসীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ অনুরাগ প্রদর্শন করেন।[৩০] কয়েক হাজার হাবশী ক্রীতদাস

Dhaka University Institutional Repository

আমদানি করেন সুলতান রুকন উদ্দিন বারবক শাহ্ এবং তাদেরকে রাজদরবার ও রাজপ্রাসাদ সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যে নিয়োগ করেন। সুলতান ও রাজপরিবারের লোকদের পরেই আমির ওমরাহ্ ছিলেন দেশের সামাজিক সোপানে। সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রেণী ছিলেন তারা। তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসন দখল করেছিলেন রাষ্ট্রে ও সমাজে। রাজ সিংহাসন ও রাজকীয় মর্যাদা এদের সমর্থন ও আনুগত্যের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল।

ঙ. চারিত্রিক সততা

গভীর ধর্মীয় আবেগ ছাড়াও ঐ যুগের মুসলমানগণ কতকগুলো প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী ছিল। চৈনিক দূতগণ বাংলার মুসলমানদের সততা ও সরলতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বাংলার মুসলমানদের কথা বলতে গিয়ে মহুয়ান বলেন, "তাদের আচার ব্যবহারে তারা অকপট ও সরল"।[৩১] অন্য একজন চৈনিক দূত সি-ইয়াং-চৌ-কুং তিয়েন লু -লিখেছেন যে, "বাংলার অধিবাসীরা ভাল স্বভাবের লোক, তারা ধনী এবং সৎ।"[৩২]

সিং চা সেংলান মন্তব্য করেন যে, বাংলার বণিকগণ এরূপ সৎ ছিলেন যে, তারা সর্বদা তাদের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি মেনে চলতেন এবং চুক্তি সম্পাদিত হবার পর তারা কখনো দুঃখ প্রকাশ করতেন না, এমনকি এটা যদি দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার লেনদেনও হতো।[৩৩] সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায় যে, বাংলার মুসলমানদের সুনাম ছিল কয়েকটি চমৎকার গুণাবলীর জন্য । এ প্রসঙ্গে কবি মুকুন্দরামের অভিমত উল্লেখযোগ্য । বীর নগরের মুসলমানদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি লেখেন, "তারা জ্ঞানী এবং বিদ্বান; কপটতা ও ফাঁকিবাজ তাদের নিকট অপরিচিত।"[৩৪] এতে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশে সমগ্র মুসলিম শাসনকালে সরলতা ছিল মুসলমানদের চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুণ। বাঙালীদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আবুল ফজল বলেন, "তারা বিনয়ী এবং তারা নিয়মিতভাবে খাজনা পরিশোধ করে।"[৩৫]

চ. শাসক

আধুনিক ও অনবদ্য পদ্ধতিতে সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাষ্ট্রের অতীব প্রয়োজন। রাজা অতীতের রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতেন। বাংলা মুসলিম শাসনকালে, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শাসনকর্তা কিংবা সুলতান সমাজের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব বহন করতেন। তিনি এভাবে শাসকের সহকারী (নায়েব) তার এলাকার জনসাধারণের সামাজিক জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তার অধীনস্থ প্রজাসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা এবং তাদের সুখও উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করা তার কর্তব্য কর্ম ছিল । নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করতো হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকট। অভাব অভিযোগ ও অন্যায়ের প্রতিকার দূরীকরণের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতো। এমনকি, প্রজারাও মুসলমান শাসকদের এই সামাজিক মর্যাদা ও কার্যের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। হিন্দু কবি বিজয়গুপ্ত বাংলার সুলতান হোসেন শাহকে জনহিতকর কার্যের দ্বারা তার রাজ্যের প্রজাদের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[৩৬]

কবি শ্রীকর নন্দী সুলতান নুসরৎ শাহ, সুলতান হোসেন শাহ ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছুটি খানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "নুসরৎ শাহ একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি সর্বদা রামের মতো তাঁর প্রজাদের প্রতি যত্নবান (রামায়ণ মহাকাব্যের বীর ও রাজা)। হোসেন শাহ জগতের প্রভু । তিনি তার রাজ্য নিরপেক্ষতার সঙ্গে শাসন করেন। ছুটি খানকেও কবি এই একই ভাষায় প্রশংসা করেছেন"।[৩৭]

বিশেষ করে মুসলমান শাসকের মুসলমান সমাজের প্রতি বিশেষ কতকগুলো দায়িত্ব কর্তব্য ছিল। সুলতান হোসেন শাহ মুসলমানদের সামাজিক জীবনের নেতা ছিলেন চিন্তায় ও কর্মে। তার অবশ্য কর্তব্য ছিল ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করা ও ইসলামের বিধান অনুসরণ করে মুসলমানদের ঐক্য বজায় রাখা এবং তাদের ধর্মীয় বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা। তিনি সভাপতিত্ব করতেন মুসলমানের অনুষ্ঠানাদিতে এবং মুসলমান সমাজের সকল সম্ভাব্য উপায়ে উন্নতির ব্যবস্থা করতেন। মুসলমান সুলতানের ধর্ম সংক্রান্ত ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমান শাসকের কর্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

(১) ধর্মীয় বিধি-নিষেধ সমূহের সীমা নির্ধারণ করা

(২) শুক্রবারে ও ঈদের নামাজে খুতবা পাঠ করা

(৩) ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করা

(৪) দান-খয়রাত করার উদ্দেশ্যে কর আদায় করা

(৫) ঝগড়া -বিবাদের বিচার আচার করা

(৬) রাজ্য রক্ষার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ :- বিদ্রোহী ও শান্তি বিঘ্নকারীদের অপসারণ করা এবং ধর্মের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব প্রবর্তনকারী ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধাচরণকারীদের দমন করা, বিশেষত যারা ইসলামের আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান করা।[৩৮]

জিয়াউদ্দিন বারণীর 'তারিখ-ই-ফিরূজশাহী' গ্রন্থে মুসলমান সমাজের প্রতি মুসলমান শাসনকর্তার কর্তব্য সম্বন্ধে সুলতান ইল্‌তুৎমিশের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

(১) ধর্মীয় পবিত্রতা সংরক্ষণ

(২) অনুমোদিত আচার-আচরণের প্রকাশ্য বিরোধিতার শাস্তি বিধান করা

(৩) ধর্মীয় বিষয়াদিতে আলেম ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়োগ এবং

(৪) সকলের প্রতি নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা ইত্যাদি।[৩৯]

বাংলার মুসলমান সমাজের প্রতি মুসলমান শাসনকর্তা তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তা তিনি পালন করতেন। মুসলমানের ব্যাপারে তাঁর গভীর আগ্রহ প্রদর্শনের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান ধর্মীয় মনোভাব ও সংহতির জন্য তিনি মসজিদ, মাদ্‌রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি মুসলমান সমাজের উন্নতির নিমিত্তে উলামা, ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষকদের নানাভাবে সাহায্য করেন। মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে তিনি নিয়মিতভাবে যোগদান করেন এবং এভাবে তিনি মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব দেন।

ছ. সমাজের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য

সমসাময়িক বাঙালী কবিদের বর্ণনা থেকে বোধগম্য হয় যে, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য মুসলমান সমাজ সুপ্রসিদ্ধ ছিল এবং মুসলমানের জীবন কুরআন ও হাদিস অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হতো। ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো রীতিমত তারা পালন করতো। এমনকি তাঁরা পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণেও প্রাথমিক যুগের মুসলমানের ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলতো।

মুকুন্দরামের বিবরণ থেকে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবি লিখেছেন, "তারা (মুসলমানরা) প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে এবং লাল পাটি (মাদুর) বিছিয়ে প্রত্যহ পাঁচ বার নামাজ পড়ে। সোলেমানি মালা গুণে তারা পীর পয়গম্বরের ধ্যান করে এবং পীরের মোকামে প্রদীপ জ্বালায়। তাদের দশ বিশজন একত্রে বসে বিচার-আচার করে। মুসলমানগণ সদা সর্বদা কুরআন কেতাব পাঠ করে।" কবি আরও বলেছেন, "তারা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা আর কাউকে ভয় করে না। প্রাণ গেলেও

Dhaka University Institutional Repository

এরা রোজা ত্যাগ করে না।"[৪০] মুসলমানদের গভীর ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে এই হিন্দু কবির সাক্ষ্য উক্ত অন্যান্যদের উক্তি থেকেও সমর্থিত হয়। কবি বিপ্রদাস তার 'মনসামঙ্গলে' লিখেছেন, " সৈয়দ মোল্লা ও কাজীগণ সর্বদা কুরআন ও ধর্মীয় গ্রন্থ (কেতাব) আলোচনা করে এবং প্রতিদিন দু'বার তারা ধর্মগ্রন্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।"

কবি আরও বলেন যে, "সকল সৈয়দ, মোল্লা ও অন্যান্যরা আল্লাহর নাম জপ করে এবং সর্বক্ষণ কুরআন কেতাবের কথা বলেন। তারা হিন্দুদের নিকট কালেমা পাঠ করে এবং তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেয়। তারা প্রত্যহ অজু ও নামাজ শিক্ষা দেয় ও মক্তবের কাজে নিয়োজিত থাকে।"[৪১]

পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারে বাংলার মুসলমানগণ ইসলামের ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল। কবি বর্ণিত বর্ণনায় দেখা যায় যে, মুসলমানরা পয়গম্বর ও প্রথম যুগের মুসলমানদের অনুসরণ করে মাথা মুণ্ডন করতো এবং লম্বা দাড়ি রাখতো এবং পায়জামা, টুপি ও লম্বা কোর্তা পরিধান করতো। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে অন্যান্য কবিদের বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। মহুয়ান লিখেছেন, "লোকেরা (মুসলমান) তাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং মাথায় সাদা সুতী পাগড়ী ব্যবহার করে। তারা বন্ধনীমুক্ত লম্বা ও ঢিলা পোশাক পরিধান করে ও মাথায় শিরাবরণ ব্যবহার করে।"[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.২. দ্বিতীয় স্তর ঃ

ক. উৎসবাদি

ইসলাম একটি সহজ-সরল ধর্ম এবং এর অনুষ্ঠানাদি আড়ম্বরহীন। তবুও এ উৎসবগুলোকে বাংলার মুসলমানরা বড় আনন্দ উৎসবে পরিণত করে। 'তবকাত-ই-নাসিরী' থেকে অবহিত হওয়া যায় যে, রমজান মাসে সুলতানগণ দৈনন্দিন ধর্মীয় আলোচনার ব্যবস্থা করেন এবং এ কারণে ধর্মপ্রচারক নিযুক্ত করেন। তারা 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আজহার' নামাজ পড়ার জন্যে ইমামও নিযুক্ত করেন। শহরের বাইরে বিরাট উন্মুক্ত জায়গায় অথবা গ্রামে ঈদের নামাজের প্রবর্তন করেন এবং এসব স্থানকে ঈদগাহ বলা হতো। [৪৩]

'বাহারিস্তান-ই-গায়েবীর লেখক মীর্জা নাথনের বর্ণনা - রমজান ও অন্যান্য উৎসবাদি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করে তিনি বলেন, "রমজান মাসের সূচনা থেকে এর শেষ দিন পর্যন্ত ছোট বড় সকলে প্রত্যহ নিজ নিজ বন্ধুর তাঁবুতে যেতেন। এটা একটা সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়ায় যে, প্রত্যহ সকলে এক একজন বন্ধুর তাঁবুতে তাঁদের সময় কাটাতো।"[৪৪]

এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রমজান শুধু সংযম ও নামাজের মাসই ছিল না, এই মাসে প্রতি রাতে অবস্থাপন্ন মুসলমানদের গৃহ সাক্ষাৎ করা ও খানাপিনার আয়োজন করা হতো।

বাংলাদেশে ঈদের আনন্দ বার্তা ঘোষণা করা হতো মোগল সৈন্যদের ছাউনি থেকে। এতে প্রকাশ পায়, ঈদ উৎসবকে কিভাবে মুসলমানরা স্বাগত জানাতো এবং এ আনন্দ উৎসবে আমোদ প্রমোদ করতো ও এর জন্য শোকরিয়া আদায় করতো। মুসলমানরা নারী পুরুষ ও ছেলে-মেয়েরা ঈদের দিন সুন্দর কাপড় পরতো। গোলাম হোসেন ঈদুল আজহাকে আনন্দ ফুর্তি ও সকল মানুষের জন্য নতুন পোশাক পরিচ্ছদ পরার একটি দিন বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলমানরা শোভাযাত্রা করে ঈদগায় যেত সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা উৎসবের সময়ে চলার পথে ছড়িয়ে দিতেন মুক্ত হস্তে অর্থ ও উপহারাদি। আর গরীবদেরকে সাধারণ মুসলমানরা দান-খয়রাত করতেন।

ঈদগার বিশাল জমায়াতে মুসলমানরা ঈদের নামাজ পড়তেন ও আমোদ-প্রমোদ চলতো এবং সর্বত্র অভিনন্দনের আনন্দে মুখরিত হতো। এ সমস্ত বড় উৎসবের দিনে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ ও একত্রে আনন্দ-উৎসব করার জন্য তাঁরা বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গমনাগমন করতেন। ঈদুল আজহার অনুষ্ঠান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আড়ম্বরের মধ্যে পালন করা হতো। এ উৎসবের উৎপত্তি মূলত পয়গম্বর ইব্‌রাহীম (আঃ) থেকে

Dhaka University Institutional Repository

এবং এটা ছিল ত্যাগের অনুষ্ঠান। মুসলমানগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এ মহৎ নিদর্শন অনুসরণ করেন। মুসলমানগণ এ দিনে নতুন কাপড় পরিধান করতেন এবং মিছিল সহকারে তকবির ধ্বনি পুনরাবৃত্তি করতে করতে যেতেন। বিশাল জনায়াতে তারা নামাজ আদায় করতেন এবং আমোদ-আহলাদ প্রকাশ করে ভ্রাতৃসুলভ অনুরাগের দ্বারা একে অন্যকে অভিনন্দন জানাতেন।

তারপর তাঁদের সামর্থানুযায়ী তাঁরা গরু, ছাগল, মহিষ বা উট কোরবানি করতেন ও ভোজের ব্যবস্থা করতেন নিজেদের মধ্যে। কোরবানি করতে অসমর্থ গরীব লোকদের মধ্যে ভোজের ব্যবস্থা করতেন। অসমর্থ গরীব লোকদের মাঝে কোরবানির গোশ্‌ত বিতরণ করা হতো। এটা ছিল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাতের এবং খানাপিনা ও একত্রে আনন্দ উৎসব করার বিশেষ পর্ব।

ঈদুল আজহার উল্লেখ প্রসঙ্গে মীর্জা নাথন বলেন, " উৎসবের দিনে বন্ধুজন, আত্মীয়-স্বজন ও কর্মচারীরা একে অন্যের নিকটে যেতেন এবং ঈদ উপলক্ষে তাদের অভিনন্দন জানাতেন। সৈন্যাধ্যক্ষ সুজাত খান এই আনন্দ উৎসবের দিনটিতে বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়নের নিমিত্তে একটি সামাজিক সম্মিলনের আয়োজন করেন।" ঈদ উপলক্ষে উপহার উপঢৌকন বিতরণ করা হতো বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে । ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন বর্ণনা করে মীর্জা নাথন অন্য এক জায়গায় বলেন যে, সকলেই ঈদগায় গমন করেন।

বাঙালী মুসলমানগণ রাসূলের জন্ম বার্ষিকীও আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করতেন। জানা যায় যে, নবাব মুর্শিদকুলী খান এই পর্বকে একটি বিরাট উৎসবে পরিণত করেন। রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম বার দিন তিনি লোকদেরকে আপ্যায়িত করেন। একটি বিশেষ মুহূর্তে মুসলমানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে খুশির সময় ঘোষণা করে তোপধ্বনি করা হতো ।[৪৫]

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া যায় যে, ইসলাম প্রবর্তকের জন্মদিন স্মরণীয় করে রাখার জন্য মহানবীর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা সভার অনুষ্ঠান অতীব প্রয়োজন। তাছাড়া শাসনকর্তা ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের মাঝে একটি প্রচলিত প্রথায়ও পরিণত হয়েছিল। এ সময় ধর্মভীরু ও বিদ্বানদেরকে উপহার প্রদান করা হত । মুসলমানদের এক বিশেষ সুযোগ ছিল ভোজ ও শোকরানা আদায়ের।

মুসলমানদের শা'বান মাসের ১৫ তারিখে শব-ই-বরাত ছিল আর একটি প্রসিদ্ধ পর্ব। সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বাংলার নবাবগণ বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে এই পর্ব পালন করেন। আলোক মালায় গৃহ সজ্জিত করা হতো এবং স্ত্রী-পুরুষ কর্তৃক প্রতিটি গৃহে এবং মসজিদে সারারাত ব্যাপী নামাজ পড়া হতো।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর ভোজের অনুষ্ঠান হতো এবং গরীবদের মধ্যে দান খয়রাত বিতরণ করা হতো। আতশবাজী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল।[৪৬]

'মুহররম' একটা নীরব শোকের পর্ব হিসেবে সুন্নী মুসলমানগণ পালন করতো এবং শিয়াদের আবেগময় খেলা ও মিছিলে সাধারণত অংশ গ্রহণ করতো না। এ সকল ব্যাপারে সুন্নীদের মাঝে শুধুমাত্র সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা অংশগ্রহণ করতো। মুহররমের প্রথম দিনটি মুসলমানরা নববর্ষের প্রথমদিন হিসেবেও পালন করতো। 'বাহারিস্তান' থেকে জানা যায় যে, মুসলমানগণ উৎসব ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের দ্বারা মুহররমের চাঁদকে স্বাগত জানাতো।[৪৭]

বাঙালী মুসলমানগণ 'বেড়া' উৎসব পালন করতো বলে অবগত হওয়া যায়। পয়গম্বর খোয়াজ খিজিরের সম্মানার্থে এ উৎসব পালন করা হতো। সমগ্র জলরাশির অভিভাবক খোয়াজ খিজিরকে বিশ্বাস করা হতো। এ উৎসব বিশাল আড়ম্বরের সাথে নবাব মুর্শিদকুলী খান পালন করতেন । 'বেড়া' উৎসবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো কলাগাছ, বাঁশের তৈরি নৌকা সাজান এবং তদুপরি কাগজ নির্মিত গৃহ ও মসজিদ ইত্যাদি। ৩০০ ঘনফুট আকারের একটি নৌকা মুর্শিদকুলী খান নির্মাণ করেন এবং তিনি এর উপরে ঘর ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি খুব জাঁকজমকের সঙ্গে জাহাজটি আলোক সজ্জিত করে নদীতে ভাসান। জাহাজের আলোক-মালা বহুদূর থেকে দেখা যেতো। এ উপলক্ষে আতশবাজীর প্রদর্শনীও থাকতো। 'বেড়া' উৎসবটি বাংলা ভদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার দিনে উদ্‌যাপিত হতো। বহু মুসলমান এ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতো। নবাব মুকাররম খান কর্তৃক ঢাকায় এ উৎসবটি প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল।[৪৮]

খ. সামাজিক অনুষ্ঠানাদি

পুত্র সন্তানের জন্ম উপলক্ষে বিশেষ করে সমাজে আনন্দ উৎসবের রীতি ছিল। মীর্জা নাথনের একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভের সংবাদে বাংলার মোগল সৈন্যবাহিনী একদিন এক রাত্রি আনন্দ উৎসব করে। বন্ধু-বান্ধবরা সৌভাগ্যের অধিকারী পিতাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতেন। মস্ত বড় ভোজ দেয়া হতো এবং মেহমানদেরকে উপহার দেয়া হতো। এ উপলক্ষে হাতির লড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হতো।[৪৯] শিশুর জন্ম উৎসবে পরিবারের আনন্দ ফুর্তি সমকালীন বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মজনুর জন্মের পর তার পিতা-মাতার গৃহে সকল প্রকার আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করেন। নৃত্য গীতেরও আয়োজন করা হয় এবং সকলেই এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

এই শুভ মুহূর্তে সুখী পিতামাতা উপহার উপঢৌকন ও দান-খয়রাত করতেন। সয়ফুল মুলুকের জন্মের পর তার পিতা-মাতা গরীব দুঃখীদের টাকা-পয়সা ও কাপড় চোপড় দান করেন। এরপর তিনি গণৎকার ডেকে আনেন এবং তার সাহায্যে শিশুর কুষ্ঠিনামা প্রস্তুত করেন ।[৫১]

জন মার্শালের লেখায় প্রকাশ পায় যে, শিশুর নামকরণে বাঙালী মুসলমানরা ধর্মীয় পবিত্র পুস্তক আলোচনা করতেন। মুসলমানদের মাঝে অদ্যাবধি এ রীতি প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশে মুসলমানদের মাঝে এটাই আরবী নাম সমূহের প্রচলনের কারণ । শিশুর জন্মের সাথে সংশ্লিষ্ট পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল 'আকিকা'। 'আকিকা বলতে নবজাত শিশুর কেশ বুঝায়' এটা সাধারণভাবে নবজাত শিশুর কেশ কামানো এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর নাম অনুমোদনের অনুষ্ঠান ছিল। এ অনুষ্ঠানে পুত্র সন্তানের বেলায় দুটো এবং কন্যা-সন্তানের বেলায় একটি মহিষ বা ছাগল উৎসর্গ করা হতো এবং আত্মীয়-স্বজন ও গরীবদের মধ্যে গোসত বিতরণ করে দেয়া হতো। আর অবস্থাপন্ন পিতা-মাতা কর্তৃক জন-সাধারণকে আপ্যায়িত করা হতো। শিশু চার বছর চার মাস ও চার দিনের বয়োপ্রাপ্ত হলে 'বিসমিল্লাহ খানি' নামে পরিচিত অনুষ্ঠান পালন করা হতো। প্রার্থনার পবিত্র অনুষ্ঠানের সঙ্গে আশীর্বাদ ও আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে শিশুকে শিক্ষকের নিকট সমর্পণ করা হতো। এভাবে শিশুকে লেখাপড়ায় দীক্ষা দেয়া হতো।[৫২]

'খাৎনা' বলা হয় লিঙ্গাগ্রের চর্ম কর্তনকে। পুরুষ লিঙ্গের অগ্র ভাগের চর্ম কর্তন সুন্নাত। সাধারণত এটা আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হতো। সপ্তম বছরে খাৎনা দেয়া হতো। এটি আনন্দ উৎসব, আমোদ-প্রমোদ ও উপহার বিতরণের একটি পর্ব ছিল।

গ. আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক রীতি

উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা বিশ্রাম ও শ্রান্তি বিনোদনের জন্য মিলন-অনুষ্ঠান ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতেন। কবি, জ্ঞানী, গুণী, রসজ্ঞ ব্যক্তি ও গায়ক গায়িকাদের প্রতিযোগিতায় প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠতো এ সামাজিক সম্মিলনীসমূহ। সাহিত্য আলোচনার ব্যবস্থা ছিল সম্মিলনীতে। এরূপ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হতো আমোদ-প্রমোদের জন্য। আড়ম্বরপূর্ণ পোশাকে সজ্জিতা গায়িকারা নর্তকীরা তাদের সুমধুর সঙ্গীত ও চমৎকার অভিনয় দ্বারা অভ্যাগতদেরকে আপ্যায়িত করতো। সে যুগে একদল পেশাদার সঙ্গীত শিল্পীও ছিলেন যারা প্রত্যহ প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের গৃহে গৃহে গমন করতেন এবং সঙ্গীত যন্ত্র বাজাতেন। খাদ্য এবং টাকা পয়সা কিংবা অন্য জিনিসপত্র উপহার দিয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হতো।[৫৩] চীনা দূতগণ বাংলাদেশে প্রচলিত সাধারণ আমোদ প্রমোদের

Dhaka University Institutional Repository

কথা বর্ণনা করেছেন। তাদের অভিমত হলো তখন বাংলাদেশে এক শ্রেণীর ব্যাঘ্রবশকারী লোক ছিল, ব্যাঘ্রকে লোহার শৃঙ্খলে তারা বেঁধে বাজারে বন্দরে ও গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াত এবং লোকদের আনন্দ দান করতো বাঘের সঙ্গে খেলা করে।

বাঘ খেলোয়াড় প্রাঙ্গণে শায়িত বাঘের বন্ধন মুক্ত করে দিতো। অতঃপর সে বাঘকে খোঁচা দিতো। ফলে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র তার উপর ঝাঁপিয়ে পরতো। সে তখন পড়ে গিয়ে বাঘের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতো। এ রকম কয়েকবার করার পর সে তার মুষ্ঠি বাঘের গলার ভেতরে ঢুকিয়ে দিতো। কিন্তু সে কোনো আঘাত পেতো না। খেলা শেষ হলে, সে পুনরায় বাঘকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলতো। তার দুঃসাহসিক খেলার জন্য দর্শকরা তাকে টাকা পয়সা দিতো এবং বাঘকেও মাংস খেতে দিতো।[৫৪] অভিজাত শ্রেণীর লোকদের 'চৌগান' ছিল প্রিয় খেলা। পারস্য থেকে চৌগান নাম ও খেলা উৎপত্তি হয়েছে। উন্মুক্ত মাঠে বাঁকা লাঠির সাহায্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হতো। প্রত্যেক দল গোলরক্ষক এবং দশজন করে অশ্বারোহী খেলোয়াড় থাকতো। যষ্টির সাহায্যে প্রতিটি দল অন্যপক্ষের গোল পোষ্টের ভেতর বল ঢুকিয়ে দিতে প্রচেষ্টা চালাত। বাঙালী কবি আলাওলের পদ্মাবতীতে চমকপ্রদ খেলার উল্লেখ আছে। কবি বিপ্রদাসও চৌগান খেলার উল্লেখ করেছেন।[৫৫]

মুসলিম আমলে সমাজে পাশা খেলার খুবই প্রচলন ছিল। এ খেলা ছিল বিয়ে অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, বর ও কনে তাদের বাসর ঘরে পাশা খেলতো।[৫৬] গেরু নামক এক প্রকার খেলা ছেলে মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় খেলা। একটি বল নিয়ে বালকদের দু'দলের মধ্যে এ খেলাটি অনুষ্ঠিত হতো। একপক্ষ বলটি বিরোধী পক্ষের দিকে ছুঁড়ে দিতো এবং তারা যদি বলটি ধরতে পারতো তাহলে তারা এক পয়েন্ট লাভ করতো। চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও এ খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৭] সাঁতার কাটা ও নৌকা চালানো প্রতিযোগিতা জনপ্রিয় আমোদ-প্রমোদ ছিল। ঘনরামের মনসামঙ্গল কবিতায় কুস্তি প্রতিযোগিতার উল্লেখ আছে।[৫৮]

জুয়া খেলা এবং বাজী রাখাও সেকালের জনপ্রিয় আমোদ প্রমোদ ছিল। বণিকগণ বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বাজী ধরতো। এমনকি, স্বামী-স্ত্রী একত্রে পাশা খেলে আমোদ-প্রমোদ করতো।[৫৯] আর এটি কৌতুককর জনপ্রিয় আমোদ প্রমোদ ছিল কবুতর উড়ান। প্রেমিকগণ তাদের প্রেমিকাদের সঙ্গে মিলনের আয়োজন করতো কবুতর উড়িয়ে। এর ব্যবহার ছিল খেলার ক্ষেত্রেও। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের এক জোড়া পারাবত থাকতো। একটি স্ত্রী অন্যটি পুরুষ কবুতর। পুরুষ পারাবতটি ছেড়ে দেয়া হতো এবং স্ত্রীটাকে হাতে ধরে রাখা হতো। তাকে বিজয়ী বিবেচনা করা হতো, যার পারাবতটি উচ্চে

Dhaka University Institutional Repository

উড্ডিয়মান হয়ে নিচে নেমে আসতো এবং এর সঙ্গীটির প্রতি অনুরাগবশত মালিকের হাতের উপরে এসে উপবিষ্ট হতো।[৬০] সম্রাট আকবরের প্রিয় খেলা ছিল পারাবত উড়ান।

ঘ. বিয়ে - সাদি

নারী কি পুরুষ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব বিয়ে-সাদি। সকলে প্রচুর আনন্দ উৎসবের সাথে যোগ দিত বিয়েতে এবং প্রচণ্ড আমোদ আহলাদ, ধুমধাম ও সমারোহের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতো বিবাহ। সমাজের প্রথা ছিল খুব কম বয়সে বালক বালিকাদেরকে বিবাহ দেয়া। মুসলমান আমলের বাংলা সাহিত্যে এটা প্রতিফলিত হয়েছে।

'লায়লী মজনু' কাব্যের নায়ক মজনুর পিতা তাঁর পুত্রের বিয়ের প্রস্তাব করেন যখন বালক কেবলমাত্র পাঠশালায় বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তো। সে সময় মজনু নিশ্চয়ই বার বছরের কম বয়সের হয়ে থাকবে। এই কাব্যের নায়িকা লায়লীকে তার প্রাথমিক বিদ্যা শেষ হওয়ার পূর্বেই বিয়ে দেয়া হয়েছিল।[৬১] সে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছিল তখন তার বয়স নিশ্চয়ই এগার বছরের উর্ধ্বে ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বেশী মাত্রায় প্রচলিত ছিল বাল্য বিবাহ। বাল্য বয়সে তাদের ছেলে-মেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের যৌবনাবস্থায় পৌছাবার পূর্বেই বিয়ে দেয়া তারা ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রসিদ্ধ গুরু শ্রী চৈতন্য বার বছর বয়সে বিয়ে করেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক কালকেতু যখন কেবলমাত্র এগার বছর বয়সের তখন তার সঙ্গে ফুল্লরার বিয়ে হয়।[৬২] এমনকি, গোটা উপমহাদেশে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল বলে ষোড়শ শতকেও ইউরোপীয় পরিব্রাজকদের বর্ণনায় প্রকাশ পায় ।

আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরীতে' ঐ সময়কার সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবুল ফজলের মতে, "বিদ্যোৎসাহী সম্রাট আকবর এ কু প্রথার বিরোধিতা করেন এবং তিনি ষোল বছরের নিম্নে ছেলেদের ও চৌদ্দ বছরের নিম্নে মেয়েদের বিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ করেন। তিনি বিবাহ বন্ধনে বর ও কনের সম্মতি অত্যাবশ্যক করে দেন। সম্রাট যৌতুক প্রথা, বহু-বিবাহ এবং যুবক ও বৃদ্ধ রমণীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করেন ।[৬৩]

অনুমিত হয়, সম্রাট আকবরের বিধি-নিষেধ সমাজে কার্যকরী হয়নি। কারণ এ আইনের পরেই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্য বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি প্রথা প্রচলিত থাকতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ অনেক নজির রয়েছে যে, বাল্য বিবাহ প্রথা গোটা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী প্রচলিত ছিল। ক্রাফ্টন উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমান বালক-বালিকাদেরকে তাদের শিশুকালেই বিয়ে দেয়া হতো। তাদের ১৩ কি ১৪ বছর বয়সেই বিবাহ হতো এবং তাদের আলাদা পারিবারিক জীবন শুরু হতো। এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না উচ্চ শ্রেণীর পরিবারগুলোও।

সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ তাঁর ভ্রাতা আকরাম উদ্দৌলাহকে অল্প বয়সেই বিবাহ দেয়া হয়। সিরাজউদ্দৌলাহর কন্যার এত অল্প বয়সে বিয়ে হয় যে, যখন তিনি ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২০ বছর এবং ঐ বয়সে তিনি শরফুন্নিসা, আসমতুন্নিসা, সখিনা ও আমাতুল মাহ্‌দি এই চার কন্যা রেখে যান। এদের সকলেরই অল্প বয়সে বিবাহ হয়।[৬৪]

তৎকালীন সমাজে অনেক বয়সে মেয়েদের বিয়ে-সাদি অসম্মানজনক ছিল। এক্ষেত্রে বালিকার পিতা-মাতা সকলের নিকট নিন্দনীয় ছিল। বালিকাদের বেলায় যেমন তাদের স্বামী নির্বাচনে, বালকদের বেলায় তেমনি স্ত্রী গ্রহণে; কোনো প্রকার নিজস্ব মতামত ছিল না। সমাজে বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ে এটাই ছিল নিয়ম। পিতা-মাতা এবং অভিভাবকেরা তাদের (পুত্র-কন্যাদের) বিয়েতে তাদের মতের কোনো প্রয়োজন আছে বলে বিবেচনা করেননি। কখনো কখনো একটি সুন্দরী ও সুরুচি-সম্পন্না মেয়েকে একজন বধির বা অন্ধ বা বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হতো।[৬৫] মাঝে মাঝে শিক্ষিতা মেয়েরা অবশ্য তাদের নিজেদের স্বামী নির্বাচন করতে পারতো।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' থেকে জানা যায় যে, অবস্থাপন্ন হিন্দুদের এমনকি সাতজন স্ত্রী ছিল। একই স্বামীর স্ত্রীগণের মধ্যে কবি একজনের মনোভাব উল্লেখ করে বলেন, " সাত সতীনের ঘরে বাস করা খুবই কষ্টকর"।[৬৬] বরপক্ষ বিয়ের কনেকে পণ দিত মুসলমানদের মধ্যে। কখনো কখনো কনের পিতা বর ও বর পক্ষকে উপহার প্রদান করতেন। কিন্তু এটা তাঁর পক্ষে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক ছিল না। বরকে মূল্যবান যৌতুক প্রদানের রীতি ছিল হিন্দুদের মাঝে। এমনকি তাদের নিম্নশ্রেণীর ভেতরেও কণের পিতা বরকে যৌতুক প্রদান করতে বাধ্য হতো। ঘটককেও মোটা রকমের পুরস্কার দিতে হতো।

বিয়ের ব্যাপারে যদি দু'পক্ষ ঐক্যমতে আসত তাহলে 'তিলক' বা মাগদি নামে পরিচিত বিয়ের বাগদান উৎসব পালিত হতো। সেই সময় বিয়ের জন্য একটি তারিখও স্থির করা হতো। একে বলা হতো 'লগন'। এ সময় থেকে বিয়ের জন্য শুরু হতো প্রস্তুতি। বিয়ের দিনের (লগন) দু'তিন দিন পূর্বে 'সাচক' নামে আরেকটি সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করা হতো। 'সাচক' একটি মেহেন্দী গাছ, এর পাতা ছেঁচে লাল রঙ বের করা হয়। এ রঙ কনের হাত পায়ের অঙ্গুলী রঙীন করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। বাংলাতে এটি হলুদ

Dhaka University Institutional Repository

(হলদি) বা 'গায়ে-হলুদ' অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। এ অনুষ্ঠানে কনের দেহে হলুদ মাখান হয়।[৬৭] মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের একটি বিয়ে থেকে জাঁকজমকপূর্ণ 'সাচক' অনুষ্ঠানের আভাস পাওয়া যায়। সূর্যাস্তের পর বরের বাড়ি থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ অলংকারাদি, মিষ্টান্ন, সুগন্ধি ইত্যাদি বহু মূল্যবান উপহার দ্রব্য কনের বাড়িতে পাঠান হয়েছিল, সারি সারি হাজার হাজার প্রজ্বলিত বাতির সাহায্যে শত শত দাস দাসী এগুলো শোভাযাত্রা সহকারে বহন করে নেয়। বরের আত্মীয় স্বজন ও তাদের বাড়ির মহিলাগণ সুসজ্জিত বাহনে চড়ে মিছিলে যোগদান করেন।[৬৮] বিয়ে-সাদি খুব আমোদ-প্রমোদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতো উচ্চ শ্রেণীর পরিবারগুলোতেও। মহা ধুমধামের সাথে বিবাহ উৎসব কয়েক মাস ধরে চলতো। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাহ এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আকরাম উদ্দৌলাহর বিয়ের একটি সমসাময়িক বর্ণনায় উচ্চ শ্রেণীর বিয়ের জাঁকজমক ও অপরিমিত ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। "আকরামউদ্দৌলাহর বিয়েতে উচ্চ নিচ সকল লোকদেরকে পোশাক দেয়া হয়েছিল; সুগন্ধিদ্রব্য, আলোক সজ্জা ও আতশবাজীর জন্য ব্যয় হয়েছিল বার লক্ষ টাকা । পুরো তিন মাস ধরে দিনরাত এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, একলক্ষ পদাতিক সৈন্য এবং এক কোটি প্রজা আনন্দ উৎসব, গান-বাজনা ইত্যাদি প্রমোদ উপভোগ করে"।[৬৯] সিরাজউদ্দৌলাহর দ্বিতীয় বিয়ে তদীয় ভ্রাতার বিয়ে অপেক্ষাও অধিকতর জাঁকজমকপূর্ণ ছিল।

কনে ও বরের বাড়িঘর বিয়ে উপলক্ষে সুরুচিপূর্ণভাবে সাজান হতো এবং আলোকিত করা হতো চমৎকারভাবে। কনে বাড়িতে বিয়ে অনুষ্ঠান হতো। একটা অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করা হতো খোলা জায়গা । সেখানে নির্মিত হতো একটি মঞ্চ এবং টাঙ্গানো হতো উপরে চাঁদোয়া। তোরণ নির্মাণ করা হতো কলাগাছ পুঁতে। তোরণ, মঞ্চ এবং দু'য়ের মধ্যপথ পুষ্পমাল্য ও পত্রের দ্বারা সুশোভিত করা হতো।

বিয়ের গান-বাজনা হতো এবং বাঁশি ও নানান প্রকার সঙ্গীত যন্ত্রাদির গান বাজনায় বর ও কনের বাড়ি উৎসব মুখরিত হয়ে উঠত। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী নারী ও যুবতী মেয়েরা কনের বাড়ি এসে জমায়েত হতো। তাদের হাস্য কৌতুক ও রসিকতায় বিবাহ উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। বহু কৌতুকপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা বিবাহ উৎসবের সঙ্গে বিজড়িত ছিল।[৭০]

'উজ্জ্বল পোশাক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে বরপক্ষ শোভাযাত্রা করে কনের বাড়ি যেতো। সমস্ত পথে বাদ্যকার নানান ধরনের সুশ্রাব্য বাদ্যযন্ত্র বাজাতো। রাত্রি বেলা শত শত মশাল জ্বলে উঠত। কনের পিতা ও আত্মীয়-স্বজনরা বরপক্ষকে বিশেষ সমাদরের সাথে অভ্যর্থনা করে মঞ্চে নিয়ে যেতো। সুমিষ্ট শরবত ও পান দিয়ে অভ্যাগত মেহমানদেরকে আপ্যায়িত করা হতো।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের পর বর ও কনের পাশা খেলার একটা প্রথা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। সাধারণত 'বাসর ঘর' নামে পরিচিত একটি কক্ষে এ খেলার ব্যবস্থা হতো। বাংলাদেশে 'বাসর' হচ্ছে সুন্দর ও সুগন্ধি পুষ্পে সজ্জিত একটি গৃহকক্ষ। সেখানে নব-বিবাহিত দম্পতিকে তাদের বিয়ের প্রথম রাত্রে রাখা হয়। বেহুলা ও লখীন্দর বাসর ঘরে পাশা খেলেছিল।[৭২]

'রামায়ণে' বর ও কনের মধ্যে পাশা খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭৩] এ প্রথা মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। 'বাসর ঘরে' কনের আত্মীয়া-বান্ধবীগণ বরের সঙ্গে কৌতুক করতো এবং নব বিবাহিত দম্পতিকে নিয়ে নানা প্রকার রঙ্গ-তামাশা করতো।[৭৪]

ঙ. পোশাক-পরিচ্ছদ

সমসাময়িক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে যে, বিশিষ্ট পোশাক পরিচ্ছদ ছিল বাংলার মুসলমানদের। চৈনিক বর্ণনানুসারে, উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ ইজার বা পায়জামা এবং গোলাকৃতি কলারের ঢিলা পোশাক (গাউন বা লম্বা সার্ট পরিধান করতেন। এই সার্ট একটি বড় রঙ্গীন রুমাল দিয়ে কোমরে বাঁধা থাকতো। তাঁরা সাদা সুতী পাগড়ী ব্যবহার করতেন। এ পাগড়ী দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুট এবং প্রস্থে ৬ ইঞ্চি ছিল। তারা স্বর্ণ সুতার ফিতা সংযুক্ত মেষের চামড়ার জুতা কিংবা চিত্রিত চামড়ার জুতা ব্যবহার করতেন।[৭৫]

সাধারণ মুসলমানদের পোশাক উল্লেখ করে বারবোসা বলেন, "সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা খাট সাদা সার্ট পরিধান করে এবং এগুলো উরুদেশ মাঝামাঝি পর্যন্ত বিলম্বিত থাকে। তারা তিন প্যাঁচের ক্ষুদ্র শিরাবরণ ব্যবহার করে। তাদের সকলেই চামড়ার জুতা পরে থাকে এবং অন্যান্যরা উত্তমরূপে কারুকার্য করা এবং রেশমী অথবা সোনালী সুতায় সেলাই করা চপ্পল পরিধান করে থাকে।[৭৬]

বারবোসা সাধারণ মুসলমানদের পোশাকরূপে পায়জামা, খাট সার্ট ও ছোট পাগড়ী ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন; বাস্তবিকই এগুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পরিধেয় পোশাক ছিল। মুসলমানদের পোশাক সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যেও এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। পায়জামা, লম্বা ও খাট সার্ট এবং টুপী ইত্যাদি ছিল অবস্থাপন্ন মুসলমান এবং মোল্লা-মৌলবি প্রমুখ ধর্ম নেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ । যে সকল মুসলমান টুপী পরতেন না তারা তাদেরকে পছন্দ করতেন না।[৭৭]

সাধারণ লোকেরা তথা কৃষক ও শ্রমিকগণ, লুঙ্গী (স্কার্টের মত পরিধেয় বস্ত্র), নিমা অথবা ক্ষুদ্র হাফসার্ট এবং টুপী পরিধান করতো। জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা। তারা পরিধান করতেন কামিজ (সার্ট ও সালোয়ার পায়জামা) বা স্কার্ট।

Dhaka University Institutional Repository

চৈনিক দূতগণ রমণীদের পোশাক সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন, " মেয়েলোকেরা খাট জামা পরিধান করত, এ সবের চারদিকে ভাজ করা একখণ্ড সুতী কাপড়, সিল্ক কিংবা বুটি তোলা রেশমী বস্ত্র থাকতো।"

কোন প্রসাধন দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল না মুসলমান মহিলাদের ' তারা তাদের গলায় চতুষ্পার্শে ঝুলান কাপড় রাখত এবং তারা কেশ বিন্যাস করে পেছনে খোঁপা বাঁধে। তাদের পায়ের গোঁড়ালীতে ও হাতের কব্জিতে সোনার বলয় থাকতো এবং হাতপায়ের আঙ্গুলীতে তারা আংটি ব্যবহার করতো।' আরও বারবোসা দৃষ্টি দেন যে, রমণীরা অতি মূল্যবান পোশাক এবং রেশমী ও মুক্তা বসান স্বর্ণের অলংকারাদিতে ভূষিতা হতেন।

চ. অলঙ্কারাদি

বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি অত্যন্ত ভালবাসতো। তারা বিভিন্ন প্রকার শাড়ি বা ঘাগরা এবং রেশমী জামা বা সুতী কাপড় পরিধান করতো। সম্পদশালী ধনী পরিবারের মেয়েরা গলার হার, মুক্তা ও হীরার কর্ণকুণ্ডল ও বালা, বলয় ও মূল্যবান পাথর-বসান সোনার আংটি ইত্যাদিতে সজ্জিত হতো। তারা কোমরে 'কিঙ্কিনী' নাকে আরও একটি অলঙ্কার পরতো এবং পায়ে নূপুর বা পাঁইজার পরতো।[৭৮]

সেকালের মেয়েদের মধ্যে নানা প্রকারের প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার প্রচলন ছিল। তাঁরা চুলের খোঁপা বাঁধতো এবং অঞ্জন দিয়ে চোখ কাল করে তুলতো। তারা সিঁদুর দিয়ে কপালের অগ্রভাগ রক্তিমাভ করে তুলতো এবং জাফরান (কুমকুম) দিয়ে ঠোঁট রক্ত গোলাপী করতো। মেহেদী মেখে তারা হাতের নখ রঙ্গীন করতো। তাঁরা কপালে চন্দনের ফোঁটা দিত এবং গলায় পুষ্পের মালা ব্যবহার করতো।[৭৯] সাধারণ স্ত্রীলোকেরা সাধারণ রকমের শাড়ি বা ঘাগরা এবং চোলী পরিধান করতো। কানের দুল এবং নথ (নাকের আংটি) তাদের অলঙ্কার ছিল। পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের উল্লেখ স্থানীয় লোকসঙ্গীতে পাওয়া যায়।[৮০] তারা নানা প্রকার রৌপ্য অলঙ্কারও ব্যবহার করতো। র‍্যালফ ফিচ লিখেছেন, মেয়ে লোকেরা বহু রূপার গহনা তাদের গলায় ও বাহুতে পরিধান করতো। তারা পায়ে রূপা ও তামার এবং হাতির দাঁতের আংটি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতো।[৮১]

ছ. খাদ্য

সমাজের উচ্চ শ্রেণী মুসলমান সম্পর্কে তাদের খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক পরিচ্ছদে বিলাসিতার বর্ণনা করা হয়েছে। সিষাসৃতিয়ান মানরিক এবং চীনা দূতগণের বিবরণ থেকে মুসলমানের খাবার সম্বন্ধে সামান্য

Dhaka University Institutional Repository

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাদের খাবার টেবিলে গরু, মুরগী, ভেড়া ইত্যাদি মাংসের তৈরি নানা প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হতো। বহু রকমের মিষ্টি ও ফলমূল খাবার তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। লেবু, শসা, মুলা, কাঁচা লংকা ইত্যাদির তৈরি নানা জাতীয় আচার ছিল মুসলমানের খাদ্যের বিশিষ্ট অঙ্গ ।

সিবাস্‌তিয়ান মানরিক বলেন, এগুলো ক্ষুধা বৃদ্ধি করতো, আবার খাবারের দিকে আকৃষ্ট করতো। এ ধরনের উপাদেয় খাবার হিন্দুরা তৈরি করতো এবং আচারের ব্যবহার জানত না ক্ষুধা উদ্রেকের জন্য। কোথাও আচারের কোনো বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়নি হিন্দুদের ভোজ ও সাধারণ খাদ্য-দ্রব্যের বর্ণনায় ।

বাংলা সাহিত্যে খাদ্য সম্বন্ধে বহু উল্লেখ আছে। জানা যায় যে, বাংলার মুসলমানরা মুরগী, মেষমাংস ও অন্যান্য মাংসের উপাচার পছন্দ করতো।[৮২] বাঙালী মুসলমানদের খাদ্য হিসেবে রুটিরও উল্লেখ আছে।[৮৩] তাছাড়া মাছ ও শাক-সব্‌জি লোকের সাধারণ খাদ্য ছিল। বাংলার নদ-নদী ও জলাশয়ে নানা জাতীয় মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এর মাটিতে জন্মাত বিভিন্ন প্রকারের শাক-সব্‌জি।[৮৪] খিচুড়ী (সাধারণত ঘি বা তেলের সঙ্গে চাল ও লঙ্কা দিয়ে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য) ছিল লোকের প্রিয় খাবার। এমনকি, খিচুড়ীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল উচ্চ শ্রেণীর লোকদেরও।

বার্নিয়ারের মতে, সম্রাট শাহ্‌জাহানের খুবই প্রিয় ছিল খিচুড়ী।

কফি ও চা ঃ- চৈনিক বিবরণ এবং সমকালীন বর্ণনা থেকে অবহিত হওয়া যায় যে, সাধারণত সে যুগের লোকেরা 'শরবত' পান করতো ঠাণ্ডা পানীয় হিসেবে। বিশেষভাবে চৈনিক দূতগণ উল্লেখ করেন যে, পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে যখন তারা বাংলায় আগমন করেন তখন এখানে চা অপরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এ প্রদেশে মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে চায়ের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। 'কফির' বর্ণনা পাওয়া যায় নবাব আলিবর্দীর সময়ে। নবাব স্বয়ং ভোরে কফি পান করতেন। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে চা পানের রীতি গুজরাটে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত ছিল বলে অবগত হওয়া যায়।

১৬৯২-৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জে. অভিংটন সুরাটে ইংরেজদের কারখানার ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, তার আমলে ভারতে চায়ের প্রথা ছিল একটি স্বাস্থ্যকর পানীয় দ্রব্য হিসেবে। তিনি বলেন, " মাথা ধরা, পেটের ব্যথা ও পাথরের প্রতিষেধক হিসেবে ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করা। গরম মসলা সংমিশ্রিত চায়ের খুব সুনাম আছে। ভারতবর্ষে সাধারণত এই চা কিছুটা মিছরি অথবা কিছুটা সংরক্ষিত লেবুর সঙ্গে পান করা হয়।"[৮৫] একটি বিলাতী জাহাজে বন্দর আব্বাস থেকে সুরাটে আসার পথে মনডেলসলো প্রত্যহ দু'তিনবার চা পান করতেন। পারস্যের মধ্যদিয়ে ভ্রমণকালে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল । চা পানের ফলে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল সাক্ষ্য প্রমাণে পরিলক্ষিত হয় যে, গুজরাটে চা পান প্রথা প্রচলিত ছিল সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে এবং এটা খুব সম্ভব এদেশে প্রথম আমদানি করেছিল ইংরেজ বণিকগণ।

পান খাওয়া ঃ - বাঙালী সমাজে পান (পান ও সুপারী) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল । সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে পান খাওয়ার খুব প্রচলন ছিল । পান ব্যতীত বিয়ে-সাদি অথবা অন্য কোনো অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে পারতো না। যখনই উভয় পক্ষ পান আদান-প্রদান করতো, তখনই বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি সাব্যস্ত হতো। গরীব লোকদের বিয়েতে কোনো পক্ষে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে মেহমানদের আপ্যায়ন করতে অপারগ হলে অন্তত পান দিয়ে তাদেরকে সমাদর করতো ।

নিমন্ত্রণ জানানোর একটি মাধ্যম ছিল পান। দৌলতখান লোদী বাবরকে ভারতে আমন্ত্রণ জানাতে কাবুলে তাঁর নিকট পান প্রেরণ করেন। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অতিথি আপ্যায়নের পরিসমাপ্তি হতো পান বিতরণের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে পান খাওয়ার প্রচলন সম্পর্কে চৈনিক দূতগণ বর্ণনা করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে চায়ের প্রথা ছিল না এবং পান সুপারী দিয়ে তারা মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করতো। মেহমানকে পান দিয়ে আপ্যায়ন করা হলে তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে বলে মনে করা হতো। ভারতীয় সমাজে পানের মর্যাদার কথা বর্ণনা করে 'মাসালিক আল আবসার' গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক আঃ রশিদ লিখেছেন, "এই দেশের লোকেরা এর (পান) চেয়ে অধিক সম্মানের বিষয় অন্য কিছুকে মনে করে না। গৃহকর্তা কোনো অতিথিকে সব রকম উপাদেয় খাদ্য কাবাব, মিষ্টান্ন, পানীয় দ্রব্য, সুগন্ধি ও সুবাসিত দ্রব্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করলেও যদি শেষে পান দ্বারা আপ্যায়ন না করে, তাহলে তাকে সম্মান করা হয়নি বলে মনে করা হতো।" একইভাবে কোনো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাকে 'পান' প্রদান করতেন। পানের গুণাবলী সম্পর্কে লেখক প্রচলিত মতও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, এটা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, পানের এমন কতকগুলো গুণ আছে, যা' মদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে সুগন্ধিযুক্ত করে, হজমি শক্তি বৃদ্ধি করে, মন খুব প্রফুল্ল রাখে, বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ করে, স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ আনন্দ দান করে । এর স্বাদ খুবই তৃপ্তিদায়ক"।[৮৭]

ধূম পান ঃ- বাঙ্গালী সমাজে ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ধূমপানের অভ্যাস খুবই প্রচলিত দেখা যায়। আমেরিকায় ধূমপানের উৎপত্তি হয়েছে। স্পেন দেশীয় লোকদের দ্বারা প্রথম তামাক খাওয়ার প্রথা ইউরোপে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবর্তিত হয়। সেখান থেকে তাদের প্রতিবেশি পর্তুগীজ বণিকগণ এটা ভারতে নিয়ে আসে। সপ্তদশ শতকের শুরুতে আসফ খান নামে একজন মোগল আমির বিজাপুর রাজ্য থেকে কিছু তামাকের পাইপ সম্রাট আকবরের রাজ দরবারে নিয়ে আসেন। বিজাপুরে ধূমপান রীতি প্রচলিত হয়েছিল পর্তুগীজ বণিকদের মেলামেশার প্রভাবে। এভাবে বিজাপুর থেকে মোগল রাজদরবারে ধূমপান রীতি আসে এবং তারপর উত্তর ভারতে প্রচলিত হয় আকবরের রাজত্বের শেষভাগে।

ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলার সঙ্গে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান শুরু হয়। বাঙালী অধিবাসীরা ঐ সময় থেকে ধূমপানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠে। ধূমপান রীতি বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এটা সামাজিক জীবনের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে কালক্রমে পরিগণিত হয়। হুক্কা দিয়ে (দেশীয় জলনালী) ধূমপান প্রত্যেক পরিবারে একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কবি বিপ্রদাসের বর্ণনায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮৮]

ষোড়শ শতকের অন্য একজন কবি ষষ্ঠীবরও দেশীয় নলের সাহায্যে সাধারণ লোকের ধূমপান করার কথা উল্লেখ করেছেন।[৮৯]

জ. দাস ব্যবসা

বাংলাদেশে দাসত্ব রীতি মুসলমান আমলে ব্যাপক প্রচলন ছিল। চতুর্দশ শতকের চতুর্থ দশকে যখন ইবনে বতুতা বাংলাদেশে পরিভ্রমণে আসেন, তখন তিনি বাজারে বহু ক্রীতদাস -ক্রীতদাসী বেচা-কেনা হতে দেখেন। তিনি লিখেছেন, "উপ-পত্নীরূপে সেবা কার্যের উপযুক্ত একটি সুন্দরী যুবতীকে এক স্বর্ণ দিনারে আমার সম্মুখে বিক্রি করা হয়।"

একটি স্বর্ণ দিনার মরক্কোর স্বর্ণ দিনারের ২Error! দিনারের সমান। জানা যায় যে, সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ্ তার সেবার জন্য কয়েক হাজার হাবশী ক্রীতদাস আমদানি করেছিলেন। প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি সেবার জন্য ক্রীতদাস ও খোজা নিয়োগ করতেন। বারবোসা পর্তুগীজ বণিক বাংলাদেশে দাস-ব্যবসা এবং খোজাকরণ রীতির কথা উল্লেখ করেন। এই শহরের মুরদেশীয় বণিকগণ দেশের অভ্যন্তরে চলে যায় এবং পিতামাতা বা অন্যান্যদের নিকট থেকে বহু ছেলে মেয়ে ক্রয় করে আনে। এদেরকে পণ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং প্রত্যেককে ২০ বা ৩০ টি ইউরোপীয় স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রায় ইরানিদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। ইরানিগণ তাদের স্ত্রী ও গৃহের জন্য পাহারাদার হিসেবে এদেরকে খুব প্রয়োজনীয় মনে করে।[৯০] সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে বাংলাদেশে খোজাকরণ এবং দাস ব্যবসা রীতির অস্তিত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। এ নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা সম্রাট বন্ধ করার চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ রাজনৈতিক অবস্থা

বাংলার ইতিহাস সাধারণত তিনটি স্তরে বিভক্ত । যথা ঃ প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ।[৯১] প্রাচীন যুগ বলতে আদিকাল থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, মধ্য যুগ ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং আধুনিক যুগ ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।[৯২] সুতরাং বাংলায় মুসলমানদের আগমন হয়েছে মধ্যযুগে।[৯৩] সে কারণে বাংলার মধ্যযুগের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করার প্রয়াস রাখছি ।

মধ্যযুগ ছিল মুসলিম শাসনাধীনে। তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্‌দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর[৯৪] বঙ্গবিজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৫] আর এ বঙ্গ বিজয় বাংলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মিনহাজের মতে ইখতিয়ার উদ্‌দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়া জয় করে অল্প দিনের মধ্যে গৌড় জয় করেন।[৯৬] গৌড় জয় করার পরে তিনি " গৌড় বিজয়" মোহরাংকিত স্মারকরূপে একটি মুদ্রা জারি করেন। তাই এ সূত্রে আমরা বলতে পারি যে, ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে বা ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে শীত মৌসুমে (অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে) তিনি নদীয়া জয় করেন।[৯৭] এ নদীয়া বিজয়ের প্রভাব বিশেষ করে সমগ্র বাংলার রাজনীতির উপর পড়ে। বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৩২ বছরে ২৩ জন শাসনকর্তা বাংলাদেশ শাসন করেন।[৯৮] আর এ যুগকে বাংলার মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগ বলা হয়। প্রাথমিক যুগের এ শাসনকর্তাগণ ছিলেন তুর্কী ও আফগান জাতীয়। আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র তাঁদের গড়ার উদ্দেশ্য না থাকলেও আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র হতে তাঁরা উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন।[৯৯]

বখতিয়ার খলজী লখনৌতিতে[১০০] রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেও মূলত তিনি এখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে দিনাজপুরের দেবকোট থেকে শাসন কার্যাবলী পরিচালনা করতেন।[১০১] তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় এক যুগ পর্যন্ত দেবকোটের এ গুরুত্ব অপরিবর্তিত থাকে। বখতিয়ার খলজীর পরে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজীই সর্ব প্রথম রাজ্য বিস্তারে মন দেন এবং তিনি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম সকল দিকেই স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত বর্ধিত করেন। তিনিই সর্ব প্রথম লখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে বাংলার মুসলিম রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। দিল্লীর সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশ তাঁকে বাধা না দিলে হয়তো তার স্বপ্ন সফল হতো।[১০২]

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজীর রাজত্বকালে (১২১২-১২২৭ খ্রি:) দেবকোটের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং লখনৌতি রাজধানী হয়ে উঠে পুরোপুরি।[১০৩]

তাই লখনৌতির মুসলিম রাজ্যে মুসলিম সমাজ গঠনেও ইওজ খলজী বিশেষ অবদান রাখেন। বখতিয়ার খলজীর মত ইওজ খলজীও বুঝতে পারেন যে, মুসলিম সমাজ হবে মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি। সেজন্য তিনি বখতিয়ার খলজীর অনুসরণ করে স্থানে স্থানে মসজিদ মাদ্‌রাসা এবং খানকাহ নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ এ কারণে ইওজ খলজীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ..... তিনি আলিম, সৈয়দ ও সূফীদের বিশেষ ভক্তি করতেন এবং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য বৃত্তি, পুরস্কার দিতেন এবং জায়গীর প্রদান করতেন।[১০৪]

ইওজ খলজীর প্রতি দিল্লীর বৈরিতা

বাংলার স্বাধীনতাকে তৎকালীন দিল্লীর সুলতান মেনে নেননি। বখতিয়ার খলজী লখনৌতি জয় করেন। কিন্তু তাঁকে দিল্লীর সুলতান সাহায্য বা সমর্থন করেনি। বখতিয়ার খলজী এবং তাঁর পরবর্তী খলজীরা মনে করতো, লখনৌতি তাদেরই অধিকৃত, বখতিয়ার খলজী সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেও তাঁর পরবর্তী খলজীরা দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করে নি। খলজী মালিকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে দিল্লীর সুলতান কুতুব-উদ-দীন আইবেক লখনৌতি জয় করার সুযোগ পান এবং কুতুব-উদ-দীনের উত্তরাধিকারী সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশও লখনৌতিকে দিল্লীর অংশ মনে করতেন। তাই তিনি ইওজ খলজীর স্বাধীনতা সহ্য করেন নি।

১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুতমিশ লখনৌতি আক্রমণ করেন। তখন ইওজ খলজীও তাঁকে বাধা দেন।[১০৫] তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনী কাজে লাগান এবং গঙ্গা নদী তীরে রণতরী নিয়ে তেলিয়াগড়ে দিল্লীর সুলতানের পথ রোধ করেন। যুদ্ধের ফলাফল নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে এটা সত্য যে, উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়, সন্ধির শর্ত মতে ইওজ খলজী ইলতুতমিশকে ৮০ লক্ষ টাকার সম্পদ এবং ৩৮টি হাতি দিতে সম্মত হন। ইওজ খলজী ইলতুতমিশের বশ্যতা স্বীকার করেন, তাঁর নামে মুদ্রা জারী করতে এবং খুতবা পাঠ করতে স্বীকৃত হন।[১০৬] এরপর ইলতুতমিশ, মালিক আলা-উদ-দীন জানীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে যান। কিন্তু ইলতুতমিশ দিল্লীর দিকে পা বাড়ালেই ইওজ খলজী মালিক আলা-উদ-দীন জানীকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দেন। তিনি সন্ধির অন্যান্য শর্তগুলো মেনেছিলেন কিনা সন্দেহ।[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান ইলতুতমিশও ভবিষ্যতে সুযোগ নেয়ার উদ্দেশ্যে তখনকার মত দিল্লী ফিরে যান। সুলতান গিয়াস উদ-দীন ইওজ খলজী বুঝতে পারেন যে, ইলতুতমিশ এ অপমান সহ্য না করে পুনরায় তাঁকে আক্রমণ করবেন। তাই ইওজ প্রায় এক বছর লখনৌতি ছেড়ে কোথাও যান নি। তিনি ছিলেন ইলতুতমিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ইতোমধ্যে অযোধ্যার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়, সেখানে হিন্দুরা বিদ্রোহ করে। ইলতুতমিশ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ-দীন মাহমুদকে বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ অযোধ্যায় পাঠান। অপরদিকে ইওজ খলজী ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববাংলা অভিযানে যান। এদিকে যুবরাজ নাসির উদ-দীন মাহমুদ লখনৌতির দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং ইওজ খলজী পূর্ববঙ্গে বের হলে তাঁর অনুপস্থিতিতে হঠাৎ করে লখনৌতি আক্রমণ করেন। ইওজ খলজী সংবাদ পেয়ে পূর্ববঙ্গ অভিযান স্থগিত করে রাজধানীতে ফিরে আসেন। কিন্তু পৌছার আগেই লখনৌতি দিল্লীর সৈন্যদের অধিকারে চলে যায়। তিনি লখনৌতি পর্যন্ত পৌছে আবার ভুল করেন, তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে প্রস্তুতি নেয়ার চেষ্টা না করে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। লখনৌতি দিল্লীর অধীনে চলে যায়। আর সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ-দীন মাহমুদ লখনৌতির গভর্নর নিযুক্ত হন।[১০৮]

নাসির-উদ-দীন মাহমুদের পর চারজন শাসনকর্তা লখনৌতি রাজ্য শাসন করেন। অতঃপর তুগরল তুগান খান ১২৩৬ থেকে ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় নয় বৎসর তিনি বাংলা শাসন করেন। তিনি দেশের সর্বত্র ইসলাম প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[১০৯] এরপর দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন ১২৭২ খ্রিষ্টাব্দে আমীর আমীন খানকে লখনৌতির গভর্নর এবং তুগরল খানকে ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত করেন। লখনৌতিতে ডেপুটি বা সহকারী গভর্নর নিযুক্তির উদাহরণ এই প্রথম, সম্ভবত এটা বলবনের কূটনীতির অংশ।[১১০]

প্রায়ই লখনৌতিতে বিদ্রোহ হতো, দু'জন গভর্নর থাকলে একজন অন্যজনের বিদ্রোহী কার্যকলাপ সম্পর্কে সুলতানকে সময়মত জানাতে পারবেন মনে করেই বলবন এ নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেন। কিন্তু দেখা গেল বলবনের এ নীতি ফলপ্রসূ হয়নি। অতঃপর তুগরল খান বিদ্রোহ করেন এবং মুইজ-উদ-দীন তুগরল উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে দিল্লীর সুলতান বলবন পাঞ্জাব সীমান্ত রক্ষার কাজ পরিদর্শনে প্রায় দু'বছর সেখানে অবস্থান করেন। সে সময় তিনি একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে কিছুদিন রাজ দরবারে উপস্থিত হতে অক্ষম হয়ে পড়েন। এতে বাইরে রটে যায় যে সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন বলবনের মৃত্যু হয়েছে। এই সংবাদ লখনৌতিতে পৌছলে তুগরলের অনুচরেরা তাঁকে বিদ্রোহ করার উস্কানি দিতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক বারানী তাঁর তারীখ-ই-ফীরূজশাহীতে তুগরলের বিদ্রোহের প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে, "বাংলাদেশ সর্বদা বিদ্রোহী প্রদেশরূপে গণ্য ছিল। দিল্লীর লোকেরা বাংলাদেশকে 'বলগাকপুর' বা বিদ্রোহী এলাকা নামে অভিহিত করতো।"[১১১] বারানী আরও বলেন যে, বাংলাদেশের আবহাওয়াই বিদ্রোহীদের পক্ষে সহায়ক ছিল। শাসকেরা স্বভাবতই এখানে বিদ্রোহী ছিল; কোন নতুন শাসক আসলে অমাত্য অনুচর সকলে মিলে তাঁকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিত; যদি কোন শাসক বিদ্রোহ করতে অস্বীকার করতেন তা'হলে অমাত্য অনুচরেরা সকলে মিলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রচেষ্টা করতো।[১১২] অতএব শাসককে বাধ্য হয়ে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হতো। তুগরল খানের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ পেয়ে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন অত্যন্ত মর্মাহত হন। ফলে বলবন তুগরল খানের বিরুদ্ধে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী পাঠান। মুইজ্জ-উদ-দীন তুগরলের নিকট দিল্লীর বাহিনী দু'বার পরাজিত হলে বলবন অত্যন্ত লজ্জিত এবং মর্মাহত হন।

বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে সঙ্গে নিয়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে লখনৌতি অভিযানে অগ্রসর হন। তাঁর এ অভিযান ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে শুরু হয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, " বিদ্রোহী তুগরলকে ধ্বংস না করে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন না। তুগরল বলবনকে ভাল করে জানতেন, তিনি বুঝতে পারেন যে বলবনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পেরে উঠবেন না।"[১১৩] তাই তিনি রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করেন। বলবন লখনৌতি অধিকার করেন। এরপর বলবনের তৎপরতায় এক ক্ষুদ্র দলের সেনাপতি শের আন্দাজ তুগরলকে এক নদীর তীরে বিশ্রাম নিতে দেখেন। তখন তুগরল তাঁকে দেখে সাঁতরিয়ে নদী পার হতে গেলে হঠাৎ তীর বিদ্ধ হয়ে পড়ে যান, ফলে একজন সৈন্য তাঁর মাথা কেটে নেন।[১১৪]

তুগরল স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণাই তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। এরপর বলবন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বোগরা খানকে লখনৌতির গভর্নর নিযুক্ত করেন। বলবন তাঁর পুত্র বুগরা খানের জন্য ফীরূজ নামীয় দু'জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। বুগরা খান ১২৮১ থেকে ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নর হিসেবে লখনৌতি শাসন করেন।[১১৫] গিয়াস উদ-দীন বলবনের জ্যেষ্ঠ ছেলে মুহাম্মদ মোঙ্গলদের সঙ্গে এক যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তিনি নিজে নিহত হন। তিনি সুযোগ্য পুত্রের শোকে বিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। বলবন এ মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু নিকটে মনে করে কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লখনৌতি থেকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মৃত্যুর পর বুগরা খান দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন। বুগরা খান দিল্লী যান, কিছুদিন অবস্থান করে বিরক্ত হয়ে তিনি লখনৌতি ফিরে আসেন।[১১৬] তিনি দিল্লীর সিংহাসনের চেয়ে শ্যামল বাংলার গভর্নরের পদকে লোভনীয় মনে করেন। সুলতান গিয়াস উদ-দীন বলবন ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক

Dhaka University Institutional Repository

গমন করেন। বলবনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লখনৌতি স্বাধীন বলবনী বংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বুগরা খান এই স্বাধীন সুলতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। বুগরা খানের পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কায়কাউস সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস (১২৯১-১৩০০ খ্রি:) উপাধি নিয়ে লখনৌতির সিংহাসনে বসেন।[১১৭]

বাংলার ইতিহাসে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ের প্রথম দিকে লখনৌতি সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহের অধীনে স্বাধীন ছিল। দিল্লীর খলজী সুলতানদের আমলে লখনৌতি বরাবর স্বাধীনতা উপভোগ করতে ছিল, কিন্তু দিল্লীতে তুগলকেরা শাসন ক্ষমতা দখল করার পরে তাঁরা লখনৌতি পুনরাধিকার করে। দিল্লীতে আবার সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বের মধ্যভাগে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে লখনৌতি স্বাধীন হয়ে যায়। ফলে বাংলার স্বাধীনতা দু'শত বছরকাল স্থায়ী হয়। শামস-উদ-দীন -ফীরূজ শাহের সময় থেকে বাংলার মুসলিম রাজ্যও বিস্তৃতি লাভ করে।[১১৮]

মুদ্রা ও শিলালিপির ভিত্তিতে জানা যায় যে, সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের পরে সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। উৎকীর্ণ অনেক মুদ্রা শামস-উদ-দীন কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে; এ মুদ্রাগুলো লখনৌতি এবং সোনারগাঁও টাকশাল থেকে জারিকৃত, যা ৭০১-৭২০ এর /৭২২ হিজরি/ অর্থাৎ ১৩০১ থেকে ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ। তিনি মুদ্রায় "আল-সুলতান আল-আজম শামস-আল-দুনিয়া ওয়াল-দীন আবুল মুজফফর ফীরূজ শাহ আল-সুলতান" উপাধি গ্রহণ করেন এবং মুদ্রার অন্য পিঠে আব্বাসীয় খলিফা আল মুস্তাসিম বিল্লাহ-র নাম অঙ্কন করেন।[১১৯]

সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরূজ শাহ ছিলেন একজন উন্নত চরিত্র ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যেমনি তিনি রাজ্য বিস্তার করেন, তেমনি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি পরিণত বয়সে সিংহাসনে বসেন। তাঁর দ্বারা বাংলায় ইসলাম প্রচার ও বৃদ্ধি পায়। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তিনি রাজ্য বিস্তারের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তার পথ ধরেই পরবর্তীতে সমগ্র বাংলায় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২০]

ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ সোনার গাঁয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলায় এক নবযুগের সূচনা করেন। ইতিপূর্বেও মাঝে মাঝে লখনৌতি স্বাধীন হয়, কিন্তু স্বাধীনতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। ফখর-উদ-দীন স্বাধীনতা ঘোষণা করে এমন এক যুগের সূচনা করেন যাতে সমগ্র বাংলার স্বাধীনতা দু'শত বছর স্থায়ী হয়। ফখর-উদ-দীনের পরে ইলিয়াস শাহ্ বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন। সমগ্র বাংলাকে তিনি একীভূত করে সমগ্র বাংলার সুলতান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁও -এর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পূর্ব পরিচয় জানা যায় না, তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ছিলেন সোনারগাঁও-এর গভর্নর বাহ্‌রাম খানের সিলাহ্‌দার বা বর্ম রক্ষক। মনে হয় তিনি ছিলেন বহিরাগত এবং সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলকের সাথে বাংলাদেশে আসেন। বাহরাম খান ছিলেন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলকের পালক পুত্র। সোনারগাঁও টাঁকশাল হতে উৎকীর্ণ অনেক মুদ্রা ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলো ৭৩৯-৭৫০ হি:/১৩৩৮ হতে ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ ।[১২১] এগার বছর ধরে তিনি রাজত্ব করেন। তাঁর মুদ্রায় সোনারগাঁও-কে "হজরত জালাল সোনারগাঁও রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সোনারগাঁও যে তাঁর রাজধানী ছিল তা'জালাল' বা মহান শব্দ দ্বারা বোঝান হয়েছে।

ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের পরে ইখতিয়ার উদ্-দীন গাজী শাহ সোনারগাঁও-এর সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় তিন বছর রাজত্ব করেন এবং স্বনামে মুদ্রা জারী করেন। ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জানা যায় না। কারণ গাজী শাহ মুদ্রায় দাবী করেননি যে তিনি ফখর-উদ-দীনের পুত্র ছিলেন।[১২২]

এরপর হাজী ইলিয়াস ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে লখনৌতির আলা-উদ-দীন আলী শাহকে হত্যা করে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন রাজধানী ছিল ফীরূজাবাদে (পাণ্ডুয়া)। হাজী ইলিয়াস ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সিংহাসনে বসে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি নেন। এ বংশ প্রায় সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে সমগ্র বাংলাদেশে যশ ও কৃতিত্বের সাথে রাজত্ব করে এবং বাংলার বাইরেও প্রভাব বিস্তার করে। শুধু তাই নয়, এ বংশের সুলতানেরা ছিলেন উদার ও বিদ্বান এবং বিদ্যা ও শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের পূর্ব পরিচয় বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে আরবের দু'জন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবন হজর এবং আল-সখাভীর মতে তিনি ছিলেন পূর্ব ইরানের সিজিস্তানের অধিবাসী।[১২৩] উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলার মুসলমান সুলতানদের মধ্যে ইলিয়াস শাহ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ বেশ কিছুদিন স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করেন। সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পরে সিকান্দর শাহ ৭৫৯ হিজরি মোতাবেক ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১২৪]

401421

সর্বোপরি সিকান্দার শাহ্ শান্তি ও নির্বিঘ্নে ১৩৫৮ হতে ১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। কিন্তু তাঁর শাসনের প্রথম দিকে একবার দিল্লীর সুলতান ফীরূজ শাহ্ তুগলক তাঁকে দিল্লীর অধীনতা মেনে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

নিতে আদেশ দেন।[১২৫] কিন্তু সিকান্দার শাহ্ তার সেই আদেশ অমান্য করলে ফিরোজ শাহ্ তুঘলক লক্ষাধিক সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী বাংলা অভিমুখে পাঠান।[১২৬] সিকান্দার শাহ্ সংবাদ পেয়ে স্বসৈন্যে দুর্গম একডালা দুর্গে [১২৭] অবস্থান করেন। একডালা দুর্গ তুঘলক বাহিনী অবরোধ করে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ উভয়ের মধ্যে চলতে থাকে।[১২৮] তবে তুঘলক বাহিনী যুদ্ধে বেশী সুবিধা করতে না পারায় সেই সুযোগে দিল্লীর আমীর আজম হুমায়ূন হায়বত খান অগ্রসর হয়ে সিকান্দারের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিলে তাদের মধ্যে সন্ধি চুক্তি হয়। এতে করে তাদের বাংলা অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১২৯]

সিকান্দর শাহের তিন খানা শিলালিপি এবং অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি মুসলমান সূফী-সাধকগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের সম্মানে মসজিদ তৈরি করেন। ১৩৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিনাজপুর জেলার দেবকোটে মোল্লা শাহ্ আতার দরগাহে[১৩০] একটি মসজিদ তৈরি করেন।[১৩১] সিকান্দর শাহ ৭৫৯ হিজরি থেকে ৭৯২ হিজরি পর্যন্ত মুদ্রা জারি করেন। তাঁর মুদ্রা বা শিলালিপিতে তাঁর পরিপূর্ণ রাজকীয় নাম পাওয়া যায় না, কেবল তিনি "আবুল মুজাহিদ সিকান্দর শাহ্" নামেই মুদ্রা বা শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন। তিনি "সুলতান উল-আজম" এবং "সুলতান-উল-মুয়াজ্জাম" উপাধিও গ্রহণ করেন। তিনি কোন কোন মুদ্রায় " আল মুজাহিদ ফি সাবীল-উর-রহমান" বা "আল্লাহর রাস্তায় যোদ্ধা" বলে দাবি করেছেন। আবার তিনি কোন কোন মুদ্রায় "ইমাম-উল-আজম" উপাধি নিয়েছেন।[১৩২] এ উপাধি দ্বারা মনে হয় তিনি ধর্ম বিষয়েও মুসলমানদের নেতৃত্বের দাবী করতেন। সুলতান সিকান্দর শাহের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর ছেলে গিয়াস-উদ্-দীন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বীয় পিতাকে হত্যা করেন এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১৩৩]

এ বর্ণনা কোন সমসাময়িক ইতিহাসে পাওয়া যায় না, অবশ্য বাংলার সাথে দিল্লীর সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ায় দিল্লীতে লিখিত ইতিহাসে এ বিষয়ের কিছু পাওয়া সম্ভবপর হয়। কিন্তু বুকাননের বিবরণে রিয়াজুস সালাতীনে উল্লেখিত বর্ণনার সমর্থন মিলে। বুকানন বলেন, "Ghyashuddin having also taken disgust, returned to the same palce (Sonargaon) and afferwards made war against his father, who after a reign of 32 years, fell in battle at a palce called Satra, near Goyalpara."[১৩৪]

গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহকে লিখিত বিহারের শায়খ মুজাফফর শামস বলখীর চিঠিতে সিকান্দর শাহকে বারবার "সুলতান শহীদ" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৫] এতে মনে হয় সিকান্দর শাহ্ যুদ্ধে শহীদ হন এবং এর দ্বারা পুত্রের হাতে পিতার শহীদ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুদ্রার সাক্ষ্যেও মনে হয়, গিয়াস-উদ-দীন পিতার রাজত্বের শেষ দিকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।[১৩৬] নিঃসন্দেহে সুলতান সিকান্দর শাহের মৃত্যুর তারিখ নির্ণয় করা যায় না। সিকান্দর শাহ কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রার শেষ তারিখ ৭৯১ হিজরি এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পরবর্তী সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রার প্রথম তারিখ ৭৯৫ হিজরি। অবশ্য গিয়াস উদ-দীন আজম শাহ কর্তৃক ৭৯০ হিজরিতে উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায় এবং পণ্ডিতেরা মনে করেন যে আজম শাহ বিদ্রোহ করে ৭৯০ হিজরিতে মুদ্রা জারি করেন।[১৩৭]

৭৯১ হিজরির মধ্যে সিকান্দর শাহ মৃত্যুবরণ করেন বলে মনে হয় এবং বিশেষ করে ৭৯৩ হিজরিতে সিকান্দর শাহের মৃত্যু তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং যুদ্ধে পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন। রিয়াজুস সালাতীনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, বিমাতার চক্রান্তই আজম শাহকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করে। যদিও গিয়াস-উদ-দীন পিতৃহন্তা তবুও পিতৃহত্যার জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিলেন না। কিন্তু আজম শাহ্ বৈমাত্রেয় ভাইদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।[১৩৮] রিয়াজুস সালাতীনে আরও বলা হয়েছে যে, তিনি বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে অন্ধ করে দেন, কিন্তু বুকাননের মতে তিনি তাদেরকে হত্যা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের অন্ধ করা বা হত্যা করা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে নতুন কিছুই নয়। দিল্লীর সুলতান এবং মোগল সম্রাটদের ইতিহাসে এর বহু নজীর পাওয়া যায়।[১৩৯]

সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে আজম শাহের চরিত্র বিচার করা যথার্থ নয়। সিংহাসনে আরোহণের পর আজম শাহ ন্যায় বিচারক এবং সুশাসকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতা এবং পিতামহের মতো আজম শাহও ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ নৃপতি, কিন্তু আজম শাহ রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেননি; বরং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ, সূফী-সাধকদের প্রতি ভক্তি, ইসলামি সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মাদ্‌রাসা স্থাপন এবং চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়ের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আজম শাহের রাজ্য বিস্তারের প্রমাণ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। বুকাননের মতে তিনি শাহাব নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেন, কিন্তু যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর ওস্তাদ শায়খ নূর কুতুবুল আলম উভয়ের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করেন, এমন সময় সুযোগ পেয়ে আজম শাহ শাহাবকে বন্দী করেন।[১৪০] এতে মনে হয় শাহাব বাংলাদেশেরই কোন সামন্ত বা সেনাপতি হবেন।

তাঁর ন্যায়বিচার এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পর্কে সুন্দর একটি বর্ণনা প্রচলিত রয়েছে।"একদিন সুলতানের একটি তীর এক বিধবার পুত্রকে আঘাত করে। বিধবা এর প্রতিকার চেয়ে কাজীর নিকট আবেদন করে। কাজী সমন জারী করে সুলতানকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন এবং তাঁর আসনের নীচে একটি বেত রেখে বিচারালয়ে বসেন। সুলতান সমন পেয়ে আদালতে হাজির হন, তিনি বগলের নীচে একখানা তরবারি লুকিয়ে রাখেন। সুলতান কাজীর সামনে উপস্থিত হলে কাজী তাঁকে কিছুমাত্র খাতির না

Dhaka University Institutional Repository

করে বলেন, আপনি এই বৃদ্ধা বিধবাকে শান্ত করুন। সুলতান বিধবাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করেন এবং কাজীকে বলেন যে তিনি যদি সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধবার প্রতি ন্যায় বিচার না করতেন তাহলে সুলতান তাঁকে ঐ তরবারির আঘাতে হত্যা করতেন। কাজীও তাঁর আসনের নিচে থেকে বেত বের করে সুলতানকে বলেন, তিনি যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখাতেন এবং কাজীর বিচার অমান্য করতেন তাহলে তিনি ঐ বেতের আঘাতে সুলতানকে জর্জরিত করতেন। সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে কাজীকে উপহার দেন ও পুরস্কৃত করেন।"[১৪১] এ ঘটনা কল্পনাকাহিনীর মত শুনায় । তবে মধ্যযুগে বাংলাদেশে এরূপ ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। আইনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য এবং ন্যায় বিচারের জন্য ভারত উপমহাদেশের আরও বেশ কয়েকজন মুসলমান শাসক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

আজম শাহের চরিত্রে আরও অনেক গুণের সমাবেশ হয়। তিনি নিজে ছিলেন বিদ্বান এবং বিদ্যানের কদর করতেন। এরপর সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আজম শাহ ১৪১০-১১ খ্রিষ্টাব্দের কোন এক সময়ে পরলোকগমন করেন। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন নি। যতদূর জানা যায় রাজা গনেশ নামক তাঁর একজন হিন্দু অমাত্য তাঁকে হত্যা করেন। এই গনেশ রাজা কান্স নামেও কোন কোন সূত্রে উল্লেখিত হয়।[১৪২] তাই খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শুরুতেই রাজা গণেশ নামীয় হিন্দু জমিদার বাংলার শক্তিশালী হয়ে উঠেন। তাঁর ষড়যন্ত্রের কারণেই ইলিয়াস শাহী বংশের পতন হয়। ৮১৭ হিজরি মোতাবেক ১৪১৪-১৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গণেশ বাংলার শেষ সুলতান আলা-উদ্-দীন ফীরূজ শাহকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন।[১৪৩] তিনি (গণেশ) যখন বাংলায় মুসলমানদেরকে নিধন করছিলেন, তখন জৌনপুরের ইব্রাহীম শর্কী বাংলায় আগমণ করে গণেশের অত্যাচার তথা নিপীড়ন বন্ধ করেছিলেন।[১৪৪] তিনিই একমাত্র হিন্দু, যিনি পাঁচশত বছর ব্যাপী বাংলার মুসলমান শাসনের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী কয়েক বছরের জন্যে হিন্দু-শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এটা তাঁর কূটনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক। "ফিরিশতার মতে গণেশ সাত বছর রাজত্ব করেন, নিয়াত-উল-আসরারেও একথা লিখিত রয়েছে।"[১৪৫]

গণেশের পুত্র যদু সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। উল্লেখ্য যে, গণেশ নিজেই তাঁকে সিংহাসনে বসান, কিন্তু পরে তাঁকে পদচ্যুত করে নিজে সিংহাসন দখল করেন। কথিত আছে যে, ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে রাজী না হওয়ায় গণেশ যদুকে বন্দী করেন। প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও যদু হিন্দু ধর্মে ফিরে যাননি।[১৪৬]

সুলতান জালাল উদ্-দীন মুহাম্মদ শাহ সুশাসক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রথমে তিনি পাণ্ডুয়া থেকে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তর করেন। এতে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়।[১৪৭] শুধু তাই নয়,

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান জালাল উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ মুদ্রায় 'খলিফত-উল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি আমীর উপাধিও গ্রহণ করেন এবং সুলতান ও খলিফত উল্লাহ-উপাধির সাথে সাথে 'ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী' হিসেবেও নিজেকে ঘোষণা করেন।[১৪৮] তিনি সুলতান গিয়াস উদ-দীন আজম শাহকে অনুসরণ করে মক্কাশরীফে মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। মাদ্‌রাসায় ব্যয় নির্বাহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং মক্কা শরীফের লোকদের জন্য উপহার সামগ্রী পাঠান।[১৪৯]

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ শুধু একজন সুশাসক ছিলেন না, তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানও ছিলেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত হয় এবং রাজনৈতিক কোন্দলের শিকার হয়ে তিনি বারবার ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।[১৫০] নিঃসন্দেহে জালাল উদ্‌-দীন মুহাম্মদ শাহ একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ এবং সুশাসক ছিলেন। জালাল উদ-দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তাঁর নিকট সম্বল হিসেবে মাত্র ৮৩৬ হিজরার (১৪৩২-৩৩ খ্রি:) মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।[১৫১] পরবর্তী সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহের মুদ্রার প্রথম তারিখ ৮৪১ হিজরি। ঐতিহাসিক ইবন হজরের সাক্ষ্য মতে আহমদ শাহ ৮৩৯ হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[১৫২]

ঐতিহাসিক নিজাম-উদ-দীন বখশী ফিরিশতা এবং গোলাম হোসেন সলীম আহমদ শাহের রাজত্বকাল অনেক দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল বললেও বুকাননের মতে তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেন।[১৫৩] ইবন হজরের সাক্ষ্য বুকাননের সাক্ষ্যের সাথে মিলে যায়। সুতরাং আমরা এখন ধরে নিতে পারি যে, শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ ৮৩৬ হিজরি থেকে ৮৩৯ হিজরি পর্যন্ত (১৪৩২-৩৩ খ্রি: থেকে ১৪৩৫-৩৬ খ্রি:) তিন বছর ব্যাপী রাজত্ব করেন।

শামস-উদ্‌দীন আহমদ শাহের রাজত্বের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য পাওয়া যায়। ফিরিশতার মতে তিনি পিতার পদাংক অনুসরণ করে ন্যায়পরায়ণ এবং উদারচিত্তে রাজ্য শাসন করেছেন; কিন্তু রিয়াজুস সালাতীনের মতে তিনি ছিলেন অত্যাচারী। তিনি ছিলেন রক্ত পিপাসু এবং গর্ভবতী মেয়েদের পেট চিরতেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এমনকি তাঁর দু'ক্রীতদাস সাদী খান এবং নাসির খান ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেন। ইবন হজরের মতে সিংহাসন লাভের সময় শামস-উদ-দীন আহমদ শাহের বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।[১৫৪] এটি যদি সত্য হয় (সত্য হওয়ার সম্ভবনাই বেশি) তা হলে তাঁর সম্বন্ধে ফিরিশতা বা রিয়াজ কারও উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ১৪ বছরের ছেলের পক্ষে ন্যায়পরায়ণ বা অত্যাচারী কোনটাই হওয়া সম্ভব নয়। শামস-উদ-দীনের পিতা জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ

Dhaka University Institutional Repository

খলীফাত-উল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন; শামস-উদ-দীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় এ উপাধি গ্রহণ করতে পারেন নি। জালাল উদ-দীনের বংশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হতে থাকে; মনে হয় শামস উদ-দীন এই ষড়যন্ত্রের কোপানলে পড়ে যান। তাই তিনি স্বল্পকাল রাজত্বের পরেই স্বীয় ক্রীতদাসের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদের সমাধিফলক সম্পর্কে আবিদ আলী খান বলেন, " There are two stone posts at the head of the tombs of Jalal-ud-din and Ahmad Shah. The Stone on that of the Latter is raised a little above the level of the tomb, which shows that the grave belongs to a martyr."[১৫৫] এতে প্রতীয়মান হয় যে, শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন এবং ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হন।

সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহের বংশধর অর্থাৎ তিনি সিংহাসনে বসে রাজা গণেশ কর্তৃক উৎখাতকৃত ইলিয়াস শাহী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই এই বংশের সুলতানদের পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ বলা হয়। ইতিহাস, মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য বিশ্লেষণে জানা যায় যে, সুলতান নাসির উদ-দীন মাহমুদ শাহ ৮৩৭ হি: (১৪৩৩-৩৪ খ্রি:) বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১৫৬] মাহমুদ শাহের মুদ্রা ও শিলালিপিই তাঁর রাজত্বকালের কেবলমাত্র প্রামাণ্য সূত্র। তাঁর এ পর্যন্ত মোট পনেরটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ শিলালিপিগুলোর মধ্যে দু'খানা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরে, দু'খানা বিহারের ভাগলপুরে, একখানা বীরভূম জেলার বারা (বা বালা) নগরে, একখানা ময়মনসিংহ জেলার ঘাগরায়, একখানা মালদহ জেলার মোগলটুলীতে, একখানা হুগলী জেলার সাতগাঁও-এ, দু'খানা ঢাকা জেলায় ঢাকা শহরে, একখানা গৌড়ের কোতওয়ালী দরজায়, একখানা পাণ্ডুয়ার ছোট দরগাহে এবং তিনখানা বর্তমান বাগেরহাট জেলায় হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দরগাহে প্রাপ্ত।

সুতরাং শিলালিপির সাক্ষ্যে জানা যায় যে, তাঁর সময়ে বাংলার মুসলিম রাজ্য পশ্চিমে বিহারের ভাগলপুর, দক্ষিণে হুগলী জেলা এবং পূর্বে ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাহমুদ শাহের কোন শিলালিপি চট্টগ্রাম হতে আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু তিনি চীন দেশে দূত পাঠান এবং তাঁর দূত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে চীন দেশে গমন করেন, অর্থাৎ চট্টগ্রামও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মাহমুদ শাহ্ তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানদের অধিকৃত রাজ্যে রাজত্ব করেন। কিন্তু বর্তমান বাগেরহাট জেলার শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত হয়, মাহমুদ শাহ বাংলার দক্ষিণবঙ্গ জয় করেননি। বরং হযরত খান জাহান আলী (রহ:) দক্ষিণবঙ্গ জয় করেন। কারণ ইতিপূর্বে বৃহত্তর খুলনা এলাকায় মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিল না। হযরত খান জাহান আলী

Dhaka University Institutional Repository

(রহঃ) সর্বপ্রথম দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে নিমগ্ন থাকায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার ঘটে। বাগেরহাটে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলো থেকে জানা যায় যে, ৮৬৩ হিজরি বা ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ শে অক্টোবর হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন থাকাকালে পরলোকগমন করেন। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) দক্ষিণবঙ্গ জয় করেন এবং এ অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর সমাধি, মসজিদ এবং দিঘি বর্তমানে বিদ্যমান। তাঁর নির্মিত ষাটগম্বুজ মসজিদ স্থাপত্যশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ভারত উপমহাদেশ তথা দক্ষিণবঙ্গের জনগণ এখনো তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ অর্থনৈতিক অবস্থা

বাংলা বিজয়ের ফলে সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়। বাঙালীদেরকে এ বিজয় শুধু একটি রাজনৈতিক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের মাঝে একক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে সহায়তা করেননি, বরং তা তাদের অর্থনৈতিক জীবনেও উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করেছে। বাংলার ভূমি পলিমাটির প্রাচুর্যে উর্বরা ছিল এবং এর অধিবাসী নারী-পুরুষ সকলেই ছিল পরিশ্রমী ।

বাংলার মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে অর্থনৈতিক অবস্থা এত দ্রুত উন্নতি সাধিত হয় যে, অতি অল্প দিনে পৃথিবীর একটি বিত্তশালী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এর কৃষি ও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। মুসলিম শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জীবনে নিশ্চিতরূপে যথার্থ অগ্রগতি লাভ করে । পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বাংলায় স্বর্ণমুদ্রা, এমনকি রৌপ্যমুদ্রাও বিরল ছিল । মুসলমান শাসনের শুরু থেকে এ প্রদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। এটা মুসলমান আমলে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির সাক্ষ্য দেয়।[১৫৭] পাল ও সেনযুগে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব রকম আদান-প্রদানে কড়ি একমাত্র বিনিময় মাধ্যম ছিল। এতে অনুমিত হয় যে, বাংলার অর্থনৈতিক জীবন হিন্দুযুগে অনগ্রসর ছিল। প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থের অভাব ছিল মুদ্রা তৈরির জন্য। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু আমলে বাংলার শিল্পক্ষেত্র ও ব্যবসায়ে বড় রকমের লেন-দেনের অভাব ছিল।

মিনহাজের মতে, যখন মুসলমান বিজেতেরা বাংলায় প্রবেশ করে তখন তাঁরা কোনো রকম স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য মুদ্রা দেখতে পাননি। ক্রয় বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহৃত হতো। এমনকি রাজা পর্যন্ত কড়ির সাহায্যে দান করতেন ও উপহার প্রদান করতেন।[১৫৮]

যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অথবা এমনকি তাম্রমুদ্রারও প্রচলন থাকতো, রাজা তাহলে এ ধরনের বিরাট সংখ্যক কড়ির পরিবর্তে যে কোনো মুদ্রায় উপহার প্রদান করতেন। অপরপক্ষে, মুসলিম আমলে এত প্রচুর সংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল যে, প্রজারা এসব মুদ্রায় খাজনা দিত।[১৫৯] আবুল ফজল লিখেন, "তারা প্রতি বছরের খাজনা আট মাসের কিস্তিতে পরিশোধ করে। খাজনার রশিদ পাওয়ার নিমিত্ত তারা নিজেরাই নির্ধারিত স্থানে এটা পরিশোধ করে ।

চারটি জিনিসের মাধ্যমে একটি দেশের সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় । যথা :-

প্রথমত - কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যতা,

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত - প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্য

তৃতীয়ত - ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য এবং

চতুর্থত - দেশে স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থের প্রাচুর্য।

সমসাময়িক ফার্সি ঐতিহাসিক ও বিদেশী পরিব্রাজকদের বর্ণনায় প্রকাশ পায় যে, বাংলাদেশ মুসলিম শাসনাধীনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সমৃদ্ধির অধিকারী ছিল এ চারটি প্রয়োজনীয় উপাদানের।

ক. কৃষির অগ্রগতি

চাউল ঃ চাউল ছিল প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য । সরু মোটা নানা ধরণের চাল এ প্রদেশে উৎপন্ন হতো। এসব নানা রকমের চালের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে আবুল ফজল বলেন, "যদি প্রত্যেক প্রকারের একটি করে শস্য-কণা সংগ্রহ করা হতো, তাতে একটি বড় কলস ভরে উঠতো।"[১৬০]

এ শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাত যে চাউল ছিল রপ্তানি বাণিজ্যের একটি প্রধান দ্রব্য। ইক্ষু অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হতো। জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার পরেও তা রপ্তানি করে বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা হতো। তুলা বহুল পরিমাণে বাংলাদেশে উৎপন্ন হতো। সম্প্রসারণশীল সুতীবস্ত্র কারখানা ও প্রচুর পরিমাণে সুতীবস্ত্র রপ্তানি বাণিজ্য থেকে এটা বোঝা যায়। সরিষা, মরিচ ইত্যাদি ছিল প্রদেশের অন্যান্য প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য । এটা মুসলিম আমলে অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল।

পাট ঃ চতুর্দশ শতক থেকে বাংলাদেশে পাট উৎপাদনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'প্রাকৃত পিঙ্গল' নামে পরিচিত একটি গ্রন্থে 'নালিতার' (পাট) উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, পাট পাতা ছিল বাঙালীদের শাক সবজি জাতীয় খাদ্য। এতে লেখা আছে যে, স্বামীকে ভাগ্যবান মনে করা হতো। যদি তাঁর স্ত্রী তাকে গরম ভাত, খাঁটি ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং পাটের শাকের তরকারি দিয়ে আপ্যায়ন করতো।[১৬১]

মুসলমান আমলের বাংলা সাহিত্যে পাট ও পাটজাত বস্ত্রের প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকের পণ্ডিত জ্যোতিরিশ্বরের লিখিত 'বর্ণ রত্নাকর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মেয়েরা নানারকম পাটের শাড়ী (পট্টবস্ত্র) পরিধান করতো।[১৬২]

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের অন্যান্য বহু বাংলা গ্রন্থ থেকে অবহিত হওয়া যায় যে, সমাজের সাধারণ স্ত্রীলোকেরা পাটের শাড়ি ব্যবহার করতো। বাঙালী কবিদের বর্ণনায় সমর্থন পাওয়া যায় আবুল ফজলের লেখা থেকে। তিনি বলেন, "বাংলায় ঘোড়াঘাট 'সরকারে' রেশম ও এক প্রকার চটের কাপড় তৈরি হয়।"[১৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সমসাময়িকদের তথ্যাদি থেকে বাংলায় পাট উৎপাদন এবং পাট থেকে বস্ত্র ও সাধারণ পরিচ্ছদ[১৬৪] ইত্যাদি তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতক পর্যন্ত পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিযোগ্য পণ্য হয়ে উঠেনি। তা বার্নিয়ার প্রথম সপ্তদশ শতকে বাংলার পাটের প্রতি ইউরোপীয় বণিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেইযুগে পাট থেকে পণ্যদ্রব্য বাঁধার জন্যে মোটা পাটের থলে প্রস্তুত হতো।[১৬৫]

সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত যদিও পাট ইউরোপীয়দের দৃষ্টি সীমায় আসেনি; তবুও কমপক্ষে চতুর্দশ শতক থেকে বাংলায় পাট শস্য ও পাটজাত দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ আছে। বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলার পাট বস্ত্র প্রতিবেশী দেশসমূহে রপ্তানি করা হতো। 'মনসামঙ্গল' কাব্যগুলো থেকে জানা যায় যে, বণিকচাঁদ সওদাগর পট্টশাড়ি ও পট্টধুতিসহ বহু পণ্য দ্রব্য নিয়ে ভিন্ন দেশে যান এবং খুব চাতুর্যের সঙ্গে সে দেশের রাজার নিকট এসব পট্টবস্ত্রের মানের প্রশংসা করেন। এতে রাজা নিজের জন্যে এবং রাণীর জন্যে কয়েকখানি পট্টবস্ত্র ক্রয় করতে প্রলুব্ধ হন।[১৬৬]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চদশ শতকে পাট উৎপাদন এবং পাটজাত দ্রব্য বিদ্যমান ছিল এবং প্রতিবেশী দেশ সমূহে পাটজাত দ্রব্যাদি কিছু পরিমাণে রপ্তানিও করা হতো।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমদিকের দলিলপত্রে হাতে বোনা পাটবস্ত্র ও পাট ব্যবসার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখের একটি পত্রে বোম্বাই কাউন্সিল পাটজাত চটের থলের একটি ফরমায়েশ (মালের জন্য আদেশনামা) সংযুক্ত করে। এই ধরনের পাটের থলের ফরমায়েশ মাদ্রাজ কাউন্সিলের ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে জুলাই-এর একটি দলিলে পাওয়া যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে ২,০০০ চটের থলে এবং ১,২০০ শত সরু চাউলের বস্তা পাঠানোর উল্লেখ আর একটি দলিলে পাওয়া যায়।[১৬৭]

গুটি পোকার চাষ ঃ তুঁতগাছ ও গুটি পোকার চাষ ছিল বাংলাদেশে। পঞ্চদশ শতকে এই প্রদেশে ভ্রমণকারী চৈনিক দূতদের বর্ণনায় এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৬৮]

এটা বর্ণনা করতে হয় যে, গুটি পোকার চাষ হিন্দু আমলে ভারতবর্ষে অবিদিত ছিল। মুসলিম আমলে প্রথম সম্ভবত চীনদেশ থেকে বাংলাদেশে এটা আমদানি করা হয়।[১৬৯] আবুল ফজল ঘোড়াঘাটে রেশম উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেন।[১৭০] বাংলার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যব, ভুট্টা, সরিষা, তিল, তিসি এবং কলাই ইত্যাদি ডালের উল্লেখ করা যায়। শাক-সবজি যেমন - পিঁয়াজ, রসুন ও শস্য ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণ জন্মাত।[১৭১]

Dhaka University Institutional Repository

পান, সুপারি এবং নারিকেলের এত বেশি প্রাচুর্য ছিল যে, এগুলো অন্যান্য দেশেও রপ্তানি করা হত।[১৭২] বাংলার সুপরিচিত ফলের মধ্যে কয়েকটি যেমন ঃ- আম, কাঁঠাল, কলা, ডালিম, কমলালেবু, খেজুর ইত্যাদি। আবুল ফজল লিখেছেন যে, এই প্রদেশে নানাবিধ ফুল ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। শ্রীহট্ট সরকারে প্রচুর পরিমাণে ঘৃতকুমারী কাঠ জন্মাত।[১৭৩]

চৈনিক দূতগণ বাংলার গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ, ঘোড়া, উট, খচ্চরের বর্ণনা করেছেন। গরু ও ছাগলের সংখ্যা ছিল অসংখ্য এবং সস্তা ছিল দামে। এ প্রদেশে খুব পরিমাণে ছিল পাতিহাঁস ও রাজহাঁস ইত্যাদি ।

ইবনে বতুতা ও বারবোসা উল্লেখ করেছেন যে, মেষ বাংলার গৃহপালিত পশু। নদ-নদী অধিষ্ঠিত বাংলায় গৃহপালিত পশু হিসেবে উটের বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ষোড়শ শতকের ফার্সি ইতিহাস থেকেও অবহিত হওয়া যায় যে, হুমায়ূনের বাংলা আক্রমণের সময়ে শেরখান (শাহ) গৌড়ের ধন সম্পদ রোহতাসগড়ে সরাবার কাজে অনেক উট ব্যবহার করেছিলেন।

কয়েকটি খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনেও বাংলাদেশ সমৃদ্ধ ছিল। আবুল ফজলের মতে 'বাজুহা' সরকারে (রাজশাহীর অংশবিশেষ বগুড়া, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা ইত্যাদি) লৌহ খনি ছিল । মান্দারণ সরকারের (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ-পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম হুগলী) হরপাহ নামক স্থানে মুক্তার একটি খনি ছিল। এখানে প্রধানত খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর উৎপাদিত হতো।[১৭৪] বাংলাদেশ পৃথিবীর সেকালের মানের বিচারে সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোর অন্যতম ছিল মুসলিম শাসনকাল। রেশমী ও সুতী শিল্পের ঐশ্বর্যে এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এবং এর যথেষ্ট সুনাম ছিল সেকালের সকল সভ্য দেশে। বিভিন্ন রকমের সুতীবস্ত্র তৈরি হতো। এগুলো আকারে, রঙে এবং গুণাগুণের দিক থেকে ছিল নানা ধরণের ।

সবচেয়ে উন্নত মানের বস্ত্র 'মসলিন' সারা বিশ্বে সুখ্যাতি ছিল। এমনকি এর সমাদর করতেন বিদেশী রাজা ও অভিজাত ব্যক্তিগণ। বাংলাদেশে সুতী বস্ত্রের প্রাচুর্যের কথা 'ইবনে বতুতা' বর্ণনা করেছেন।

মাটির উর্বরতা ঃ অগণিত নদ-নদীর কল্যাণে দীর্ঘ শতাব্দীব্যাপী বাংলার সমতল ভূমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উর্বর এলাকা ছিল আর ঋতুমাফিক বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক সেচ ব্যবস্থার প্রচলনও শস্যের উৎপাদন বাড়িয়েছিল।

ভ্রমণকারীগণ অবলোকন করেছেন যে, বাংলাদেশে অসাধারণ মাটির উর্বরতা। ইবনে বতুতা শ্রীহট্ট থেকে নৌকাযোগে ভ্রমণকালে মেঘনার উভয় পার্শ্বে মাঠের পর মাঠে শস্য ও ফল ফুলের গাছ দেখে এত বেশি অভিভূত হন যে, তিনি লিখেছেন, " নদীপথে মিসরের নীল নদের মতো ডানে ও বামে ছিল অসংখ্য চাকা,

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যানরাজি এবং গ্রামের পর গ্রাম। . . . আমরা গ্রাম ও উদ্যানরাজির মধ্য দিয়ে পনের দিন নৌকা পথে চলেছে, আমাদের মনে হয়েছে যেন আমরা একটি বাজারের মধ্য দিয়ে চলেছি ।''[১৭৫]

পঞ্চদশ শতকের শুরুতে চৈনিক দূতগণ বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। মূর দেশীয় পরিব্রাজকের সাক্ষ্যের সমর্থন তাদের বর্ণনা থেকে লাভ করা যায়। একজন চৈনিক দূত মন্তব্য করেন, '' সপ্তস্বর্গ পৃথিবীর স্বর্ণভাণ্ডার যেন এ রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। এখানকার লোকের সম্পদ এবং চরিত্রের সততাবোধ হয় পালেমবাগ অতিক্রম করে যায় এবং তা একমাত্র 'জাভা'র সমান।[১৭৬] একারণে বাংলা সম্বন্ধে একজন চৈনিক দূত উল্লেখ করেছেন, এর ভূমি খুবই উর্বর এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রচুর। কেননা, প্রত্যেক বছর তারা দু'টো ফসল পায়। তারা তাদের জমির আগাছা পরিষ্কার করে না। তারা নারী-পুরুষ সকলে মাঠে কাজ করে এবং ঋতু অনুসারে তাঁতে বস্ত্র বয়ন করে থাকে[১৭৭] (ফসলাদির সময় ছাড়া অন্য সময়ে)।

চৈনিক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলার নারী পুরুষের শ্রমশীলতা ও ভূমির উর্বরতা মুসলিম যুগে। বাংলার প্রাচুর্যের প্রমাণ মিলে বাবরের বর্ণনা থেকে। রিজিকুল্লাহ বলেন যে, বাংলায় যখন হুমায়ুন প্রবেশ করেন, তখন তিনি এ প্রদেশের প্রতি আনাচে-কানাচে উদ্যানরাজি ও স্বর্গ দেখতে পান।

আবুল ফজলের মতে, বাংলার মাটি এত বেশি উর্বর ছিল যে, একই মাটিতে বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হতো এবং ধানের ডগাগুলো এক রাত্রেই এক হাত বেড়ে যেত।[১৭৮] সপ্তদশ শতকের তৃতীয় দশকে সম্রাট আলমগীরের শাসনামলে এ প্রদেশ ভ্রমণ করে ফরাসি পরিব্রাজক বার্নিয়ার লিখেছেন যে, '' সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী তিনি নদ-নদী এবং খাল, নালা ইত্যাদি দেখেছেন এবং এদের উভয় তীর সারিবদ্ধ এবং জনাকীর্ণ শহর ও গ্রাম দ্বারা শোভিত ছিল এবং মাঠ শস্য সম্ভার ও নানাবিধ ফলের বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল।''[১৭৯]

খ. শিল্প-কারখানা

সুতীবস্ত্র ঃ বাংলার সুতীবস্ত্র বয়নের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন চৈনিক দূতগণ এবং উৎপাদিত নানা রকমের সুতীবস্ত্রের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন এ প্রদেশে । তারা ছ'প্রকার সুতীবস্ত্রের বর্ণনা করেছেন।

(১) 'পি-পো' নামে বিভিন্ন রঙের এক প্রকার কাপড় ছিল। এটা প্রস্থে ছিল দু'থেকে তিন ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ছিল ছাপ্পান্ন ইঞ্চি। এই বস্ত্র খুবই সূক্ষ্ম ও মিহিন ছিল।

(২) চার ফুট বা তারও অধিক চওড়া এবং পঞ্চাশ ফুট লম্বা 'মান-চে-ভি-' ছিল আদার রঙের মতো হলদে বস্ত্র। এ কাপড় ঠাসা বুনান ও মজবুত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) 'শাহ-না-কিয়ে' (শাহ-না-পা-ফু) নামক বস্ত্র ছিল পাঁচ ফুট প্রশস্ত ও বিশ ফুট লম্বা এবং চীনা কাপড় 'লু-পু' (শেঙ্গ-লো) কাপড়ের অনুরূপ ছিল।

(৪) তিন ফুট প্রশস্ত ও ষাট ফুট লম্বা এক প্রকার বস্ত্রের বিদেশী নাম ছিল 'হিন-পেই টাঙ্গ-টা-লি' (ফি-পাই-লাই-টা লি) । এটা ছিল মোটা ধরনের কাপড়।

(৫) 'শা-তা-ইউল' ছিল দু' রকমের একটির মাপ ছিল প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট এবং অন্যটি ছিল আড়াই ফুট প্রস্থ ও চার ফুট লম্বা। এটা একান্তে চীন 'সান-সো,' বস্ত্রের অনুরূপ ছিল।

(৬) 'মা-হেই-মা-লি' (Malmal) বস্ত্র তৈরি হতো বিশ বা ততোধিক ফুট দৈর্ঘ্যে এবং চার ফুট প্রস্থে। এর একদিকে আধ ইঞ্চি লম্বা আবরণ ছিল। এটা দেখতে চীনা 'তুলো-ফিয়া' বস্ত্রের মতো ছিল।[১৮০]

বারবোসা বাংলার বয়ন শিল্প সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "এদেশে প্রচুর সুতা আছে। সূক্ষ্ম ও মিহিন অনেক প্রকারের বস্ত্র তারা তৈরি করে; তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্যে এ বস্ত্র রঙ্গীন করে এবং সাদা রাখে ব্যবসায়ের জন্য। এগুলো খুবই মূল্যবান কাপড়। তারা কিছু বস্ত্রকে 'ইসত্রাভানতিস' (Estraventes) বলে; এটা এক বিশেষ ধরনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাপড় যা' আমাদের মধ্যে মহিলারা শিরোভূষণের জন্যে এবং মূর, আরব ও ইরানিরা পাগড়ীর জন্যে খুবই পছন্দ করেন। এত বেশি পরিমাণে এ সকল কাপড় উৎপন্ন করা হয় যে, এগুলোর পণ্য অনেকগুলো জাহাজ বিদেশে যায়। অন্যান্য যে সকল কাপড় তারা তৈরি করে সেগুলো 'মামুনা 'দুগুয়াজা' 'চৌতারী' এবং 'সিনাবাফা' নামে সুপরিচিত ছিল।

সিনাবাফা সর্বোৎকৃষ্ট কাপড় বলে মনে করা হয় এবং মূরেরা শার্ট তৈরি করার জন্যে এটাকে খুব পছন্দ করতো। এসব কাপড় খণ্ড খণ্ড এবং এর প্রতি খণ্ড কাপড় পর্তুগীজদের ব্যবহৃত গজে প্রায় তিন ও বিশ অথবা চার ও বিশ গজ ছিল। বাংলায় এই কাপড়গুলো খুবই সস্তা দামে বিক্রি হয়। এগুলোর সুতা চরকায় কাটা হয় এবং পুরুষেরা বয়ন করে।[১৮১] উত্তম শ্রেণীর বিভিন্ন রকম বস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে বারথেমা, ' বৈরাম', 'নামোনী', 'লিজাতি', 'কায়েনতার', 'দস্তজার' এবং 'সিনবাফের' উল্লেখ করেছেন। বাংলার মতো এতবেশি সুতীবস্ত্রের প্রাচুর্য তিনি পৃথিবীর অন্য কোথা দেখেননি বলে মন্তব্য করেন।[১৮২]

বাংলাদেশে সবচেয়ে উন্নত মানের সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র 'মসলিন' তৈরি হতো। আমির খসরু বাংলার এ বস্ত্র তৈরির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, " এ বস্ত্র এতবেশি সূক্ষ্ম ও মিহিন ছিল যে, এর একশত গজ কাপড় মাথায় জড়ানোর পরেও তার ভেতর দিয়ে মাথার চুল দেখা যেতো।"

তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, এ কাপড়ের পুরো একখণ্ড একজন তার নখের মধ্যে ধারন করতে পারতো; অথচ যখন এর ভাঁজগুলো খোলা হতো তখন তা দ্বারা পৃথিবী আবৃত করা যেতো।[১৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য (পৃঃ ৩৫৬) থেকে জানা যায় যে, শিকারী কালকেতু কর্তৃক নির্মিত গুজরাট শহরের একটি ক্ষুদ্র এলাকায় শত শত জোড়া ধুতি কাপড় বুনান হতো। আবুল ফজলের বর্ণনায় আমির খসরুর উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় । তিনি লিখেছেন, "সোনারগাঁও সরকারে এক প্রকার মিহিন মসলিন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এগারসিন্ধু শহরে একটি বড় পুকুর আছে। এই পুকুরে ধোয়া কাপড় খুব চমৎকার সাদা হয়" তিনি আরও বলেন যে, বারবাকাবাদ সরকারে (রাজশাহী, দক্ষিণ বগুড়ার ও দক্ষিণ-পূর্ব মালদহ) গঙ্গাজল নামে এক রকম খুব মিহিন কাপড় তৈরি হয়।[১৮৪]

বণিক সুলায়মানের বর্ণনায় হিন্দু আমলে মসলিনের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি লিখেছেন যে, এই বস্ত্র এতবেশি সূক্ষ্ম ছিল যে, এক খণ্ড লম্বা মসলিন একটি আংটির ভেতরে প্রবেশ করান যেতো। সবচেয়ে উন্নত মানের মসলিন খুবই দামী ছিল। মীর্জা নাথন বলেন যে, তিনি মালদহে চার হাজার টাকা মূল্যে একখণ্ড 'মসলিন' বস্ত্র ক্রয় করেন।[১৮৫]

এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে এ সময়ে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা সুতা উৎপন্ন হতো এবং এই সুতা থেকেই মসলিন কাপড় তৈরি হতো। বারবোসা তার ভ্রমণকালে বহু কার্পাসক্ষেত্র দেখতে পান। সাধারণ ধরনের বিভিন্ন সুতীবস্ত্র উৎপাদনের জন্য বোম্বাই ও সুরাট হতে কাঁচা তুলা বাংলাদেশে আমদানি করা হতো।[১৮৬]

'মসলিন' ও রেশমশিল্প মুসলিম শাসক, অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করে। রেশমী কাপড় সাধারণত উত্তর বাংলায় এবং পশ্চিম বাংলার কিছু অংশে তৈরি হতো। রেশমী পোশাক উচ্চ শ্রেণীর মেয়ে পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র ছিল।[১৮৭]

জাহাজ নির্মাণ ঃ- বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ছিল গৌরবজ্জ্বল ঐতিহ্য। বাঙালী কারিগরেরা অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য যাতায়াত, নদীবহুল দেশে নৌযুদ্ধ ইত্যাদির জন্য হিন্দুযুগ থেকে ছোট বড় নানা আকারের নৌকা নির্মাণ করতো। নৌযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মুসলিম আমলে এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ও সমুদ্র যাত্রার অভূতপূর্ব উদ্দীপনার ফলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে খুব বেশি সম্প্রসারিত হয়।

সমসাময়িক বর্ণনা থেকে অবহিত হওয়া যায় যে, মুসলিম শাসন প্রাক্কালে বাঙালী বণিকরা বিভিন্ন রকমের বৃহৎ ও দ্রুতগামী নৌকা নির্মাণ করতো। 'মাসালিক আল-আবসার' গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক আবদুর রশীদ' বর্ণনা করেছেন যে, বাংলার অনেক জাহাজ কারখানা, তম্পুর ও বাজারের ব্যবস্থা ছিল। তিনি বলেন যে, জাহাজ এত বৃহৎ ছিল যে, একই জাহাজের যাত্রীরা বেশ কিছুকাল পরে একে অন্যকে জানতে পারতো ।

Dhaka University Institutional Repository

নৌকার গতিশীলতা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যদি একটি তীর দু'শত চলন্ত নৌকার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী নৌকাটি লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত করা হতো তাহলে তাদের দ্রুতগতির দরুণ তীরটি ঐ নৌকায় না পড়ে এদের মাঝের নৌকাগুলোর একটির উপর গিয়ে পড়তো।[১৮৮]

'মাসালিক আল -আবসারের' উক্তির সমর্থন ইতালীয় বণিক বারথেমার বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "বাঙ্গালার লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের প্রকাণ্ড জাহাজ ব্যবহার করে; এসব জাহাজের মধ্যে কতকগুলো চেপ্টা তলবিশিষ্ট করে নির্মাণ করা হয়; কেননা এরূপ জাহাজ খুব অগভীর পানিতে চলাচল করতে পারে। সামনে ও পেছনে প্রসারিত অগ্রভাগ (গলুই) বিশিষ্ট এক ধরনের নৌকা বাংলায় প্রস্তুত করা হয়। এগুলোর দু'টোর হাল ও দু'টো মাস্তুল আছে এবং অনাবৃত থাকে। আর এক ধরনের বৃহৎ জাহাজও আছে, এটা 'গিউঞ্চী' নামে পরিচিত। এই গিউঞ্চীর প্রত্যেকটি এক হাজার বড় পিপার (টন হিসেবে) মাল বহন করে; এর উপর তারা কয়েকটি ছোটো নৌকা 'মেলাচা' নামক শহরে নিয়ে যায়।[১৮৯]

পর্তুগীজ বণিক বারবোসার বর্ণনা থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে জাহাজ নির্মাণশিল্প ছিল। 'বাঙ্গালা' শহরের আরব, ইরানি, হাবশি এবং ভারতীয় বণিকদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা সকলে বিরাট বণিক এবং একই ধরনের তৈরি বড় বড় জাহাজের মালিক; এই জাহাজগুলোকে তারা ' জুঙ্গোম' (জাংক) নামে অভিহিত করে। এগুলো খুবই বৃহৎ এবং বিস্তর পণ্যদ্রব্য বহন করে ।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান শাসন আমলে এই প্রদেশের বণিকদের জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যকলাপ প্রতিফলিত হয়েছে। জাহাজের অগ্রভাগ মকর[১৯০] (কুমীর) অথবা সিংহের মাথার মতো এরূপ ৩০০ ফুট দীর্ঘ ও ৬০ ফুট প্রস্থের জাহাজে গৌড়ের ধনপতি সওদাগর ও তার পুত্র শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার কাহিনী কবি মুকুন্দরাম লিপিবদ্ধ করেছেন ।[১৯১]

বাংলাদেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সমৃদ্ধি সম্পর্কে জগজ্জীবনের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। এতে উল্লেখ আছে, "বণিক চাঁদ সওদাগর কুসাই নামক সুদক্ষ মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠান এবং তাকে অবিলম্বে চৌদ্দ খানা জাহাজ নির্মাণ করতে আদেশ দেন। কুসাই তখনই তার বহু কারিগরকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করেন এবং নৌকার বিভিন্ন অংশ নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্যে সকল প্রকার বৃক্ষ কর্তন করেন। করাতীরা অল্প সময়ের মধ্যে তিন হাজার প্রশস্ত তক্তা প্রস্তুত করে। পরে এই তক্তাগুলোকে লোহার পেরেকের সাহায্যে যুক্ত করা হয় ।[১৯২]

এটা উল্লেখযোগ্য যে, জাহাজের কয়েকটি খুব পুরাতন মাস্তুল পাণ্ডুয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে মাটির নিচে পাওয়া গিয়েছে। এ স্থানের মধ্য দিয়ে একদা মহানন্দা নদী প্রবাহিত হতো।[১৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

চিনি ঃ- ইক্ষুর উৎপাদন বাংলাদেশে ছিল খুব ব্যাপক। বারবোসা বলেন যে, এ প্রদেশে ব্যাপক ইক্ষুর চাষ তিনি দেখেছেন। চিনি উৎপাদন মুসলমান আমলে একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হয়। বাংলার এ শিল্প সম্পর্কে বারবোসা বলেন, " অত্যন্ত ভাল মানের সাদা চিনি এই শহরে (বাঙ্গালা) তৈরি হয়। কিন্তু চিনি সংযোগ করে কিভাবে পাউরুটি তৈরি করতে হয় তা' তারা জানে না, সেজন্য তারা গুড়া অবস্থায় এটা কাঁচা চামড়ায় দিয়ে আবৃত করে উত্তমরূপে সেলাই করে। এই পণ্যদ্রব্যে তারা বহু জাহাজ বোঝাই করে এবং সর্বত্র বিক্রির জন্যে রপ্তানি করে।[১৯৪]

বারথেমাও এই প্রদেশে চিনি উৎপাদনের প্রাচুর্যের উল্লেখ করেছেন।[১৯৫] প্রকৃতপক্ষে, মুসলমান আমলে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের দেশসমূহ এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে বাংলার ব্যাপক রপ্তানি বাণিজ্য ছিল। এমনকি ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রদেশ শতকরা ৫০ ভাগ লাভে ৫০,০০০ মন চিনি রপ্তানি করেছিল। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর ওলন্দাজগণ কর্তৃক পশ্চিম ভারতে জাভায় প্রস্তুত চিনি আমদানি করা হয়। ফলে বাংলার চিনি শিল্প ও ব্যবসার অবনতি হয়।[১৯৬] নানা রকমের চিনি, অশোধিত (গুড়) এবং সাদা 'কাঁথ' ছাড়াও বাঙালী প্রস্তুতকারকরা চিনি কণিকা তৈরি করে এবং বিভিন্ন ধরনের মিছরি ও সংরক্ষিত ফল প্রস্তুত করে। মিষ্টান্ন ও সুস্বাদু খাদ্যের বহু বর্ণনা পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে।

এ থেকে অনুমিত হয় যে, বাঙালীরা খেত চিনি এবং বাংলাদেশে তা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। চৈনিক দূতগণ এই প্রদেশে আরও কয়েকটি শিল্পের উল্লেখ করেন। এগুলো ছিল - কার্পেট, কাগজ, ইস্পাত, বন্দুক, অলঙ্কারাদি ইত্যাদি। মহুয়ান বলেন যে, বাঙালীরা বৃক্ষের ছাল থেকে সাদা কাগজ প্রস্তুত করে, এগুলো হরিণের চামড়ার মতো মসৃন ও উজ্জ্বল।[১৯৭] চৈনিকগণ কর্তৃক চতুর্দশ শতকের বাংলায় বন্দুক নির্মাণের উল্লেখ কৌতূহলোদ্দীপক । সাদা কাগজ প্রস্তুত প্রণালী খুব সম্ভব চীন থেকে এদেশে আসে ।[১৯৮]

লোহার জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও কৃষি যন্ত্রপাতি বাংলার ধাতব শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রস্তুত তরবারির বিস্তর খ্যাতি ছিল পূর্ববঙ্গে । চীনাদের মতানুযায়ী তখন বাংলাদেশে স্বর্ণকারদের নিপুনতার সুখ্যাতি ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

গ. আর্থিক সমৃদ্ধি

মুসলমান শাসনামলে কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং বহু পণ্যদ্রব্যের ব্যাপক রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশ খুবই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জিনিসপত্রের প্রাচুর্য ও সুলভতার জন্য সাধারণ শ্রেণীর শ্রমিকরাও ভাল খেতে ও সচ্ছল জীবন যাপন করতে পারতো। যদিও তারা এদেশের লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল, তথাপি ইউরোপীয়দের বর্ণনা থেকেও এ সত্যের প্রমাণ মেলে।

বার্নিয়ার বলেন, " ভাত বা ঘিয়ের সঙ্গে তিন চার রকমের তরি-তরকারি সাধারণত লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল। এসব অতি সামান্য দামে কেনা যেতো। রাজহাঁস ও পাতিহাঁসও এরূপ সস্তা ছিল। প্রত্যেক প্রকারের মৎস্য, তাজা বা লবণযুক্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেতো।[১৯৯] চাকরানী দুর্বলা দাসীর নানা প্রকার মাছ, তরি-তরকারি খাসির মাংস ইত্যাদি বাজার করার কথা উল্লেখিত হয়েছে।[২০০]

বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' একজন তাঁতীর বাজার করার উল্লেখ আছে। সে নানা রকম মাছ, তরি-তরকারি[২০১] ইত্যাদি এতো দ্রব্য কিনে আনে যা বর্তমানের একজন মধ্যবিত্ত লোকের মনেও ঈর্ষার ভাব জাগাবে। বাংলাদেশে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাত্রার জন্যই পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, "বাংলা রাজ্যে প্রবেশের শত দরজা খোলা আছে; কিন্তু ফেরবার একটি দরজাও নেই।"[২০২]

বাংলার বিরাট সমৃদ্ধির পরিচায়ক হলো দরবারের ঐশ্বর্য, অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর লোকদের বিলাসিতা। ফিরিস্তা বর্ণনা করেছেন যে, বাংলার লোকেরা সোনা ও রূপার পাত্রাদি ব্যবহার করতো। বণিক ও কৃষকদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের কথা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ আছে। স্বর্ণ পাত্রাদির প্রচলন ছিল বণিকদের মাঝে। বাবর বর্ণনা করেছেন যে, বাংলায় বিরাট সম্পদের ভাণ্ডার ছিল । বাংলার সমৃদ্ধি দর্শনে হুমায়ন মুগ্ধ হন এবং তিনি একে 'জান্নাতাবাদ' নামে অভিহিত করেন।

মুসলমান শাসনকালে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাংক ব্যবহার উন্নয়ন। উপমহাদেশের বিভিন্নস্থানে ব্যাংকারদের প্রতিনিধি (Agent) ছিল। মহাজনরা (ব্যাংকাররা) 'হুণ্ডি' কিংবা টাকা দেবার আঙ্গাপত্র (Bank draft) ও বিনিময় পত্র (Bill of exchange) ব্যবহার করতো। এর ফলে হুণ্ডি গ্রহীতার পক্ষে ভিন্ন একটি প্রদেশেও টাকা পাওয়া সম্ভব হতো এবং দূরবর্তী স্থানের বণিকদের মধ্যে টাকা প্রেরণের সুযোগ-সুবিধা ছিল। এ ধরনের কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যাংকাররা বাট্টা গ্রহণ করতো। বস্তুত তদানীন্তনকালীন বাংলার সমৃদ্ধিশালী ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রমাণ মিলে হুণ্ডি ব্যবসায়ের উন্নতি থেকে ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. বাণিজ্য

শিল্পজাত ও কৃষিজ দ্রব্যের প্রচুর উন্নতি এবং বাংলার বাণিজ্য বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হয় সমুদ্রযাত্রায় মুসলমানদের নতুন উদ্দীপনার দরুণ। এ থেকে মুসলমান আমলে বাঙালীদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বাঙ্গালা' শহরের মুসলমানদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'বারবোসা' লিখেছেন, "তারা সকলেই বড় বড় বণিক এবং 'মোকাহ' বন্দরের বণিকদের মতো একই ধরনে তাদের বাণিজ্য-তরীগুলো নির্মিত।"[২০৩] মুসলমান সম্বন্ধে মহুয়ান বলেন যে, তাদের মধ্যে ধনী লোকেরা বৃহৎ জাহাজ তৈরি করতো। এতে করে বিদেশের সঙ্গে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। সেকালের হিন্দু বণিকদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের আভাস পাওয়া যায় মনসা মঙ্গল কাব্য এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলো থেকে। বাংলায় ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ফলে বহু সমুদ্রবন্দর ও নদী বন্দরের উন্নতি হয়। চট্টগ্রাম ছিল মুসলিম শাসনের প্রারম্ভ থেকে একটি বিশিষ্ট বন্দর এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র। একজন চীনা দূত লিখেছেন, " সা-টি-কিং (চাটিগাঁও বা চট্টগ্রাম) সাগরের মুখে অবস্থিত। বিদেশী বণিকগণ এখানে আগমন করে এবং জাহাজ নোঙ্গর করে। তারা এখানে সমবেত হয় এবং তাদের পণ্যদ্রব্যের মুনাফা বন্টন করে।"[২০৪]

এ বন্দরটিকে পর্তুগীজরা 'পোর্টোগ্রাণ্ডি' (বড় বন্দর) বলে আখ্যায়িত করে এবং তাদের বিবরণ থেকে প্রকাশ পায় যে, এটা ছিল মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যের কর্মচঞ্চল কেন্দ্র। এর প্রতি পর্তুগীজ বণিকদের লোভ ছিল। র‍্যালফ ফিচ চট্টগ্রামের বিরাট বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, এই বন্দরের অধিকার নিয়ে বাংলা, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজ্যগুলোর মধ্যে সব সময় সংঘর্ষ লেগে থাকে।[২০৫] আবুল ফজলও চট্টগ্রামকে একটি সমৃদ্ধ সমুদ্র বন্দর এবং খ্রিষ্টান ও অন্যান্য বণিকদের আশ্রয়স্থল বলে উল্লেখ করেছেন।[২০৬]

কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের অত্যধিক প্রাচুর্যের ফলে বাংলাদেশের বিরাট রপ্তানি বাণিজ্য ছিল। সুতীবস্ত্র, চাউল, চিনি, রেশমী বস্ত্রাদি, আদা, মরিচ, লাক্ষা, হরিতকী ইত্যাদি রপ্তানির প্রধান দ্রব্য ছিল।[২০৭] এ সবের মধ্যে সুতীবস্ত্র অধিক পরিমাণে রপ্তানি করা হতো। বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে চাউল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। অধুনা বাংলা একটি ঘাটতি প্রদেশ কিন্তু মুসলমান শাসনামলে প্রচুর পরিমাণ চাউল বিদেশে বিক্রি করা হতো।

বাংলাদেশ এখন চিনি আমদানি করে অথচ সেকালে রপ্তানি হতো বাংলার উৎপন্ন চিনি বহু দেশে। ফলে এদেশ এর বিনিময় অর্জন করতো প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থ। র‍্যালফ ফিচ সোনারগাঁও

Dhaka University Institutional Repository

বন্দরের রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখ করে বলেন, " বিপুল পরিমাণ সুতীবস্ত্র এখান থেকে বিদেশে যায় এবং এখান থেকে প্রচুর পরিমাণ চাউল সমগ্র ভারত, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য বহু স্থানে রপ্তানি হয়।"[২০৮]

ইবনে বতুতা চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে চীনদেশীয় জাঙ্কে (বিরাট বাণিজ্য জাহাজ) জল পথে যাত্রা করেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চাউল, সুতীবস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের ব্যবসায়ে বাংলার সঙ্গে, বার্মা, মালয় দীপপুঞ্জ, সিংহল ও অন্যান্য দেশগুলোর প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক চীনা দূতদের বিবরণে অবগত হওয়া যায়। বাংলার সঙ্গে চীনের স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম, নীল ও সাদা চীনামাটির বাসন, তাম্র, লৌহ, কস্তুরী, সিন্দুর, পারদ ও মাদুর ইত্যাদির ব্যবসা ছিল।" [২০৯]

বাংলাদেশ সাধারণত স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতব পদার্থ গ্রহণ করতো সুতীবস্ত্র, রেশমী কাপড় ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে। ষোড়শ শতকের শেষপাদে সাতগাঁও বন্দরের অবনতি হয়। তবুও ঐ সময়ে এই বন্দর থেকে একমাত্র পর্তুগীজ বণিকরা চাউল, সুতীবস্ত্র, লাক্ষা, চিনি, মরিচ, হরিতকী ইত্যাদি পণ্যদ্রব্যে ৩৫টি জাহাজ বোঝাই করে।[২১০]

ভারতীয়, বিদেশী ও অন্যান্য বণিকদেরও সাতগাঁয়ের সঙ্গে বাণিজ্য ছিল। বারবোসার মতে, বহু জাহাজ প্রচুর পরিমাণ সুতীবস্ত্র, চিনি, আদা, লংকা ইত্যাদি পণ্য নিয়ে ' বাঙ্গালার' বন্দর থেকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ, বার্মা ভারতীয় উপকূল সিংহল, আরব, পারস্য ও আবিসিনিয়ায় গমনাগমন করতো।[২১১] বারথেমা বলেন যে, প্রতি বছর সুতী ও রেশমী বস্ত্র বোঝাই ৫০টি জাহাজ 'বাঙ্গালা' শহর থেকে যাত্রা করতো। মার্কপোলো দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি বাংলার চিনি রপ্তানি বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। জানা যায় যে, সে সময় বাংলাদেশ সাফল্যজনকভাবে এই পণ্যদ্রব্যে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।[২১২] এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ ষোড়শ শতকে অন্যান্য দেশগুলোতে মাখন রপ্তানি করতো।[২১৩]

সমুদ্রপথে বাংলার ব্যাপক বাণিজ্যের প্রমাণ বাংলা সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়। বণিকরা সিংহল, গুজরাট ও দক্ষিণ উপকূলের সঙ্গে বাণিজ্য করতো এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করতো। অবগত হওয়া যায় যে, এতবেশী পরিমাণে বাংলাদেশ সামুদ্রিক লবণ উৎপন্ন করতো যে, তা বিদেশেও বিক্রি করা হতো ।

Dhaka University Institutional Repository

পান, সুপারি, পিয়াজ, রসুন, তেল, মাখন, শুটকী মাছ, ফলমূল, কলাই, কর্পূর, ঘৃতকুমারী কাঠ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, পারাবত, পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি ছিল রপ্তানি পণ্যের অন্তর্ভুক্ত ।

বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' ও মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে জানা যায় কিভাবে বাংলার সুচতুর হিন্দু বণিকগণ বিদেশের মূল্যবান পদার্থের পরিবর্তে তাদের সামান্য পণ্যদ্রব্যগুলো বিনিময় করতো।[২১৪]

বাংলার প্রাচুর্য কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যে এবং সপ্তদশ শতকে এর ব্যাপক রপ্তানি বাণিজ্য বার্নিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি অভিমত দেন যে, পৃথিবীর আর কোথাও বাংলার মত নানা ধরনের মূল্যবান পণ্যদ্রব্য বিদেশী বণিকদেরকে আকৃষ্ট করতে দেখা যায় না। তিনি বলেন, " বাংলাদেশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতবেশী চাউল উৎপন্ন করে যে, উহা কেবল প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতেই নয়, দূরবর্তী রাজ্যসমূহেও সরবরাহ করে। এসব চাউল গঙ্গা থেকে পাটনা পর্যন্ত বহন করে আনা হয়। উহা বিদেশী রাজ্যগুলোতেও বিশেষ করে, সিংহল ও মালদ্বীপে পাঠান হয়।[২১৫]

চিনি রপ্তানি সম্পর্কে বার্নিয়ার লিখেছেন, " বাংলাদেশ একইভাবে চিনিতেও পরিপূর্ণ। এই চিনি গোলকুণ্ডা ও কর্ণাটক রাজ্যে সরবরাহ করা হয়"[২১৬] - এ রাজ্য দু'টোতে চিনি খুব কমই উৎপন্ন হয়। মেসোপটেমিয়ায় এবং এমনকি মোকা ও বসোরা শহরের মাধ্যমে আরব ও বন্দর আব্বাসের মাধ্যমে পারস্যেও বাংলাদেশের চিনি সরবরাহ করা হয়।" সুতী ও রেশমী দ্রব্যের রপ্তানি সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলায় এত পরিমাণ সুতা ও রেশম আছে যে, এ রাজ্যকে এ দুটো পণ্যদ্রব্যের সাধারণ ভাণ্ডার বলে অভিহিত করা যায় । বাংলার এই ভাণ্ডার কেবল হিন্দুস্তান অথবা সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যের জন্যেই নয়, বরং অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ এবং এমনকি ইউরোপের জন্যেও। কেবলমাত্র ওলন্দাজ বণিকরা মিহি ও মোটা, সাদা ও রঙ্গীন প্রত্যেক প্রকারের সুতীবস্ত্রের যে বিপুল পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে জাপান এবং ইউরোপে রপ্তানি করে তা' দেখে আমি সময় সময় বিস্মিত হয়েছি। ইংরেজ, পর্তুগীজ এবং দেশীয় বণিকরাও প্রচুর পরিমাণে এই পণ্যের ব্যবসা করে। রেশম ও সর্ব প্রকার রেশমী দ্রব্য সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়।[২১৭] বার্নিয়ার লবণ এবং অন্যান্য দ্রব্যেও বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, " বাংলাদেশ শোরা পণ্যের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র" ।

তিনি আরও বলেন যে, শোরা পণ্যে বোঝাই বিরাট বিরাট মালবাহী জাহাজ ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে ও ইউরোপে প্রেরণ করতো। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সর্বোৎকৃষ্ট লাক্ষা উৎপন্ন করতো এবং এর সঙ্গে আফিম, মোম, গন্ধগোকুল, লম্বা মরিচ ও বিভিন্ন প্রকারের

Dhaka University Institutional Repository

ঔষধ বিদেশে রপ্তানি করতো। ঘি রপ্তানির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, " ঘি এ-রকম প্রচুর যে, যদিও ইহা রপ্তানির জন্যে অসুবিধাজনক, তথাপি এই দ্রব্য সমুদ্রপথে বহু জায়গায় পাঠান হয়।"[২১৮]

বার্নিয়ারের মতে, বাংলা থেকে বেশ কিছু পরিমাণ মিষ্টান্ন ফলমূল, যেমন- আম, আনারস হরিতকী, লেবু এবং আদা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হতো।[২১৯] বার্নিয়ারের বর্ণনায় মোগল শাসনামলে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময় বাংলা বিশাল মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপের সঙ্গে এর যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় এর বৈদেশিক বাণিজ্যের আয়তন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বার্নিয়ারের কথানুযায়ী মোগল পূর্ব যুগে কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যে বাংলার প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধ রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কেও একটি ধারণা করা যায়।

বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য বিশাল পরিমাণে রপ্তানির জন্য খুবই অনুকূলে ছিল। সাধারণ দরকারি দ্রব্য এবং আরাম ও বিলাসের প্রতিটি জিনিসপত্র এদেশে উৎপন্ন হতো। তবে বাংলাদেশ যেসব দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো তাদের থেকে এটাকে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করতে হতো না। বাংলার পণ্যের জন্যে প্রায়ই বিদেশীরা স্বর্ণ, মুক্তা ও মূল্যবান পদার্থের মাধ্যমে দাম পরিশোধ করতো।
সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য থেকেও প্রকাশ পায় যে, "বাঙালী বণিকরা স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ও মূল্যবান পদার্থের পরিবর্তে তাদের পণ্যদ্রব্য বিনিময় করতো এবং এইভাবে দেশে প্রচুর ধন-সম্পদ আনয়ন করতো।"[২২০]

একমাত্র উল্লেখযোগ্য পণ্য যা বাংলাদেশ আমদানি করতো তা ছিল চীনামাটির বাসন ও আফ্রিকার ক্রীতদাস।[২২১] সমগ্র মুসলিম শাসনামলে বাংলার এই ব্যাপক অনুকূল বাণিজ্য বজায় ছিল। ফলে, এই প্রদেশে স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান পদার্থের আসার প্রবাহ অব্যাহত ছিল। সুতরাং আলোকজাণ্ডার ডোউ মন্তব্য করেন যে, বৃটিশ শাসন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশকে একটি ডোবার মত মনে করা হতো এবং সেখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য এরূপভাবে অদৃশ্য হয়ে যেত যে, তা' ফিরে পাওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও থাকতো না।[২২২]

ঙ. সুলভ জীবন যাত্রা

মাটির উর্বরতা, শিল্পের উন্নতি এবং লোকদের পরিশ্রম ও কারিগরি নৈপুন্য বাংলার কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের মূল কারণ। বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের এতবেশি প্রাচুর্য ছিল যে, তাতে এর অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটানোর পর ব্যাপক রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত থাকতো।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যধিক প্রাচুর্য থাকায় জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অসাধারণভাবে সস্তা ছিল এবং অন্যান্য দেশের স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থ এই প্রদেশকে সম্পদশালী করে তোলে।

সমসাময়িক বিবরণে বাংলা হলো একটি প্রাচুর্যপূর্ণ ও সুলভ দেশরূপ চিত্রিত হয়েছে। ইবনে বতুতা মন্তব্য করেন যে, পৃথিবীর কোথাও তিনি এমন একটি দেশ দেখেননি যেখানে জিনিসপত্র বাংলার মতো এত সস্তায় বিক্রি হয়। তিনি লেখেন যে, এদেশ ছিল চাউলে পরিপূর্ণ ও ভাল ভাল জিনিস পাত্র ভরা। পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে চৈনিক দূতগণ কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যে বাংলার সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন।[২২৩] ইতালীয় বণিক বারথেমা এই প্রদেশের সর্বত্র প্রত্যেক জিনিসের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হয়ে যান এবং মন্তব্য করেন যে, এদেশ বসবাসের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান ।[২২৪]

১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ ভ্রমণ করে সিবাস্তিয়ান মানরিক লিখেছেন যে, প্রত্যেক শহরে কিংবা বাজারে খাদ্যদ্রব্য, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি, সুতীবস্ত্র ইত্যাদির এতবেশী প্রাচুর্য ছিল যে, মাত্র একটি বাজারের এ সকল জিনিসপত্রের যে কোন একটি দ্রব্যের দ্বারা কয়েকটি জাহাজ বোঝাই করা যেত।

তিনি মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশের শহরগুলোতে বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য এত কম ছিল যে, তিনি দিনে কয়েকবারই আহার করতে প্রলুব্ধ হন।[২২৫] প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সুলভতার একটি ধারণা ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। তিনি কয়েকটি দ্রব্যের মূল্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

৮০ দিল্লী রাতল ধান= ৮ দিরহাম[২২৬]

২৫ রাতল চাউল = ১ রৌপ্য দিনার

১ মন (বর্তমান ওজন) চাউল = এক আনা ৯ পাই

১ রাতল ঘি = ৪ দিরহাম = $\frac{১}{২}$ দিনার = ৮ আনা

১ মণ (বর্তমান ওজন) ঘি = ১ টাকা ৭ আনা

১ রাতল চিনি = ৪ দিরহাম = $\frac{১}{২}$ দিনার = ৮ আনা

১ মণ (বর্তমান ওজন) চিনি = ১ টাকা ৭ আনা

১ রাতল তিলের তৈল = ২ দিরহাম = $\frac{১}{৩}$ দিনার =৪ আনা

১ মণ (বর্তমান ওজন) তিল= ১১ আনা এবং ৬ পাই

১ রাতল মধু = ৮ দিরহাস = ১ দিনার = ১ টাকা

১মন (বর্তমান ওজন) মধু = ২ টাকা ও ১৪ আনা

Dhaka University Institutional Repository

১টি দুগ্ধবতী গাভী = ৩টি রৌপ্য দিনার = ৩ টাকা

১টি মোটা ভেড়া = ২ দিরহাম = ৪ আনা

৮টি মুরগী = ১ দিরহাম = ২ আনা

১টি মোটা মুরগী = ১ আনা

১৫টি কবুতর = ১ দিরহাম = ২ আনা

১৫ গজ উৎকৃষ্ট সুতীবস্ত্র = ২ টাকা

১টি সুন্দর ক্রীতদাসী বালিকা = ১ স্বর্ণ দিনার = ১০ টাকা

প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সুলভতা সুবাদার শায়েস্তা খানের সময় পর্যন্ত বজায় ছিল। তখন চাউলের মন প্রতি মূল্য ছিল ২ আনা। এমনকি নবাব সুজাউদ্দিনের সময় চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রাচুর্য ও সুলভতা ছিল। উত্তর ভারতের জিনিসপত্রের মূল্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, জিনিসপত্রের মূল্য খুবই সস্তা ছিল ব্যাপক রপ্তানির পরও।

দ্রব্যাদি	আলাউদ্দিন খলজী	মুহাম্মদ তুগলক	ফীরূজ শাহ্ তুগলক
চাউল ১ মন (৪০ সের)[২২৭]	----------	১০ আনা	----------
গম ১ মণ (৪০ সের)	৫ আনা ৬ পাই	৯ আনা	৬ আনা
যব ১ মণ (৪০ সের)	৩ আনা	৬ আনা	৩ আনা
ঘি (মাখন) ১ মণ (৪০ সের)	----------	----------	১ টাকা ও ৯ আনা
চিনি ১ মণ (৪০ সের)	১৫ আনা	১ টাকা ৪ আনা	২ টাকা ৩ আনা
মাস কলাই ১ মণ (৪০ সের)	৩ আনা ১ পাই	----------	----------
মটর ১ মণ (৪০ সের)	----------	৩ আনা	----------
গো মাংস ও মেষ মাংস	----------	৩ আনা ৩ পাই	----------

বাংলা সাহিত্য মুসলিম আমলে বাংলার লোকদের সুলভ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাত্রার ছবি প্রতিফলিত করে। বৈষ্ণব কবিগণ লিখেন যে, চৈতন্যের বিয়ে অনুষ্ঠান সামান্য কিছু কড়ি দিয়েই সম্পন্ন হয়, তথাপি এটাকে তাঁরা জাঁকজমকপূর্ণ ও ব্যয় বহুল উল্লেখ করেন। [২২৮]

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে ষোড়শ শতকে জিনিসপত্রের সুলভতা সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। একটি দাসীর বাজার করার কথা বলতে গিয়ে কবি লেখেন, "দুর্বলা দাসী ৫০ কাহন কড়ি নিয়ে বাজারে

Dhaka University Institutional Repository

যায়। সে একটি লম্বা লাউ ও একটি কুমড়া কেনে ১০০ কড়িতে। সে এক ঝুড়ি আম কেনে ১০০ কড়িতে। সে একটি রুহিত ও অন্যান্য নানা ধরনের মাছ যেমন - চিতল, বোয়াল ও ৬৪১টি চিংড়ি কেনে। চতুরা দাসী একটি খাসী ছাগল কেনে ৮ কাহন কড়িতে এবং সে ১০ বুড়ি কড়ি সের দরে সরিষার তেল ক্রয় করে।"[২২৯]

একজন দাসী এ রকম প্রচুর জিনিস বাজার করে যা এ কালের খুব ধনী ব্যক্তির মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সেকালের লোকেরা তাদের খাবার টেবিলে প্রচুর সুস্বাদু খাবার পেত এবং অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করতো। দাসীর বাজার করা থেকে বাজারে দ্রব্যাদির সুলভতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্যে একজন সাধারণ লোক শিকারী কালকেতুর বিবাহ উৎসবে ব্যয়ের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়।"[২৩০]

২ ধরা (সাধারণ কাপড়)	২০ কড়ি
পান	৪ কড়ি
খয়ের	৪ কড়ি
চুন	২ কড়ি
সিন্দুর	৪ কড়ি
খুয়া (সাধারণ শাড়ি)	১৮ কড়ি
মোট	৫২ কড়ি

মুসলমান যুগে কড়িকে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রায় পরিণত করতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

৪ কড়ি = ১ গণ্ডা

৫ গণ্ডা = ১ বুড়ি

৪ বুড়ি = ১ পণ

২০ পণ = ১ কাহন

৫ কাহন = ১ টাকা।

এ পদ্ধতির ভিত্তিতে যখন ১২৬ কড়িতে এক পয়সা এবং ৮,০০০ কড়িতে এক টাকা হতো,[২৩১] তখন কালকেতুর বিয়ের খরচ হয়েছিল ৫২টি কড়ি বা আধ পয়সারও কম।

হিন্দু আমলে কড়ির উচ্চতর মূল্য ছিল। সে সময়ে রৌপ্য মুদ্রার সঙ্গে কড়ির মূল্য নির্ধারণ করতে লীলাবতীর অংকশাস্ত্র গ্রন্থের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

২০ কড়ি = ১ কাকিনী

Dhaka University Institutional Repository

৪ কাকিনী = ১ পণ

১৬ পণ = ১ দ্রাকমা বা একটি রৌপ্য মুদ্রা

১৬ দ্রাকমা = ১ নিষ্ক

অমর ঘোষের মতে, এক নিষ্ক ছিল এক দিনারের সমান।[২৩২]

এক তালিকায় দেখা যায় যে, হিন্দু আমলে ১২৮০ কড়ি ছিল এক টাকার সমান। কিন্তু মুসলমান শাসনামলে ৮,০০০ কড়িতে এক টাকা হতো। ব্যাপক রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যাপক সমাগমের ফলে কড়ির মূল্যমান হ্রাস পায়। অধিকন্তু, মুসলিম পূর্বযুগের বাংলায় রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা খুবই দুস্প্রাপ্য ছিল । কড়ি ছিল প্রধান বিনিময় মাধ্যম। যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বাজারে চালু ছিল মুসলমান আমলে এবং শুধুমাত্র কড়ি ছোট আদান- প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হতো। ফলে কড়ির মূল্য ও গুরুত্ব ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে এটা মুসলমান শাসনাধীনে বাংলার জিনিসপত্রের প্রাচুর্য ও সুলভতা এবং বাংলার সমৃদ্ধির প্রমাণ।

মুসলিম আমলে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। অথচ বিস্তর চাষযোগ্য জমি ছিল এবং অধিক শ্রম ব্যতিরেকে শস্যের উৎপাদন ছিল প্রচুর। লোকেরা পরিশ্রমী ছিল। কৃষক শ্রেণীর নারী পুরুষ উভয়েই ক্ষেতে কাজ করতো এবং অবসরকালে সুতা কাটা, বস্ত্র বোনা কিংবা অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত থাকতো।"[২৩৩] সুতরাং বাংলার লোক সংখ্যার অধিকাংশ কৃষকদের জীবন ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল। ভূমিহীন লোকের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। এ সকল ভূমিহীন লোকেরা ছোটখাট কারিগরি বা হস্তশিল্পের কাজ গ্রহণ করতো কিংবা কৃষিকার্যে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো। কৃষি-শ্রমিকদেরকে তাদের কাজের জন্যে উত্তম পারিশ্রমিক দেয়া হতো। সাধারণত টাকার পরিবর্তে জমির উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হতো। শস্য কাটার জন্যে তাদেরকে সংগৃহীত শস্যের এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক তৃতীয়াংশ শস্য দেয়া হতো। 'দিনী' নামে অভিহিত এই পদ্ধতি এখনো বাংলার অনেক অঞ্চলে প্রচলিত আছে ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষি-শ্রমিকদের পরিস্থিতি এমনকি ভূস্বামীদের থেকেও ভাল ছিল। এই শ্রেণীর শ্রমিকদের দুস্প্রাপ্যতা হেতু এদের চাহিদা ছিল খুব বেশি। যে সব কৃষকদের নিজেদের চাষাবাদের সাধ্যাতীত অধিক জমি থাকতো, তার জন্যে শ্রমিকদেরকে তাদের ক্ষেতে কাজ করার জন্যে যথেষ্ট মজুরি দিতে হতো।

আমরা গ্রামাঞ্চলের অনেক কৃষক পরিবারের নিকট গল্প শুনেছি যে, কয়েক পুরুষ আগে তাদের পূর্ব পুরুষগণ তাদের ক্ষেতের কাজে আকৃষ্ট করার জন্যে শ্রমিকদেরকে জমি বিতরণ করতো। যে-সব কৃষিশ্রমিক এভাবে ভূস্বামীদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য অংশ লাভ করতো, তাদেরকে জমির জন্য কোনোরূপ খাজনা দিতে

Dhaka University Institutional Repository

হতো না। কাজেই উৎপন্ন ফসলে শ্রমিকদের অংশ তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে যথেষ্ট ছিল। তার মাছ কেনার প্রয়োজন হতো না। কেননা, এগুলো প্রচুর পরিমাণে নালায়, খালে, বিলে এবং চারিদিকের পুকুর পুষ্করিণীতে পাওয়া যেতো । এমনকি তার বসতবাটি সংলগ্ন জমিতে সব রকম শাক-সবজি যথেষ্ট পরিমাণে জন্মাতো। শুধু তাকে কাপড় চোপড় কিনতে হতো। মৃদু জলবায়ুর দেশ বাংলায় অত্যন্ত পরিমিত পরিমাণ পরিচ্ছদের প্রয়োজন হতো। সাধারণ লোকের মোটা কাপড়-চোপড়ের দরকার হতো। এগুলো খুবই সস্তা ছিল ।

কৃষি মজুর ছাড়াও সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে সুতার-মিস্ত্রী, বাঁশ কাটারু, ঘরামী, সাধারণ রাজ মিস্ত্রী এবং এ ধরনের অন্যান্য বহু কারিগর ছিল । বাংলাদেশের এ সকল মজুরদের সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে উত্তর ভারতে সে সময়কার এ শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরি থেকে এদের মজুরির বিষয়ে ধারণা করা যেতে পারে। সম্রাট আকবর একটি আইন করে শ্রমিকদের যে মজুরি নির্ধারিত করেছিলেন, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ।[২৩৪]

শ্রমিকদের শ্রেণী	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী
গিলকার (যারা চুন-কাম করে)	৭ দাম	৬ দাম	৫দাম
সাঙ্গ তারাস (পাথর কাটার কাজ করে)	৬ দাম(গজ প্রতি	৫ দাম	-------
বিলদার (রাজ মিস্ত্রী)	৩ $\frac{১}{২}$ দাম	৩ দাম	২ $\frac{১}{২}$ দাম
কাঠ মিস্ত্রী	৭ দাম	৬ দাম	৪ দাম
চাপকান (কূপ খননকারী)	২ দাম (গজ প্রতি)	১ $\frac{১}{২}$ দাম	১ $\frac{১}{২}$ দাম
ঘট- খুড়	৪ দাম (শীতকাল)	৩ দাম (গ্রীষ্মকাল)	---------
কিস্ত তারাস (টালি প্রস্তুতকারী)	৮ দাম(একশত ছাঁচের জন্য)	----------	---------
কাঁচ কাটারু	১০০ দাম (সৈনিক)	----------	---------
বাঁশ কাটারু	২ দাম (সৈনিক)	----------	---------
ছাপ্পর বন্দ (ঘরামী)	৩ দাম	২৪ দাম	---------
আকবাশ (পানি বাহক)	৩ দাম	২ দাম	---------

উপর্যুক্ত তালিকায় কাঠুরিয়াই হচ্ছে কম দক্ষ ও নিম্নতম মজুরীর শ্রমিক।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক মজুরি হিসেবে ২ দাম নিয়ে সে মাসে ৬০ দাম আয় করতো। মাসে ৬০ দাম হচ্ছে ১ $\frac{১}{২}$ টাকা এবং বছরে ১৮ টাকার সমান। জীবন ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যমান কম থাকায় পরিবারের ভরন-পোষণের জন্যে তাকে খুব বেশী ব্যয় করতে হতো না। ইবনে বতুতা বলেন যে, তার জনৈক বন্ধু আল মাসুদী বাংলাদেশে বসবাস করেন এবং তিনি তিনটি লোকের এক বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ৮ দিরহামে অর্থাৎ ১ টাকায় ক্রয় করেন।[২৩৫]

১ টাকায় তিনজন লোক স্বচ্ছন্দে বছর কাটাতে পারতো। বছরে ১৮ টাকা আয়ের কোনো কাঠুরিয়ার পরিবারে যদি ৬ জন লোক থাকে, তাহলে সারা বছরের জন্যে তার ২ টাকা বা বেশির পক্ষে ৩ টাকার প্রয়োজন পড়ে। ১৫ টাকার মত তার উদ্বৃত্ত থাকে। সস্তার পরিপ্রেক্ষিতে তার গোটা পরিবারের কাপড়-চোপড়ের জন্যে সে ২ টাকার বেশি ব্যয় করতো না। মসজিদ ও মক্তবের জন্যে জমি মঞ্জুরীকৃত থাকায় শিক্ষা অনেকটা অবৈতনিক ছিল। অতএব, সে বেশির পক্ষে ২ টাকা ব্যয় করতো তার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্যে। তার অন্যান্য খরচের জন্যে ছিল ১ টাকা । এসকল ব্যয়ভার বহন করার পর বছরে তার ১০ টাকার মতো সঞ্চয় হতো ।

সবচেয়ে অদক্ষ শ্রমিকদের যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে অপেক্ষাকৃত দক্ষ শ্রমিক যেমন-- ঘরামী, রাজমিস্ত্রী ও অন্যান্যদের অবস্থা আরও ভাল ছিল। কারণ তারা অধিকতর মজুরি পেতো। এতে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রাচুর্য ও সস্তার জন্যে এমনকি অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রাও সহজ ছিল। তাদের অভাবও খুব কম ছিল। জীবন-যাপন প্রণালী ছিল সাদাসিধে। আর্থিক জীবন প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান আমলে বাংলাদেশে কোনো দুর্ভিক্ষের উল্লেখ নেই। সমসাময়িক বর্ণনা থেকে আমরা অবগত হতে পারি যে, সময় সময় উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের লোকের এই ধরনের দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা ছিল না।

এটা সত্য যে, মাঝে মাঝে এ প্রদেশে ঝড় বন্যা দেখা দিত, যার দরুণ কিছু কিছু এলাকায় ঘরবাড়ী ও শস্য বিনষ্ট হতো। কিন্তু জনসাধারণ এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খুব বেশী কষ্ট পায়নি। প্রাচুর্যের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সহজেই বাংলার অন্যান্য স্থান থেকেও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে পারতো। ঝড় বন্যার কারণে যেখানে অভাব ও দুঃখকষ্ট দেখা দিত, সে সব এলাকায় দুঃস্থ লোকদের নিকট দ্রুত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণে অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিলগুলো খুবই সাহায্য করতো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম আমলে বাংলাদেশ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং এ প্রদেশে সুখ শান্তি বিরাজমান ছিল। সাধারণ লোকদের জীবনে জটিলতা দেখা দেয়নি। তাদের খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল এবং তাদের জীবন ছিল সহজসাধ্য।

তাই উপরিউক্ত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় বলা যায় যে, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ তুলনামূলকভাবে পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে এসময় সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত সুন্দর ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১ ডঃ এস,এম, আবদুস সালাম, আবদুল হক দেহলভীঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৭. পৃ. ৫২; ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, নুর মোহাম্মদ মিয়া অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৪৭; শান্তনাথদাস, নতুন মানব সমাজ, ঝুনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ১; সুবোধ চৌধুরী, মানব সমাজ, ১ম খণ্ড, অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা ১৩৬৩, পৃ. ২৫; শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়, সমাজ দর্শন, জানার্জি পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২৪; শ্রী খগেন্দ্রনাথ সেন, সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা, ১ম খণ্ড, শ্রীশ প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩; মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সমাজ কর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৬৪; মোঃ আমীর হোসেন, সমাজ বিজ্ঞান, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৪১; কাজী দীন মুহম্মদ, জীবন সৌন্দর্য , ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৭৯

২ Encyclopedia of the Social Science, Vol. 13 , The Social Science Encyclopedia, Adam Kupeer, Library of Congress Cataloging in Publication Data, London, 1985, p. 784; The Macmillan Company, New York,1963, p. 225; ইবন খালদুন , পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭; রঙ্গলাল সেন, সমাজ বিজ্ঞান, প্যারামাউন্ট বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৪৬; শ্রী খগেন্দ্রনাথ সেন, সমাজ বিজ্ঞানের পরিচয়, শ্রীশ প্রকাশন, কলিকাতা , ১৯৮১, পৃ. ২; ফজলুর রশীদ খান, সমাজ বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, শিরিন পাবলিকেশনস, ঢাকা , ১৯৮০, পৃ. ৩৫; মোহাম্মদ গোলাম রসুল, সমাজ ও সভ্যতায় ইতিকথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৬; মোঃ আমীর হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৩ ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাবীর জীবনী এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, (অপ্রকাশিত) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯০, পৃ. ১০; ইবন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, ৪র্থ সংস্করণ, দারুল কলম, বৈরুত, ১৯৮১, পৃ. ৩৫-৩৬; শেখ মাসুম কামাল ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ব্যাঘ্রতট পরিক্রমণ, জেলা প্রশাসন, সাতক্ষীরা ,১৯৮৬, পৃ.৬০

৪ মাহমুদা খাতুন, মঙ্গলকাব্যে বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজ, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৮৯, পৃ.৩৩

৫ অধ্যাপক কে, আলী, মুসলিম বাংলার ইতিহাস, (১২০০-১৭৬৫ খ্রিঃ), আলী পাবলিকেশনস, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২০৭

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

৭ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৫৮-৬১

শতে শতে পেয়াদাগণ তালাস করে বন।
রাখাল বান্দিয়া আনে প্রতি জনে জন।।

অর্থাৎ - "শত শত পেয়াদায়া বনে রাখাল বালকদের সন্ধান করে এবং তাদের প্রত্যেকে রাখালদের কাউকে না কাউকে বেঁধে আনে।"

৮ গোলাম হোসেন সলীম, রিয়াজুস সালাতীন,এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৮৮৯ খ্রি:,পৃ. ১০৬-১০৭

৯ বিজয়গুপ্ত , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪;

"কাণ্ডারী কুতুব, তার মালিম কেদার,
কাণ্ডারী হোসেন তার মালিম তকাই।
যত শহর বেড়াইয়াছে লেখাজোখা নাই"।

অর্থাৎ - একটি জাহাজে কুতুব ছিল কাপ্তান আর কেদার ছিল প্রধান নাবিক। অন্য জাহাজে হোসেন কাপ্তান ছিল আর তকাই ছিল প্রধান নাবিক। অসংখ্য শহর তারা এভাবে ভ্রমণ করে এসেছে।

১০ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্য চরিতামৃত, সুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৬
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দর্জি যবন।

Dhaka University Institutional Repository

১১ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীকাব্য, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫২, পৃঃ ৩৪৫;
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজীর ঘটা।।

১২ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫

১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫

১৪ Muhammad Abdur Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol. I, (1200-1576), University of Karachi, 1963, pp. 261-262

১৫ Amir Khusrau, Qira'n al-Sa'dain, Lucknow, 1845, pp. 100-101

১৬ Muhammad Abdur Rahim, Ibid, pp. 262-263

১৭ Insha-i-Mahru, Quoted by Dr. I.H. Qureshi, Taxila in Indo-Pakistan During Middle Ages, Journal of the Pakistan Historical Society, 1953, Vol. I.pt. II, p. 104, 48 jitals - I tanka

১৮ বিশ্বভারতী এ্যানালস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৯৬-১৩৪

১৯ Mahuan's Accounts, N.K. Bhattasali এর Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, Cambridge, 1922, p. 170

২০ M.L. Dames, The Book of Duarte Barbosa, Vol. II, Hakluyt Society, London, 1921, p. 147-148

২১ Tarikh-i-Firishta of Muhammad Qasim Firishta, Vol. II, Newal Kishore, Lucknow, p. 298

২২ Ahmad Hasan Dani, Bibliography of Muslim Inscriptions of Bengal, Appendix to the Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. II, 1957, p. 92

২৩ J.N. Das Gupta, Bengal in the 16th Century, Calcutta University, 1914, p. 116

২৪ Mirza Nathan, Baharistan-i-Ghaybi, translator Dr. M.I. Borah, Vol. I, Gauhati, Assam, 1936, p. 138

২৫ বিশ্বভারতী এ্যানালস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৯৬-১৩৪

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬-১৩৪

২৭ ইলিয়ট, বাবরনামা, সুশীল পাবলিকেশন, তা. নে. পৃ. ৪৮

২৮ Tabqat-i-Akbari of Nizam-uddin Ahmad Bakhshi, Vol. III, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1935, p. 268

২৯ রক্ষণাবেক্ষণ ঐ যুগের শাসনকর্তা বা রাজাদের মধ্যে হারেম প্রথা প্রচলিত ছিল।
জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে, মালব দেশের রাজা সুলতান গিয়াস উদ্-দীনের (১৪৬৯-১৫০০ খ্রিঃ) ১৫,০০০ রমণী ছিল। তিনি তাদের জন্যে একটি শহর নির্মাণ করেন এবং সেখানে তাদেরকে সব রকমের শিল্পকলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী (ইলিয়ট), সুশীল পাবলিকেশন, পৃ. ১১৪। ফিরিস্তার বর্ণনায় এর সমর্থন মেলে। আকবরের 'জেনানা-মহলে' (Female Estate) ৫,০০০ রমণী ছিল এবং এর পরিচালনার জন্য 'মেয়ে দারোগা' (পরিদর্শিকা), তহবিলদার (কোষাধ্যক্ষ), লেখক ও অন্যান্য কর্মচারিগণ ছিল। Ain-i-Akbari of Abul Fazal, (edited by Blochmann) Vol. I, Calcutta, 1877,pp. 46-47

৩০ Ghulam Hussain Salim, Riyazus Salatin, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1898, p. 105; M. Abid Ali Khan and (ed.) H.E. Stapleton, Memoirs of Gaur and Pandua, Bengal Secretariat Book Dept. Calcutta, 1924, pp. 25-26

৩১ Mahuan's N.K. Bhattasali Coins etc, op. cit., p. 170

৩২ Visva Bharati Annals, Vol. I, Calcutta, 1945, pp. 96-134

৩৩ Ibid, p. 96-134

৩৪ Mukundaram Chkrabarti, Chandikavya, op. cit, p. 344
যড়ই দানিশমন্দ না জানে কপট ছন্দ

৩৫ H.S. Jarret, Ain-i-Akbari, Vol. II & III (English translation of) Second edition corrected and annotated by Sir Jadunath Sarkar, Asiatic Society of Bengal, Calcutta,, A.D. 1949, p. 134

৩৬ Vijayagupta, Manasamangal, quoted in S.K. Sen's Bangala Sahityer Itihash, Calcutta, 1940, p. 150
'রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত'

Dhaka University Institutional Repository

৩৭ দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক উদ্ধৃত - বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯০১, পৃ. ১৫২
নুসরৎ শাহ তাত অতি মহারাজ।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা।।
নৃপতি হুসেন শাহ এ ক্ষিতিপতি।
সানন্দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতি।।

৩৮ Tarikh-i-Mubarak Shahi, quoted by K.M. Ashraf, life and conditions on the people of Hindustan, Munshiram Manoharlal publishers pvt, Ltd, New Delhi, Third edition, 1988 (1st edition 1959), p. 16

৩৯ Zia-ud-din Barani, Tarikh-i-Firuz Shahi, Asiatic Society, Calcutta, 1862, p. 41-42

৪০ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪ ;
ফজরের সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালা ধরে, জপে পীর পয়গম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ।
দশবিশ বেয়াদয়ে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কুরআন।
বড়ই দানিসমন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।

৪১ বিপ্রদাস, মনসামঙ্গল, এস.কে.সেন কর্তৃক সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৬৭

৪২ Mahuan's Accounts N.K. Bhattasali, op. cit, p. 170

৪৩ Minhaj-i-Siraj, Tabqat-i-Nasiri (tran. Major H.G. Raverty Elliot), India, 1880, p. 619-620

৪৪ Mirza Nathan, op. cit., pp. 109-110

৪৫ কে.পি. সেন, বাংলার ইতিহাস (নবাবী আমল), ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০

৪৬ Prof. Hasan Askari, Bengal Past and Present, Vol. LXVII, Serial No.130,1948 p. 11

৪৭ Mirza Nathan, Ibid, p. 190

৪৮ কে.পি.সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৪৯ Mirza Nathan, Ibid, p. 168

৫০ দৌলত উজির বাহরাম খান, লায়লী মজনু, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ. ১৮

৫১ আবদুল হাকিম, লালমতি সয়ফুল মুলুক, ৬৪/৩, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রিট, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১২৯৮, পৃ. ৪

৫২ Muhammad Abdur Rahim, op. cit. pp. 281-282

৫৩ বিশ্বভারতী এ্যানালস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ১২২-১২৩

৫৪ Muhammad Abdur Rahim, Ibid, pp. 294-295

৫৫ আলাওল, পদ্মাবতী, (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত), রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃ. ১২১-২২ ও বিপ্রদাস, মনসামঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬

৫৬ শ্রী আবদুল করিম, বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৫

৫৭ চণ্ডীদাস, পদাবলী, টি.সি. দাসগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ২০০

৫৮ ঘনরাম, মনসামঙ্গল, পৃ. ৭৯-৮০

৫৯ J.N.Das Gupta , op. cit., p.185

৬০ Ibid, pp. 185-186

৬১ দৌলত উজির বাহরাম খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৬২ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

৬৩ Ain-i-Akbari of Abul Fazal, (ed.) by Blochmann, Vol. I, op. cit. pp. 287-288

৬৪ Dutt, Begums of Bengal, p. 36

৬৫ ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৮৭-৯০

৬৬ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫

৬৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

৬৮ ইউসুফ আলী, আহওয়াল-ই-মহব্বত-জংগ, সরকারের 'Bengals Nawab'গ্রন্থে অনূদিত, পৃ. ১৫৩

৬৯ Prof. Hasan Askari, op. cit, p. 11

৭০ দৌলত উজির বাহরাম খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭, এবং বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৭১ K.M.Ashraf, op. cit. p. 147

৭২ ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল ; (পাণ্ডুলিপি), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃ. ২৩

৭৩ মুন্সী শ্রী আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

৭৪ সুকবি নারায়ন দেব ও পণ্ডিত জানকী নাথ, পদ্ম-পুরান (মনসামঙ্গল), নিজ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৩৮১, পৃ. ৩১; মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত পৃ. ১৭৬

৭৫ বিশ্বভারতী এ্যানালস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৯৬-১৩৪

৭৬ M.L. Dames, op. cit, p. 148

৭৭. দ্বিজ বংশীদাস, মনসামঙ্গল, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, কলিকাতা, তা.নে., পৃ. ২১৬-১৭ ; মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫

৭৮ শাহ মুহাম্মদ সগীরের "ইউসুফ জুলেখা" জুলেখার, শেখচান্দের রসূল বিজয়ের আমিনার ও বাহরমের 'লায়লী মজনুর লায়লার পোশাক পরিচ্ছদ, পৃ. ২৩; বঙ্গসাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বঙ্গাব্দ, ১৩৪৩, পৃ. ১০৩ এবং ১৫২

৭৯ দৌলত উজির বাহরাম খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩; শাহ মুহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জুলেখা' ও শেখ চান্দের 'রসূল বিজয়' বঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা উদ্ধৃতি বঙ্গাব্দ, ১৩৪৩, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৩ ও ১৪৫-৪৬

৮০ শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২, পৃ. ১৪

৮১ S. Purchas, Purchas His Pilgrims, Vol. X, Glasgow, 1906, p. 184

৮২ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫

৮৩ বিজয়গুপ্ত , মনসামঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৮৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০-৬১

৮৫ জে. অভিংটন - "Voyage of Surate ; আর জে. রাওলিংটন কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ১৮১

৮৬ Mendelslo's Travels , এম.এস. কমিসারিয়েট কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ১

৮৭ ইবনে ফজলুল্লাহ আল-উমায়ী, মাসালিক আল-আবসার", অধ্যাপক আঃ রশিদ কর্তৃক অনূদিত, পৃ. ৫২

৮৮ বিপ্রদাস, মনসা বিজয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ৬৩;
কেহ আনন্দিত হৈয়া সুবর্ণের হুক্কা লইয়া।
তামাকু ভরিয়া দেয় আগে।

৮৯ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, কলিকাতা, ১৯১৪, পৃ. ২৫৪

৯০ M.L. Dames, Vol. II, op. cit. pp. 145-47

৯১ মাহমুদা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৯২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৯৩ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, যোগল স্থানে ইসলাম, উদ্ধৃতি উত্তর বাংলায় আউলিয়া প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, ঢাকা,১৯৬৭, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

৯৪ বখতিয়ার খলজী ছিলেন আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত্-ই-মার্গোয় অধিবাসী। তিনি তুর্কীদের খলজী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ৮১

৯৫ মাহমুদা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮; মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, রংপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১১

৯৬ Minhaj-i-Siraj, Tabyat-i-Nasiri, Calcutta, 1964, p. 67

৯৭ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৯৮ আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ১৩০

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

১০০ সমসাময়িক সূত্রে বখতিয়ার খলজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলায় মুসলমান রাজ্যের সঠিক সীমানা পাওয়া যায় না,তবে কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক লখনৌতি রাজ্যের বিস্তৃতি অত্যন্ত খাট করে দেখেছেন। কিন্তু প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, লখনৌতি রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলায় দেবকোর্ট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বখতিয়ার খলজীর পূর্ব অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১০১ উল্লেখ্য যে, বখতিয়ার খলজীর শাসন ব্যবস্থা ছাড়াও মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি মসজিদ, মাদ্‌রাসা এবং খানকাহ তৈরি করেন। যেই সকল মুসলমান অভিযান পরিচালনার সময়ে বা পরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য লখনৌতিতে আগমন করে, তাদের সুবিধার জন্যই তিনি এ ব্যবস্থা করেন। যেমনঃ- মসজিদ মুসলমানদের নামাজ আদায়ের জন্য, মাদ্‌রাসা- ছেলে-মেয়েদের সুশিক্ষার জন্য এবং খানকাহ সূফীদের ধর্মপ্রচারের জন্য তৈরি করেন। বখতিয়ার খলজী একজন সৈনিক হয়েও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত লখনৌতির মুসলমান রাজ্য শুধু সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করা যায় না। তাই সামরিক শক্তির প্রয়োজন একদিন শেষ হবেই। কিন্তু মুসলমান সমাজ শান্তির সময়ে মুসলমান রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করবে। আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১০২ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

১০৩ আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

১০৪. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ), বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ২৫

১০৫ Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. I A, Muslim Rule in Bengal (600-1170/1203-1757) Published Under the Supervision of the Department of Culture and Publications, Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Riyadh, 1985, p. 78

১০৬ Minhaj-i-Siraj, op. cit., p. 75; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১০৭ Minhaj-i-Siraj, Ibid, p. 75

১০৮ Minhaj-iSiraj, Ibid, p. 75; Dr. Muhammad Mohar ali, Ibid, p. 80

১০৯ Dr. Muhammad Mohar Ali, Ibid, p. 93; Minhaj-i-Siraj, Ibid, p. 146

১১০ Dr. Muhammad Mohar Ali, Ibid, p. 99

১১১ Zia-ud-din Barani, op. cit, p. 297

১১২ Abdul Karim, Corpus of the Muslim Coins of Bengal (Down to A.D. 1538), Published by Asiatic Society of Pakistan, Dacca,, 1960, p. 82

১১৩ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ) পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

১১৪ আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

১১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

১১৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

১১৮ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

১১৯ Abdul Karim, op. cit, p. 26

১২০ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ) পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

১২১ Abdul Karim, Ibid, p. 36-37

১২২ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

১২৩ Editorial Board, Islamic Culture, Vol. XXXII (32),No. I, Published by The Islamic culture Board, Hyderabad,1958, p.199

১২৪ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯; মোছাঃ আশীয়ারা খাতুন, বাংলার ঐতিহাসিক নগরী একটি সমীক্ষা, ১২০০-১৫৭৫ খ্রিঃ, পিএইচ. ডি. থিসিস (অপ্রকাশিত) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৫; কে.এম. রাইছ উদ-দীন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২৯৬

১২৫ মোছাঃ আশীয়ারা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

১২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬; Sir H.M.Elliot and professor John Dowson, The History of India As told by its own Historians, Vol. 3, Kitab Mahal, Allahabad, 1948, pp. 304-305; কে.এম. রাইছ উদ্‌দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

১২৭ একডালা দুর্গ ঃ সুলতানি আমলের একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। যা গৌড় নগরের কাছেই গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত

১২৮ কে.এম.রাইছ উদ্‌দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮; মোছাঃ আশীয়ারা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০-২০১

১২৯ রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২১-১৩২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪৩; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১; কে. এম. রাইছ উদ্‌দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯; ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬; মোছাঃ আশীয়ারা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

১৩০ মোল্লা শাহ্ আতা বিভাগ পূর্ব দিনাজপুর জেলার অধীনে গঙ্গারাম থানায় অন্তর্ভুক্ত প্রসিদ্ধ ধলদিঘির পাড়ে মাখদুম শাহ আতা বোখারীর সমাধি ও আস্তানা অবস্থিত। তিনি স্বীয় নামের চেয়ে ধলদিঘির পীর নামেই সুপরিচিত। মোল্লা আতার পূর্ণ নাম হলো মাখদুম শাহ্ সিরাজউদ্‌দীন আতা। তবে তিনি পূর্ণ নামের চেয়ে মোল্লা আতা বা আতাউল্লাহ বোখারী নামেই সমধিক পরিচিত। দিনাজপুর জেলায় তিনি ইসলাম প্রচার করেন। বোখারী উপাধি হতে বোঝা যায় যে, তাঁর জন্ম স্থান বোখারায়। তিনি কুফায় ও বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন। তের বছর তিনি মদিনায় মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। আল-কুরআন, আল-হাদিস, ফিক্‌হ, উসুল, মানতিক, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি ইসলামি শাস্ত্রের উপর পাণ্ডিত্য লাভ করেন

দ্রঃ মেহরাব আলী, দিনাজপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৪৫-৪৭; Eastern Bengal District Gazetteers (Dinajpur), F. W. Strong (ed.), The Pioneer Press, Allahabad, 1912, p. 134

১৩১ Shams-ud-din Ahmad, Inscription of Bengal, Vol. IV, Rajshahi, 1960, pp. 34-35; কে.এম. রাইছ উদ্‌দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯; Ghulam Hussain Salim, Riyazu-s-Salatin, Abdus Salam, Bengal Translation, By Akber Uddin, Bangla Academy, Dacca, 1978, pp. 106-108; শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী:), কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৩৬; আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

১৩২ Shams-ud-din Ahmad, Ibid, Vol. IV, pp 39-40; Abdul Karim, Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, p. 50

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩ শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯; N. K. Bhattasali, op. cit, p. 70, Ghulam Hussain Salim, op. cit, p. 108, কে.এম. রাইহ উদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪, Shams-ud-din Ahmad, Ibid, p. 70

১৩৪ শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১৩৫ Journal of the Bihar Research Society, Vol. 52, 2nd part, 1956, p. 8

১৩৬ N.K. Bhattasali, op. cit,, p. 70

১৩৭ Ibid. p. 70

১৩৮ Ghulam Hussain Salim, op. cit., p. 108

১৩৯ Ibid, p. 108

১৪০ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫; কে.এম.রাইহ উদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩

১৪১ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি:), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

১৪২ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি:), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

১৪৩ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬-১৭

১৪৪ Dr. B.B. Prashad, Tabaqat-i-Akbari, Vol. III, English Translation of Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1939, p. 524; কে.এম. রাইহ উদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

১৪৫ Tarikh-i-Firishta of Muhammad Qasim Firishta, Vol. II, op. cit. p.297; Calcutta Review, Calcutta, 1946, p. 112

১৪৬ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি:), পূর্বোক্ত,পৃ. ৮২

১৪৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

১৪৯ পূর্বোক্ত, পৃ.৮৩

১৫০ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১

১৫১ Abdul Karim, Corpus, op. cit, p. 83

১৫২ Editorial Board, Islamic Culture, Vol. XXXII (32), No.1, op. cit, p. 206

১৫৩ M. Martin, The History, antiquities, Topograpy and Statistics of Eastern India, Vol. II, London, 1838, p. 618

১৫৪ M. Martin, Ibid, pp. 206-7

১৫৫ M. Abid ali Khan and (ed.) H.E. Stapleton, Memoirs of Gaur and Pandua, Published by the Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1924, p. 126

১৫৬ Journal of the Numismatic society of India, Vol. 9, No. 1, (Formerly Published from Bombay and now being Published from Banaras) p. 47

১৫৭ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, বুক এমপোরিয়ম লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ১৯৫-৯৮

১৫৮ Major H.G. Raverty, Tabqat-i-Nasiri (English tran. of Bibliotheca Indica), 1880, pp. 555-556. অংক শাস্ত্র গ্রন্থ 'লীলাবতী' অনুসারে ২০ কড়িতে এক কাকিনী, ৪ কাকিনীতে এক পণ এবং ১৬ পণে এক দ্রাক্ষমা (Drachma) বা রৌপ্যমুদ্রা এবং ১৬ দ্রাক্ষমায় এক 'নিস্ক' ধরা হতো। অমর ঘোষের মতে এক 'নিস্ক' ছিল এক দিনারের সমান। নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

১৫৯ Ain-i-Akbari of Abul Fazal, Vol. II English translation of H.S. Jarrett, Calcutta, 1949, A.D. p. 134

১৬০ Ain-I-Akbari of Abul Fazal, Vol. I, English translation of H.S. Jarrett, Calcutta, 1949, A.D. p. 134

১৬১ নীহার রঞ্জন রায় , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩ ও ৫৩৭

১৬২ নীহার রঞ্জন রায় , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩৭

১৬৩ Ain-i-Akbari of abul Fazal, Vol. II, Ibid, p. 136

Dhaka University Institutional Repository

১৬৪ জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১০

১৬৫ J.N. Das Gupta , op. cit. p. 105

১৬৬ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩

১৬৭ J. C. Shing, Economic Annals of Bengal, London, 1927, p p. 35-36

১৬৮ Chinese Accounts, বিশ্বভারতী এ্যানালস, পৃ. ৯৬-১৩৪

১৬৯ Imperial Gazetteer of India,Vol. IV, New Delhi, p.205, K.M. Ashraf , op. cit. p. 96

১৭০ Ain-i-Akbari of Abul Fazal (tran.Jarrett), Vol. II, op. cit., p. 136

১৭১ Chinese Accounts and Ain-i-Akbari of Abul Fazal. Vol. II, (tran. Jarrett), Calcutta, 1949, A.D. Ibid, p. 136

১৭২ Ain -i-Akbari of Abul Fazal. Vol. II, (tran. Jarrett), Ibid, pp. 136-38

১৭৩ Ibid, pp. 135-137

১৭৪ Ibid, pp. 136-38

১৭৫ ইবনে বতুতা, এন.কে. ভট্টাশালীর Coins and Chronology -তে অনূদিত ও প্রকাশিত উদ্ধৃতি, পৃ. ১৪২-৪৩

১৭৬ বিশ্বভারতী এ্যানালস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৯৯-১৩২

১৭৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১৩২

১৭৮ Ain -i-Akbari of Abul Fazal. Vol. I, (tran. Jarrett), Ibid, p. 130

১৭৯ বার্নিয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৪

১৮০ Chinese Accounts ,বিশ্বভারতী এ্যানালস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৯৬-১৩৪

১৮১ M.L. Dames, op. cit, pp. 145-46

১৮২ K.M.Ashraf, op. cit. p. 97

১৮৩ আমির খসরু, কিরান-উস-সাদাইন, মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল কর্তৃক সম্পাদিত, আলীগড়, ১৮১৮, পৃ. ৩২-৩৩ ও ১০০-১০১

১৮৪ Ain -i-Akbari of Abul Fazal. Vol. II, (tran. Jarrett) , op. cit, p. 136

১৮৫ Mirza Nathan, op. cit. p. 43

১৮৬ J.C. Shing, op. cit. p. 34

১৮৭ কৃত্তিবাস , রামায়ন, কলিকাতা, ১৯২৬, পৃ. ২৫

১৮৮ ইবনে ফজলুল্লাহ্ আল-উমারী, মাসালিক আল-আবসার, অধ্যাপক আঃ রশীদ কর্তৃক অনূদিত, পৃ. ১৭

১৮৯ J.N. Das Gupta, op. cit, p. 17

১৯০ হিন্দি ভাষায় 'মফল্ল' অর্থ কুমীর, দ্রঃ New Hindustani English Dictionary

১৯১ R.K. Mukherjee, A History of Indian Shipping, Orient Longmans, Calcutta, 1957, p. 158

১৯২ Ibid, p. 159

১৯৩ Ibid, p. 159

১৯৪ M.L. Danes, op. cit., p. 145

১৯৫ J.N.Das Gupta , op. cit., p. 117

১৯৬ J. C. Shinha, op. cit., p. 36

১৯৭ N.K. Bhattasali, op. cit., p. 171

১৯৮ K.M. Ashraf, op. cit., p. 102.

১৯৯ বার্নিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮-৩৯

২০০ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯০১, পৃ. ২৩৩

২০১ বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৬১

Dhaka University Institutional Repository

২০২ বার্নিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮-৩৯

২০৩ M L. Dames, op. cit., p. 144

২০৪ বিশ্বভারতী এ্যানালস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৯৬-১৩৪

২০৫ S. Purchas , Purchas His Pilgrims, Vol. IV, Glasgow, 1906, p. 183

২০৬ Ain-i-Akbari of Abul Fazal, Vol. II, (tran. Jarret), op. cit, p. 137

২০৭ M.L. Dames, Ibid, p. 41

২০৮ S. Purchas , Ibid, p. 185

২০৯ বিশ্বভারতী এ্যানালস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫,পৃ. ৯৬-১৩৪

২১০ M.L. Dames, Ibid, p. 411

২১১ Ibid, pp. 136-147

২১২ নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩; R. K. Mukherjee, op. cit., p. 157

২১৩ S. Purchas, Ibid, p. 182

২১৪ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীকাব্য, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯১

২১৫ বার্নিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭-৩৮

২১৬ বার্নিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭

২১৭. বার্নিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯

২১৮ বার্নিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০

২১৯ বার্নিয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০ ও ৩৮

২২০ দ্বিজ বংশীদাস , মনসামঙ্গল , দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৮০-৩৮৯ এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তী , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

২২১ বিশ্বভারতী, এ্যানালস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৯৪-১৩৬

২২২ আলেকজাণ্ডার ডৌউ - Indoostan, p. cxii, Sink: যে পাত্রে কিছু রাখলে বা পড়লে তা অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন- Washbasin,

২২৩ Mahuan's Accounts, in N.K. Battashali , Coins and Chronology, etc., op. cit, p. 169

২২৪ J.N. Das Gupta, op. cit., p. 117

২২৫ M.L. Dames, The Book of Duarte Barbosa, Vol. LXI, op. cit., p. 135

২২৬ এক রাতল = সেকালের ১ মণ = ২৮ পাউন্ড - বর্তমানের ১৪ সের। দিনার (স্বর্ণ) = ১০টি রৌপ্য দিনার। রৌপ্য দিনার = ৮ দিরহাম- প্রায় ১ টাকা

২২৭ মূল্য তালিকায় আমি সেকালের ১৪ সেরের মণকে বর্তমানের ৪০ সেরের মণে রূপান্তরিত করেছি। ৬৪ জিতলে ১ টাকার ভিত্তিতে আমি জিতলকে টাকায় পরিণত করেছি। জিতলের মূল্য টাকায় ৪৮ জিতল হতে ৬৪ জিতল পর্যন্ত উঠানামা করতো। ফিরিস্তার মতে (Vol. I, p. 199) ১ তংকা ছিল ৫০ জিতলের সমান। K.M. Ashraf, op. cit. p. 251

২২৮ বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যভাগবত, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪০, পৃ. ৯৫-৯৬

২২৯ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫-৫৬

২৩০ দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩

২৩১ Abul Fazal (A' in Vol. I, p. 138), Says that following system of cowries prevailed in Bengal :

4 cowries	= 1 ganda
5 gandas	= 1 budi
4 budis	= 1 pan
16 (or 20) pans	= 1 Khawan (Kahan)
10 Kahans	= 1 rupee

২৩২ নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

২৩৩ Muhammad Abdur Rahim , op. cit, pp. 408-409

২৩৪ Ain-i-Akbari (tran. Blochmann), Vol. I, pp. 235-236

২৩৫ Ibn Battuta's Accounts, in N.K. Bhattashali, Coins, etc, op. cit. p. 169; 'মাসালিক আল-আবসার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, খন্দাই নামে এক ব্যক্তি ও তার তিন বন্ধু একটি জিতল দিয়ে ভুরি ভোজন করে। এতে ছিল কাবাব করা গো-মাংস, রুটি ও মাখন। ১ জিতল ছিল ১ টাকার $\frac{১}{৬৪}$ ভাগের সমান। K.M. Ashraf,op. cit, p. 131

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর জীবন কথা

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর জীবন কথা

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) (১৩৭৯-১৪৫৯ খ্রি:) বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। বাংলার প্রতিটি মানুষের মনে তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। এদেশে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে তিনি এক যুগান্তরকারী অবদান রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ইসলাম প্রচারক, সমাজসেবী, সুশাসক, সাহসী বীর ও মহান সাধক। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে ইসলামি শাসন সম্প্রসারণ ও বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় তিনি ভাঁটি অঞ্চল তথা দক্ষিণবঙ্গের যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং এগুলোর পার্শ্ববর্তী এলাকা শাসন করতেন।[১] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর জীবন ছিল অত্যন্ত কর্মমুখর। তাঁর জীবন আমাদের জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দিশারী।

নাম

বাগেরহাটে তাঁর সমাধি গাত্রে আরবী ভাষায় খোদিত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, এই সূফী সাধকের পূর্ণ নাম "উলুগ খানুল আ'যম খান জাহান আলাইহির রাহ্‌মাত"। অনুসন্ধান করে দেখা যায়, কোন স্থানেই তাঁর নামের শেষে 'আলী' শব্দটি নেই। লেখা রয়েছে "আলাইহির রাহ্‌মাত" হয়তো বা কালক্রমে লোকমুখে "আলাইহি" শব্দটি অপভ্রংশ হয়ে "আলী" তে পরিণত হয়েছে । এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাধিতে "হযরত" কথাটিও উল্লেখ নেই। তবে পরবর্তীতে জনসাধারণের মাঝে হযরত খান জাহান আলী প্রচলিত হয়ে আসছে। আর উলুগ[২] ও খানুল আযম[৩] তাঁর পদ মর্যাদা জ্ঞাপন সম্মানসূচক উপাধি। এছাড়া মাযার গাত্রে তাঁর নামের পূর্বে কতকগুলো খেতাব ব্যবহৃত হয়েছে । তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. আল মুহিব্বু-লে আওলাদে সাইয়্যেদিল মুরসালিন।
২. আল মুখলিসু লিল উলামায়ির রাশিদীন
৩. আল মুবগিদু লিল কুফ্‌ফারি ওয়াল মুশরিকীন
৪. আল মু'য়ীদু লিল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন
৫. আল মুহ্‌তাজু ইলা রাহ্‌মাতি রাব্বিল আ'লামীন।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য এ খেতাবগুলোতে তাঁর আত্মিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন রাসূল (সা:) এর আশিক। রাসূল (সা:) এর বংশধরদের ভালবাসতেন। আলিম বা বিদ্বানগণের সাহায্য করতেন। কাফির ও মুশরিকরা তাঁকে শত্রু ভাবতেন। বিশেষ করে তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ খাদিম। তাঁর এ দিকগুলো আধ্যাত্মিক দিক। কিন্তু এ মহান সাধকের স্বীয় লৌকিক পরিচয়টুকু গোপন রেখে গেছেন। যেমন - তাঁর মাতা-পিতার নাম এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন প্রভৃতির বিবরণ সমাধি লিপিতে লেখা নেই।[৪]

ঐতিহাসিকগণ তাঁর জীবন কথা আলোকপাত করতে গিয়ে কেবলমাত্র এ মন্তব্যই করেছেন যে, "তাঁর জীবনের পূর্ববর্তী পরিচয় অত্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন"।[৫]

জন্মস্থান ও প্রাথমিক জীবন

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর প্রকৃত জন্মস্থান কোথায় তা নিয়ে অনেক মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ এ.কে.এম.আইয়ুব আলী (মৃ.১৯৯৫) সাহেবের মতে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ১৩৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্কে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] এম.এ. জলীলের মতে তিনি ইয়ামন দেশীয় সওদাগর। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-পরিজনসহ দিল্লীতে আগমন করেন।[৭] উলুগ তুর্কী শব্দ, এর অর্থ নেতা বা সরদার, এছাড়া দলপতি ও আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর খানুল আ'যম তুর্কী ও ফার্সি ভাষায় উলুগ শব্দের সমার্থবোধক।[৮] সমাধিতে তাঁর নামের পূর্বে "উলুগ" শব্দটি বিদ্যমান এবং সমাধির কাতাবাগুলো অর্থাৎ লেখনীগুলো মসজিদের মডেল ও তুর্কীদের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ। "উলুগ" শব্দ দ্বারা অনুমিত হয় যে, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) মূলত তুর্কী বংশোদ্ভূত।[৯]

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তুরস্কের খাওয়ারিজিম (বর্তমান নাম) খিবায় জন্মগ্রহণ করেন।[১০] সেখানে তিনি ছাড়া আরও অনেক মনীষীদের জন্ম হয়েছে বলে পূর্ব থেকেই এ স্থানটি প্রসিদ্ধ। খান জাহান আলাইহির রাহ্‌মাত, তুরস্ক, ইয়ামন বা নবীপুর যে স্থানের বাসিন্দাই হোন না কেন, তিনি সারা জীবন ধরেই 'বঙ্গের ইতিহাসে সাধারণত খান জাহান আলী এবং দক্ষিণবঙ্গের জনগণের মধ্যে পীর খাজ্জালী নামে সমধিক পরিচিত'।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

তাঁর বাল্য নাম ছিল শেরখান বা কেশর খান।[১২] তাঁর বাল্য নাম যদি শেরখান বা কেশর খান থেকেও থাকে কিন্তু সে নামের আজ কোন অস্তিত্ব নেই বা ঐ নাম ঐতিহাসিক সূত্রে আমাদের কোন সাহায্য করে না; সুতরাং সমাধিতে যে নাম পাওয়া যায় তা হচ্ছে "খানুল আ'যম খান জাহান আলাইহির রাহমাত"। এ নামটিতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাঁর পিতার নাম আজর খান এবং মাতার নাম আমিনা বিবি।[১৩]

ইখতিয়ার উদ-দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর অভিযানের বেশ পরে তথা চৌদ্দ শতকের শেষের দিকে খান জাহান আলী বাল্যাবস্থায় দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় তাঁর পিতা-মাতার সাথে প্রথমে দিল্লীতে এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর গৌড়ে আগমন করেন।[১৪] তাঁর পিতা ইতিহাসে তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তবে তিনি বিদ্বান ছিলেন। আর গৌড়ের রাজ পরিবারে তিনি গৃহ শিক্ষকের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল গৌড়ের নিকটবর্তী নবীপুর।[১৫] তাঁর পিতা তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রখ্যাত অলী হযরত নূর কুত্বুল আলমের[১৬] মাদ্‌রাসায় পাঠান এবং তিনি আরবী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন । তিনি সেখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাঁর পিতা (১৩৮৯ খ্রি:) ইন্তেকাল করেন।[১৭] তখন তাঁর মাতা তাকে বহু কষ্টে লালন-পালন করতে থাকেন।[১৮] এমনকি খান জাহান আলী মাদ্‌রাসা থেকে বাড়ি ফেরার পর তাঁর মাতা তাকে সময় মত খানা দিতেও অনেক সময় ব্যর্থ হতেন। ফলে তিনি লেখা-পড়ার ফাঁকে ফাঁকে শ্রমিকের কাজও করতেন।

এই পরিস্থিতিতে একদিন হযরত খান জাহান আলী (রহ:) বাদশাহ্ হোসেন শাহের[১৯] নজরে পড়ে যান। তাঁর বুদ্ধিমত্তা দেখে বাদশাহ্ মুগ্ধ হন। তখন তিনি তাকে তাঁর মায়ের নিকট নিয়ে আসেন এবং অনেক বুঝিয়ে তাকে তাঁর সাথে নিয়ে যেতে রাজী করায়ে রাজ দরবারে নিয়ে আসেন।[২০] তিনি সেখানে প্রতিপালিত হতে থাকেন। হোসেন শাহের মৃত্যুর পর রাজ দরবারের লোকেরা তাঁর সাথে বিদ্রূপাত্মক আচরণ করতে থাকেন। এমনকি তার মাতার জন্য রাজদরবার কর্তৃক বেতন ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সকল ঘটনা খান জাহান আলী তার ওস্তাদ নূর কুত্বুল আলমের নিকট বর্ণনা করেন। মুরশিদ তার কষ্ট ক্লেশ উপলব্ধি করেন এবং জৌনপুরের প্রতাপশালী সুলতান ইব্‌রাহীম শর্কীর নিকট পত্রসহ প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি খান জাহান আলীর সৎচরিত্র ও প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন।[২১]

কর্মজীবন

চিঠি পাওয়া মাত্র তিনি খান জাহানকে একজন সাধারণ সৈনিক পদে নিয়োজিত করেন।[২২] আর এ কাজের মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র-ভদ্র, কর্মঠ, বিচক্ষণ, জ্ঞানী ও অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি, ঠিক সে কারনেই অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি তাঁর আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে একজন সাধারণ সৈনিক থেকে প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি জৌনপুরের প্রধান সেনাপতি থাকা কালীন সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো যে, তখন গৌড়ের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ছিল বড়ই করুণ ।

ইতিহাসের সাক্ষ্য যে, ইলিয়াস শাহী সুলতান সিকান্দর শাহের (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রি:) মৃত্যুর পর বাংলার মুসলিম রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে সুলতান দরবারে বহু হিন্দু কর্মচারী শক্তিশালী জমিদার হিসেবে আবির্ভূত হয়। অবশ্য সুলতান গিয়াসউদ্‌দীন আজম শাহ পর্যন্ত মুসলিম শক্তি কোন রকম টিকে ছিল। তাঁর মৃত্যুর (১৪১০-১১ খ্রি:) পর তাঁর পুত্র সাইফ উদ্‌দীন হামজা শাহ্ (১৪১১-১২ খ্রি:) সিংহাসন লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বল চেতা ছিলেন। রাজা গণেশের ষড়যন্ত্রে সুলতানের ক্রীতদাস শিহাব উদ্‌-দীন হামজা শাহ্‌কে হত্যা করেন। ক্রীতদাস শিহাব উদ্‌-দীন প্রভু হামজা শাহ্‌কে হত্যা করে শিহাব-উদ্‌-দীন বায়েজীদ শাহ্ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন।[২৩] ১৪১২-১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কম বেশি তিন বছর রাজত্ব করেন । গণেশের চক্রান্তে তিনিও আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। অতঃপর বায়েজীদের পুত্র আলাউদ্‌-দীন ফীরূজ শাহ্ উপাধি নিয়ে রাজ সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্ব ছিল ক্ষণস্থায়ী; মাত্র কয়েক মাস পরে গণেশ সিংহাসনের লোভে তাকে হত্যা করে। সুতরাং ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ দুই সুলতান এবং ক্রীতদাস সুলতান শিহাব উদ্‌-দীন বায়েজীদ ও তাঁর পুত্র সুলতান আলাউদ্‌-দীন ফীরূজ শাহ সর্বমোট চারজন (৪ জন) সুলতান স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যে চক্রান্তের শিকার হয়ে গণেশের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেন।[২৪]

এহেন সুবর্ণ সুযোগে গৌড়ের শক্তিশালী জমিদার গণেশ[২৫] ১৪১৭ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করেন। আর বাংলায় দুইশত বছরেরও বেশি প্রাচীন মুসলিম শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন।[২৬] আর সাথে সাথে তিনি মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালাতে থাকেন।

ইতিহাসের পাতায় পরিলক্ষিত হয় যে, ইসলামকে বাংলার বুক থেকে মুছে ফেলার মানসে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তখন খাড়া হয়েছিলেন কেবলমাত্র "রাজা কানস" ।[২৭] আরও জানা যায়, রাজা গণেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার তথা নিপীড়ন করেছিলেন। জনৈক ইংরেজি প্রবন্ধকার বলেন, "Raja Gonesh was not a clear minded man. He had not made himself Muslim but his son."

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ঃ- রাজা গণেশের মন পরিষ্কার ছিল না। কারণ তিনি নিজে মুসলমান না হয়ে কুমতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে তার এক পুত্রকে মুসলমান করেন। এরও একমাত্র কারণ হলো তার পুত্রকে মুসলমান না করলে তিনি নিজে প্রাণ ভিক্ষা পান না।

এ প্রসঙ্গে ''রিয়াজুস সালাতীনে'' বলা হয়েছে, তিনি (গণেশ) সিংহাসনে আরোহণ করে নির্যাতন করেন এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাদের জ্ঞানী ও ধর্ম ভক্তদের অনেককে হত্যা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য থেকে ইসলামকে সমূলে উৎপাটিত করা । কথিত আছে যে, একদিন শায়খ মুঈন উদ্-দীন আব্বাসের পিতা শায়খ বদরুল ইসলাম অভিবাদন না করেই তাঁর সম্মুখে বসেন এবং বলেন, 'বিধর্মীদের অভিবাদন করা জ্ঞানীদের নিকট শোভনীয় নয়, বিশেষ করে তোমার মত নিষ্ঠুর এবং রক্ত-পিপাসু বিধর্মী যে মুসলমানদের রক্তপাত করেছে। এ কথা শুনে রাজা গণেশ নির্বাক ও নীরব থাকেন, কিন্তু কৌশলে এ অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একদিন সরু এবং নিচু দরজা বিশিষ্ট এক ঘরে শায়খকে আহ্বান করেন। সেখানে শায়খ পৌঁছে রাজার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। প্রথমে তিনি পা ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেন এবং পরে মাথা নত না করেই ঘরে প্রবেশ করেন। এতে করে রাজার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে রাজা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। তিনি শায়খকে তাঁর ভাইদের সাথে একই সারিতে পাঠাবার নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ শায়খকে হত্যা করা হয় এবং অন্যান্য জ্ঞানী ও গুণীজনকে নৌকায় নিয়ে নদীতে ডুবিয়ে মারা হয়।[২৮]

মহান দরবেশ (নূর কুত্বুল আলম) জৌনপুরের শর্কী সুলতান ইব্রাহীমকে লিখে জানান যে, 'কান্স (গণেশ) নামক এ দেশের শাসনকর্তা একজন বিধর্মী। তিনি অত্যাচার করছেন এবং রক্তপাত করছেন। তিনি অনেক জ্ঞানী এবং পুণ্যাত্মাকে হত্যা করেছেন। তিনি এখন অবশিষ্ট মুসলমানকে হত্যা করার এবং ইসলামকে এ দেশ হতে ধ্বংস করার মনস্থ করেছেন। যেহেতু মুসলমানদেরকে সাহায্য করা এবং রক্ষা করা মুসলমান রাষ্ট্রনায়কের অবশ্য কর্তব্য, সেহেতু আমি এই কয়েক ছত্র লিখে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি। এ দেশের বাসিন্দাদের খাতিরে এবং আমাকে বাধিত করার জন্য আমি এখানে আপনার শুভাগমন প্রার্থনা করছি; যাতে মুসলমানেরা এই অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পায়, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'[২৯]

সুলতান ইব্রাহীম চিঠি পেয়ে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে খোলেন এবং পাঠ করেন। কাজী শাহাব উদ্-দীন জৌনপুরী ছিলেন সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুলতান ইব্রাহীম তাঁকে খুবই সম্মান করতেন এবং উৎসবাদিতে রৌপ্য নির্মিত আসনে উপবেশন করাতেন। আর তিনি সুলতানকে

Dhaka University Institutional Repository

বললেন, 'আপনার শীঘ্রই যাত্রা করা উচিত, কারণ এ অভিযানে জাগতিক এবং পারলৌকিক সুফল পাওয়া যাবে - এতে জয় হবে বঙ্গদেশ; জাগতিক এবং পারলৌকিক শুভের উৎস নূর কুত্‌বুল আলমের সাথে আপনার দেখা হবে এবং মুসলমানদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়ে আপনি পবিত্র কাজ সম্পাদন করবেন'।[৩০] অপরদিকে সুলতান এ ব্যাপারে জ্ঞানতাপস সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীকে তাঁর উপদেশ চেয়ে পাঠান। সুলতানের চিঠির উত্তরে সৈয়দ সিমনানী বাংলার মুসলমানদের উপর গণেশের নিপীড়ন, নিষ্পেষণ জুলুম-নির্যাতনের জন্য দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে, সূফী-দরবেশের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য সুলতানের শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। অবিলম্বে তিনি বাংলা অভিযানের জন্য সুলতানকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সাফল্য কামনা করে লিখেন[৩১] সিমনানী আরও বলেন, 'কানসের (গণেশের) জোর করে ক্ষমতা দখল করার বিরুদ্ধে আপনার সাহায্য চেয়ে হযরত নূর কুত্‌বুল আলম যে পত্র লিখেছেন, এর সার-সংক্ষেপ হচ্ছে প্রায় ৩০০ বছর পরে ইসলামি ভূমি বাংলাদেশে বিশ্বাস (ধর্ম) ধ্বংসকারী কাফিরদের অমানিশার ছায়া পড়াতে দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। অমর্যাদার মাঝে নিপতিত হয়েছেন মুসলমানগণ । দেশের প্রত্যেকটি কোণে ইসলামের প্রদীপ তার জ্যোতির বিকিরণ করে আসল পথ প্রদর্শন করতে কানস রায় অবিশ্বাসের যে ঝড় বইয়ে দিয়েছে তাতে তা নিভে গেছে। আপনার বিজয়ী সেনাবাহিনীর একজন অগ্নি দিয়ে নূরী (নূর কুত্‌বুল আলম) আর শায়খ হুসায়নীর (অন্য একজন দরবেশ) প্রদীপকে জ্বালিয়ে দিন।

যখন ইসলামের পাদ-পীঠের এ পরিস্থিতি তখন আপনি কেন শান্ত ও সুখী মনে সিংহাসনে বসে আছেন ? উঠুন এবং এগিয়ে আসুন ধর্মের মাধ্যমে। যখন এত শক্তি রয়েছে আপনার, তখন এ কাজ করা অবশ্য কর্তব্য আপনার। 'সাহেবে কিরান (দু'শতাব্দীর প্রভু) আমীর তৈমুর কেন দিল্লীর সাম্রাজ্য জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন? এর কারণ ধর্মের ফতোয়াই নয় কি ? তিনি দু' তিনটি খারাপ জিনিস দেখেছিলেন বিধায় দিল্লীর মত এমন একটা জনাকীর্ণ শহর ধ্বংস করেছিলেন। আপনি স্বয়ং হিন্দুস্তানের সাহেবে কিরান। তবুও যে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় বাংলাদেশ ধ্বংস হচ্ছে, আপনি তা সহ্য করছেন। সেখানে কাফেরের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর আপনি তলোয়ার খাপে ভরে রেখেছেন আপনার। কোন বন্ধু এ রকম ব্যাপার হতে যে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন, তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।' ' স্বর্গ বলা হয় বাংলাদেশকে ; কিন্তু তা আজ নরকের ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। প্রত্যেকের উপর এ রকমের অত্যাচার তথা নিপীড়ন করা হচ্ছে বলেই তা বিকীর্ণভাবে বর্ণনা করা দুষ্কর। সিংহাসনে বসে আর এক ঘণ্টাও বিশ্রাম করবেন না। আসুন, আর আপনার অসি দিয়ে বিধর্মীকে উচ্ছেদ করুন। এ হলো মহান দরবেশ নূর কুত্‌বুল আলমের পত্রের মর্ম,

Dhaka University Institutional Repository

যে চিঠি আপনি পেয়েছেন। আপনি লিখেছেন যে, আপনার অসংখ্য দিগ্বিজয়ী সৈন্যকে বাংলা আক্রমণের জন্য সমবেত করেছেন আপনি। এ সম্পর্কে আমার অভিমত প্রকাশ করা উচিত। আমি আপনার সাফল্য কামনা করি।'[৩২]

সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর এ ধরনের পত্র হতে বোঝা যায় যে, রাজা গণেশের কর্মকাণ্ডে মুসলিম সাধু, সন্ত ও সূফী সাধকগণ কতদূর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নূর কুত্‌বু আলমের পত্র পেয়ে সুলতান ইব্‌রাহীম স্বয়ং সিমনানীর নিকট তার পরামর্শ চেয়ে একখানা পত্র লিখেন এবং সুলতানের নিকট সিমনানীর লিখিত পত্রখানা এরই জবাব। যাতে অবিলম্বে সুলতানকে বাংলায় অভিযান পরিচালনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং সাফল্য কামনা করেন সুলতানের। আরও তিনি বলেন, 'ধার্মিক রাজাদের পক্ষে ইসলাম ধর্ম রক্ষার জন্য সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করার চেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছুই নেই। ... ... সকল প্রশংসা আল্লাহর। কি চমৎকার এ বাংলাদেশ! এখানে নানা দেশ থেকে অনেক সূফী সাধক আউলিয়া এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। শুধু নগর নয়, সমগ্র বাংলাদেশের এমন কোন শহর বা গ্রাম নেই যেখানে এ সকল সূফী দরবেশ পদার্পণ করেন নি এবং বসতি স্থাপন করেন নি। সুহরাওয়ার্দীয়া তরিকার বহু সূফী-দরবেশ ইহধাম ত্যাগ করে আছেন, কিন্তু যারা এখনো জীবিত আছেন, তাঁদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তাদের সন্তানাদিকে বিশেষ করে নূর কুত্‌বুল আলমের ছেলেকে এবং পরিবারকে যদি দুরাত্মা বিধর্মীদের কবল হতে উদ্ধার করা যায় তাহলে খুবই ভাল কাজ হবে।'[৩৩] ইব্‌রাহীম শর্কীকে এ চিঠি লেখার পর আশরাফ সিমনানী বাংলার সুবিখ্যাত দরবেশ শায়খ হুসায়ন যোক্‌কার পোশ[৩৪]-কে সান্ত্বনামূলক একখানা পত্র লিখেছিলেন এই বলে, "আশা করা যাচ্ছে যে অতীতের সোহ্‌রাওয়ার্দী ও রুহানি গোষ্ঠীর দরবেশদের আত্মার আধ্যাত্মিক মহিমায় অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের রাজ্য হতভাগ্য অবিশ্বাসীদের হাত থেকে মুক্ত হবে। আপনাদের সাহায্য করবার জন্য রাজার সৈন্যবাহিনী এখান থেকে যাচ্ছে; এর ফল শীঘ্রই বোঝা যাবে।"[৩৫] তিনি আরও একটি চিঠি লিখেন শায়খ নূর কুত্‌বুল আলমকে। এ চিঠিখানা পূর্বের দু'খানা চিঠির সামান্য পরে লেখা হয়েছে, কারণ এতে আশরাফ সিমনানী বলেছেন যে, ইতোমধ্যে ইবরাহীম সসৈন্যে বাংলার দিকে রওনা হয়ে গেছেন। এ চিঠির কতকাংশ উল্লেখ করছি ঃ-

"কাফের কান্‌সের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ এবং হতভাগ্য কান্‌সরূপ প্রচণ্ড ঝড়ে 'ভগবানের সন্তানদের' (অর্থাৎ মুসলমানদের) বাসস্থানের ধ্বংসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন সে সম্বন্ধে সবই স্পষ্ট হয়েছে। প্রসিদ্ধ আলায়্যা এবং খালিদিয়া বংশের লোকেরা যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার ও অত্যাচার সহ্য করেছেন তা জানলাম। সুলতানের ধবজা এবং তার সৈন্যবাহিনী ইতোমধ্যেই ঐ প্রিয়জনের

Dhaka University Institutional Repository

দেশের দিকে রওনা হয়েছে। সুলতান তাঁর অসংখ্য সৈন্যবাহিনী দ্বারা কাফেরদের তাড়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আশা করা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা কান্স রায় এবং তার লোকদের কবল থেকে মুক্তি পাবে।"[৩৬]

অতএব, উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে, রাজা কান্স ক্ষমতার রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়েই তার প্রতিপক্ষ বিরোধীদের প্রতি যে দমন নীতি প্রয়োগ করেছিলেন, মুসলমান সূফী-দরবেশদের উপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছিলেন এতে সূফী-দরবেশগণ খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ জৌনপুরের সুলতানকে বঙ্গ অভিযানের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। উপযুক্ত সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে এই আহ্বান খুবই যথার্থ ছিল। আর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুলতানের বঙ্গদেশ আক্রমণ হয়েছিল যথার্থ।

সুলতান ইবরাহীম শর্কী নূর কুত্বুল আলমের আহ্বানে এবং সৈয়দ আশরাফ সিমনানীর অনুপ্রেরণাপূর্ণ উপদেশ পেয়ে বাংলায় ছুটে আসেন। কিন্তু ইব্রাহীম শর্কী মিথিলা বা ত্রিহুতের উপর দিয়ে বাংলায় আসার পথে রাজা শিবসিংহ তাকে বাঁধা দেন। ফলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। এতে শিবসিংহ ভীষণভাবে পরাজিত হন। শিবসিংহও গণেশের মত মুসলমানদের প্রাধান্য হ্রাস করে হিন্দু অভ্যুদয় ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। খুব সম্ভব ত্রিহুতের দরবেশরা নূর-কুত্বুল আলম প্রভৃতির পক্ষ নিয়েছিলেন বলে গণেশের অনুরোধে শিবসিংহ তাদের দমন করেছিলেন। ... ... পূর্ব ভারতের দু'স্বাধীন চেতা হিন্দু রাজা মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং গণেশের বিপদে সাহায্য-সহযোগিতা করতে গিয়ে শিবসিংহ স্বয়ং চরম বিপদ বরণ করেছিলেন, সমসাময়িক ইতিহাসে এ ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৭] যাহোক মোল্লা তাকিয়ার 'বয়াজ' বা পাঁচ মিশালী সংগ্রহ গ্রন্থে যা লেখা আছে তার অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"যখন হিন্দু জমিদার কান্স সমগ্র বাংলা প্রদেশের উপর আধিপত্য অর্জন করলেন, তিনি মুসলমান নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প করলেন এবং তাঁর রাজ্য থেকে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর লক্ষ্য। এই সময়ে ত্রিহুতের জমিদার শিওসিংহ (শিবসিংহ) তার পিতা ত্রিহুতের রাজা দেব সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং রাজা কান্সের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজে ত্রিহুত প্রদেশের স্বাধীন রাজা হয়ে বসেছিলেন। নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে তিনি রাজা কান্সের প্ররোচনায় তাঁর রাজ্যের মুসলমানদের উপরে লুটপাট চালাতে লাগলেন, দারভাঙ্গার অধিকাংশ ধর্ম প্রচারক ও ইসলামের নায়কদের শহীদীর পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করালেন এবং পবিত্রাত্মা মখদুম শাহ্ সুলতান হোসেনকে আঘাতের পরিকল্পনা করলেন। এ সময়ে মখদুম শাহ্ ছিলেন পাণ্ডুয়ার আলা-উল-হকের শিষ্য, আলা-উল-হকের সুযোগ্য পুত্র নূর কুত্বুল আলমের অনুরোধে সুলতান ইব্রাহীম শর্কী বাংলার দুর্বৃত্ত কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এবং রাজা কান্সকে দমন করার

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে ৮০৫ হিজরায়[৩৮] এক সৈন্যবাহিনী পাঠান। রাজকীয় সৈন্যবাহিনী যখন ত্রিহুতে পৌছালো, শিওসিংহ (শিবসিংহ) তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। যদিও সুলতান বাংলার দিকে যাচ্ছিলেন, তিনি যখন খবর পেলেন শিওসিংহ (শিবসিংহ) তাঁর তাঁবুর কাছাকাছি পৌছেছেন, তখন সুলতানের রোষানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং তিনি খুব সাহস নিয়ে তাঁর দিকে মন দিলেন। শেষে শিওসিংহ (শিবসিংহ) বুঝলেন প্রকাশ্য সংগ্রামে ইব্রাহীমের বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি পালিয়ে অন্য দিকে গিয়ে অবশেষে সেখানকার সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ লেহরায় পৌছে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিছু সময় পরে ঐ দুর্গের পতন ঘটল এবং তিনি বন্দী হলেন। সমগ্র ত্রিহুত রাজ্য আবার তাঁর পিতাকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো সুলতানের অনুগত ভৃত্য হিসেবে। যে সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল ; সেগুলো আবার খুলে দেওয়া হলো, তার ফলে সুলতান রাজা কান্সকে দমন করার জন্য বাংলার দিকে রওয়ানা হলেন। মাখদুম শাহের বাসস্থানের কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ পালিত হলো। সেটি এখনো আছে এবং তাতে এই শিলালিপি আছে ঃ

পবিত্রাত্মা রসূল বলেছেন, "যে আল্লাহর নামে মসজিদ তৈরি করে, সে স্বর্গে প্রবেশ করে। এই মসজিদ বিশ্বাসীদের প্রধান আবুল ফতেহ ইব্রাহীম শাহ্ সুলতান ৮০৫ হিজরায় নির্মাণ করেছিলেন।"[৩৯] নিঃসন্দেহে এ বিবৃতির অধিকাংশই সত্য। কেননা গণেশ ও শিবসিংহের আবির্ভাবকাল সম-সাময়িক। উভয়েই ছিলেন চিন্তাধারার দিক হতে চরম মুসলিম বিদ্বেষী। মুসলমানদের প্রাধান্য মেনে নিতে পারেন নি। নানাবিধ উপায়ে তারা মুসলমানদের প্রাধান্য বিনষ্ট করে হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। ইব্রাহীম শর্কীর সাথে শিবসিংহের সম্পর্ক পূর্ব থেকেই তেমন একটা সুখকর ছিল না। কারণ মিথিলা সুলতান ইব্রাহীমের সামন্তরাজ্য হওয়া সত্ত্বেও শিবসিংহ স্বাধীন রাজার মত স্বীয় নামে মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাছাড়া মিথিলায় প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে দিল্লীর সুলতান শিবসিংহকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হাসান আস্কারী বলেন যে, " Moulvi Muhammad Ilyas Rahman, a friend of the writer, had discovered a Bayaz of Mulla Taqyya, a courtier of Akbar and Jahangir and copied in 1023 by Mulla Abul Hasan of Darbhanga and it we find references to ' Raja Kans ' a Hindu Zaminder, acquiring as cendency in Bengal and instigating sheo Singh, the rebellious son of Devasing, the 'Raja of Tirhut to commit depredations upon the Muslims. Sheo singh is said to have killed many holy personages and contemplated a similar action against ' Makhdum shah sultan Hussain the Khalifa of Makhdum 'Ala-ul-Haq of pandua,

Dhaka University Institutional Repository

we are also told that Sultan Ibrahim Sharqi of Jaunpur, being requested by Makhdum Nur Qutbul Alam, marched against Bengal, but had to face the opposition of Sheo singh in Tirhut, the latter was defeated, pursued and captured and his stronghold, Lehra, was taken.[৪০] 'সঙ্গীত শিরোমণি'[৪১]-তে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রবীণ (ইব্‌রাহীম) প্রচুর গর্বসহকারে গর্জনকারী হস্তি, অশ্ব ও সেনারূপ মেঘ বর্ষণে সেই অগ্নিকে নিঃশঙ্কে নির্বাপণ করেছিলেন, যে অগ্নিতে শকেরা (অর্থাৎ মুসলমানেরা) শালভের মত (পুড়ে মরছিল) এবং রাজনীতিজ্ঞ[৪২]। তাঁর পুত্রকে তুরস্ক নির্মাণ করে (মুসলমান করে) গৌড় দেশকে আবার শকরাজ্যে (মুসলমান রাজ্যে) পরিণত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, গণেশকে এখানে 'অগ্নি' বলা হয়েছে।

যাহোক, ইব্‌রাহীম শর্কী শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে আনুগত্যের শর্তে ত্রিহুতের রাজপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন আর তখন তিনি শিবির তুলে যাত্রার বাদ্য বাজালেন এবং দ্রুতগতিতে যাত্রা করে স্বল্প সময়ের মধ্যে এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীসহ বঙ্গদেশে পৌঁছে ফিরোজপুর বা গৌড় এসে শিবির স্থাপন করেন। এ সংবাদ পেয়ে রাজা কান্‌স হতভম্ব হয়ে পড়েন এবং কূটকৌশলে রাজার সম্মুখ সমরে বিজয়ের সম্ভাবনা না দেখে এবং সবংশে নিধন হওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি দরবেশ নূর কুত্‌বুল আলমের নিকট উপস্থিত হয়ে বিনীতভাবে কেঁদে যা বললেন, রিয়াজুস সালাতীনে তা বলা হয়েছে এভাবে ঃ-

'প্রার্থনা করি, আপনি এই পাপীর পাপের পাতায় ক্ষমার কলম চালাবেন এবং সুলতান ইব্‌রাহীমকে এই দেশ জয় করা হতে বিরত রাখবেন।' দরবেশ উত্তর দিলেন, 'একজন অত্যাচারী বিধর্মীর পক্ষে সুপারিশ করে আমি একজন মুসলমান রাষ্ট্রনায়কের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারি না, বিশেষ করে তিনি আমার ইচ্ছা এবং অনুরোধেই এসেছেন।' নিরুপায় হয়ে কান্‌স দরবেশের পায়ে নিজ মাথা রেখে বললেন, 'দরবেশ, আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাই মেনে নিব।' দরবেশ বললেন, 'তুমি যতদিন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ না করবে, ততদিন আমি তোমার পক্ষে সুপারিশ করতে পারি না, কান্‌স এই শর্তে রাজি হলেন, ' কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে বিপথগামী করে তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেন নি। অবশেষে কান্‌স তাঁর ১২ বছর[৪৩] বয়স্ক পুত্র যদুকে দরবেশের নিকট নিয়ে আসেন এবং বলেন, 'আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করেছি, আপনি আমার ছেলেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর হাতে বাংলার রাজ্যভার দিতে পারেন।' দরবেশ নূর কুত্‌বুল আলম স্বীয় মুখ হতে কিছু চর্বিত পান নিয়ে যদুর মুখে পুরে দিলেন এবং তাকে মুসলমান ধর্মের কালেমা পড়িয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। তাকে জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ্ নাম দিয়ে এ কথা নগরে ঘোষণা করা হলো এবং রাজ্যে তাঁর নামে খোত্‌বা পাঠের ব্যবস্থা করা হলো। সেদিন থেকে মুসলিম আইনের পবিত্র ধারাগুলো আবার চালু করা হলো।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর দরবেশ নূর কুত্‌বুল আলম সুলতান ইব্‌রাহীমের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। সুলতান এ অনুরোধে বিরক্ত হয়ে জৌনপুরের রাজকীয় পণ্ডিত ও জ্ঞানী কাজী শাহাব উদ্‌দীনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি (কাজী) বললেন, 'দরবেশ, সুলতান আপনার অনুরোধেই এখানে এসেছেন। এখন আপনি আবার কান্‌সের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর প্রতিনিধিরূপে কাজ করছেন আপনার উদ্দেশ্য কি ? দরবেশ বললেন, 'আমি যখন অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তখন একজন অত্যাচারী শাসক মুসলমানদের উপর নিপীড়ন করছিলেন, এখন সুলতানের শুভাগমনের ফলে সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ আবশ্যক, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়।' কাজী কোন উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে গেলেন এবং দরবেশের কথার অবাধ্য হতে সাহস করলেন না। সুলতান ইব্‌রাহীম শর্কী ফিরে গেলে রাজা গণেশ আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি যদুকে সরিয়ে পুনরায় সিংহাসন দখল করেন এবং পূর্বের মত মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। তিনি যদুকে প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রায়শ্চিত্ত ছিল এই যে, রাজা স্বর্ণ নির্মিত গাভীর সম্মুখ দিকে যদুকে প্রবেশ করিয়ে পেছন দিকে বের করে আনে এবং গাভীর স্বর্ণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। সে যাই হোক রাজা গণেশের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পায়।[৪৫] তখন হযরত নূর কুত্‌বুল আলম তাঁকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করার মানসে পুনরায় ইব্‌রাহীম শর্কীর নিকট পত্র লেখেন। এ পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, অবশ্যই তিনি যেন একটা নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুলতান পত্র মোতাবেক তাঁর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। উল্লেখ্য যে, এ বৈঠকে তাঁরা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাতেই রাজা কান্‌স বা গণেশের পতন ঘটে।

হযরত নূর কুত্‌বুল আলমের নির্দেশ মোতাবেক বাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও ইসলাম প্রচারার্থে যে দলটি প্রেরণ করা হয়েছিল বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায় এবং সেই দলের প্রধান হিসেবে যাকে নির্বাচন করা হয় ও যিনি জৌনপুর হতে ৬০ (ষাট) হাজার সৈন্যসহ যাত্রা শুরু করে রাজা গণেশের রাজধানী গৌড়ের[৪৬] মধ্য দিয়ে বরেন্দ্রভূমি পার হয়ে বারবাজার এসে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। তিনি ইব্‌রাহীম শর্কীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছাড়া আর কেউ নন এবং তিনিই হচ্ছেন আমাদের হযরত খান জাহান আলী (রহ:)। তিনি যখন সৈন্য নিয়ে গৌড়ের দিকে আসেন তখন গণেশ সংবাদ পেয়ে দিনাজপুর পলায়ন করেন এবং ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান।

এরপর হযরত খান জাহান আলী (রহ:) গৌড়ে তাঁর মুরশিদ নূর কুত্‌বুল আলমের নিকট কিছুদিন থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য সুলতান ইব্‌রাহীম শর্কীর নিকট ছুটির আবেদন করেন। সুলতান তার

Dhaka University Institutional Repository

আবেদন মঞ্জুর করেন।[৪৭] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁর মুরশিদের নিকট ফিরে যান। নূর কুত্বুল আলম তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। ফলে তাকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হলেন এবং তাকে ইল্‌মে মা'রেফাতের কামালিয়াত ও বেলায়েত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান করেন।[৪৮] পরবর্তীতে সুলতান ইব্‌রাহীম শর্কী তাকে বার বার চাকরিতে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি আর জৌনপুরে ফিরে না যেয়ে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। আর এখানেই তাঁর সৈনিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে।[৪৯]

বিবাহ

দরবেশ নূর কুত্বুল আলম হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সততা, নিষ্ঠা , বিচক্ষণতা, বদান্যতা ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিজ কন্যার[৫০] সাথে তাকে বিবাহ দেন। বিবাহের পর কিছুদিন দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন।[৫১] ইতোমধ্যে চারিদিকে ইসলামের দুঃসময় লক্ষ্য করে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ফলে তিনি তার স্ত্রীকে শ্বশুরের খেদমতে রেখে ইসলামের সেবা, সমাজ সেবা ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।[৫২]

অন্য দিকে রাজা গণেশের (১৪১৮ খ্রি:) মৃত্যুর পর তার ছেলে জালাল উদ্‌দীন মুহাম্মদ শাহ্ রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহ্ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আর তিনি ছিলেন পিতামহের মত। ১৪৪২ খ্রিষ্টাব্দে তারই ভৃত্য সাদিখান নাসির খানের হাতে নিহত হন। এরপর গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন ইলিয়াস শাহী বংশের পরবর্তী সুলতান নাসির উদ্‌দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রি:)[৫৩] এরই সময়ে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ১১ (এগার) জন সঙ্গী ও ৬০ (ষাট) হাজার সৈন্যসহ যশোরের বায়বাজার আগমন করেন।[৫৪] আর বারবাজারে তিনি বিভিন্নমুখী জন কল্যাণকর কার্যাদি সম্পন্ন করেন। সেখান থেকে বাগেরহাটের পথে এক এক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করে তিনি তাঁর অনুসারী বিপুল সংখ্যক ভক্ত মুরীদ ও শাগরিদের সহযোগিতায় তথায় সড়ক ও পুল নির্মাণ, পুকুর-দিঘি খনন এবং মসজিদ ও মাদ্‌রাসা স্থাপন করে সকল শ্রেণীর জনগণের অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এ সকল জন কল্যাণকর কার্যাদি স্বল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতো বলে জনসাধারণ তাকে আধ্যাত্মিক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পীর-দরবেশরূপে সম্মান করতো। তাঁর নিঃস্বার্থ জনসেবায় মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় বহু হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। উচ্চ বংশীয় প্রভাবশালী কোন হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলে পীর সাহেব তাকে স্বীয় খলিফারূপে ঐ স্থানের প্রশাসনিক দায়িত্বভার তার উপর ন্যস্ত করে তিনি অন্যত্র অগ্রসর হতেন। তিনি যে স্থানে অবস্থান করতেন অল্পদিনের মধ্যে সেটা একটি জনবহুল কর্মচঞ্চল ছোট-খাট শহরে পরিণত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে যে সকল শহরের পত্তন হয় তন্মধ্যে যশোরের বারবাজার, মুড়লী কসবা, পায়গ্রাম কসবা, আমাদি (মসজিদ কুড়) ও খলিফাতাবাদ[৫৫] বা বর্তমান বাগেরহাট শহর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাকী জীবন এ স্থানে অতিবাহিত করেন। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদ সূফী সাধকগণ তাদের মুরশিদ ও পীরের আদর্শ অনুসরণে ইসলাম প্রচার, মসজিদ নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, অনাবাদী ভূমি চাষাবাদের ব্যবস্থা, বিরাট দিঘি খনন ইত্যাদি জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাগেরহাট, খুলনা ও যশোর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের নির্মিত বহু প্রাচীন মসজিদ ও খননকৃত বিশাল দিঘির চিহ্ন এখনো বিদ্যমান রয়েছে। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এভাবে তাঁর ভক্ত অনুসারীদের সাহায্য সহযোগিতায় বৃহত্তর যশোর-খুলনা অঞ্চলে ৩৬০ টি মসজিদ স্থাপন ও ৩৬০ টি বিশাল দিঘি খনন করিয়েছিলেন।[৫৬]

কথিত আছে যে, মহান সূফী সাধক হযরত খান জাহান আলী (রহ:) দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচার ও নানাবিধ জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থেকে শেষ জীবনে সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকেন এবং বাগেরহাটের সন্নিকটে স্বীয় সমাধি জীবদ্দশায়ই নির্মাণ করিয়েছিলেন। সমাধির পার্শ্বেই প্রায় সম-আয়তনের একটি মসজিদ। খুব সম্ভব তিনি এ মসজিদে মুরাকাবা ও মুশাহাদায় মগ্ন থাকতেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইন্তেকাল

সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।[৫৭] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই সূফী-সাধক ৮৬৩ হিজরির ২৬ জিলহজ্জ মোতাবেক ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর বুধবার রাতে ইন্তেকাল করেন।[৫৮] (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। মৃত্যুর পরদিন বৃহস্পতিবার বাদ আসর ৫.৩০ মিনিটে তাঁর জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে দাফন করা হয়।[৫৯] তাঁর জানাজা নামাজের ইমামতি করেন তাঁরই বন্ধু পীরালী মুহাম্মদ তাহির।

বস্তুত, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) মুসলিম বাংলার একজন সাধক, জননেতা ও মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে আজও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর জীবনকালের অমর কীর্তিরাজি অদ্যাবধি সকলকে বিমোহিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১ Johana E.Van Lohuizen de Leeuw, "The Early Muslim Monuments at Bagerhat," in George Michell (ed.), The Islamic heritage of Bengal, UNESCO, 1984, p. 167

২ উলুগঃ বাগেরহাটে অবস্থিত হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাধিতে উৎকীর্ণ প্রথম শিলালিপিতে তাঁকে "উলুগ খান জাহান" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শিলালিপিটি নিম্নরূপ ঃ

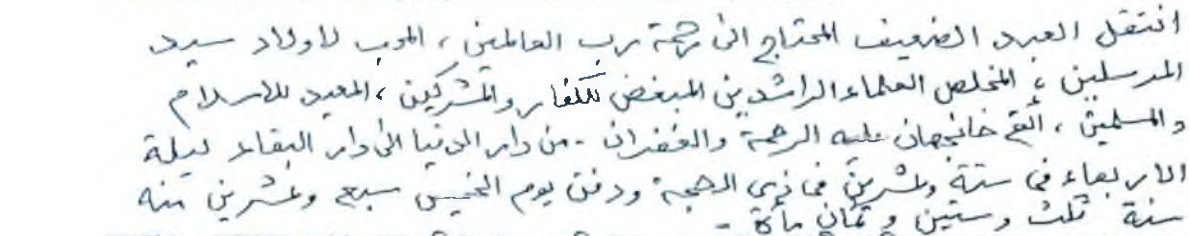

অনুবাদ ঃ আল্লাহর নগণ্য দাস, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের করুণা প্রত্যাশী প্রেরিত পুরুষ প্রবরের বংশধরদের অনুরক্ত, সৎপথগামী 'আলিমগণের একাধিক বন্ধু, কাফির ও মুশরিকদের শত্রু, ইসলাম ও মুসলিমদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকারী উলুগ খান-ই-জাহান তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক; ৮৬৩ সালের ২৬ যুল হিজজা বুধবার রাতে এই নশ্বর জগত হতে চিরস্থায়ী আবাস ভূমিতে প্রস্থান করেন এবং উক্ত মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি সমাহিত হন

Abdul Karim, Corpus of the Arabic and Persian Inscription of Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, p. 138

৩ মাযারের অন্য একটি শিলালিপিতে তাঁকে "খানুল আ'যম" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিলালিপিটি নিম্নরূপ ঃ

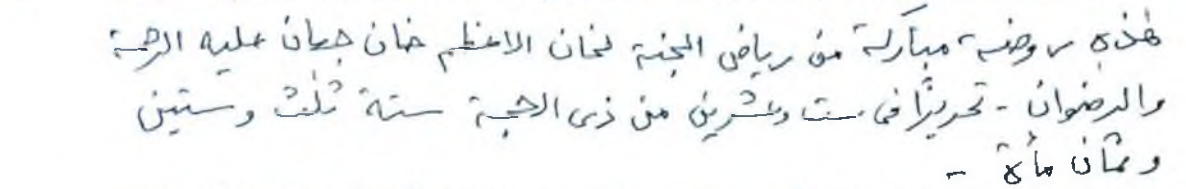

অনুবাদ ঃ এই কল্যাণময় উদ্যানটি (মাযার) জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি, মহান খান (আল খানুল আ'যম) খান-ই জাহানের (আল্লাহর) করুণা ও সন্তুষ্টি তাঁর উপর বর্ষিত হোক। এটা লিখিত হয় ৮৬৩ সালের যুল হিজ্জা; (২৩ অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রি:) Shams-ud-din Ahmad, Inscription of Bengal, Vol. IV, Rajshahi, 1960, pp. 65-66; বাংলা বিশ্বকোষ , দ্বিতীয় খণ্ড, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম (সম্পাদিত) মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২৫০

৪ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

৫ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, খানে আ'জম হজরত খান জাহান আলী (রঃ), মোয়াশেদ পাবলিকেশন, বাগেরহাট, ১৯৮২, পৃ. ২৫

৬ ডঃ এ,কে, এম, আইয়ুব আলী, খান জাহান, (ইসলামী বিশ্বকোষ, নবম খণ্ড) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫০৪

৭ এ,এফ,এম,আব্দুল জলীল, সুন্দর বনের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, লিঙ্কম্যান পাবলিকেশনস, ১ম সংস্করণ, খুলনা, ১৯৬৭, পৃ. ২৬৫; সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১

৮ ডঃ এ,কে,এম,আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৫০৪; মোঃ নুরুল ইসলাম, খুলনা জেলা, খুলনা, ১৯৮২,পৃ. ২১৫

৯ ডঃ এ,কে,এম, আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৪

১০ মোঃ আব্দুর রহিম, হযরত খানজাহান আলী, কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, বরিশাল, ১৩৮০, পৃ. ২; শেখ আব্দুল আজিজ, পীর হযরত খানজাহান আলী সাহেবের জীবনী, দি বাগেরহাট প্রেস, খুলনা, ১৯৬৬, পৃ. ১

১১ JASB, vol. xxxvi (36), part. I, Babu Gaur Dass Bysack, on the Antiquities of Bagerhat, Calcutta,1867, p. 127; W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol. II, Trubne and Co., London, 1877, p. 228, (ed.) Bangladesh District Gazetteers Khulna, K.G.M. Latiful Bari, Bangladesh Government Press, Dacca, 1978, p. 46; A Report on the District of Jessore , Mr. J.Westland, Calcutta, 1874, p. 11;

Dhaka University Institutional Repository

Bengal District Gazetteers (Jessore), L.S.S. O'Malley (ed.), The Bengal Secretariat Book Depo.,Calcutta,1912, pp. 23-24; Muhammad Abdul Bari, Khalifatabad: A study of its History and Monuments, M.Phil Thesis (unpublished), Rajshahi University, 1980 , p.39;
আ,কা,মো, যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি, ২য় খণ্ড, মুসলিম যুগ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৬; আ, ন,ম, বজলুর রশীদ, আমাদের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৩৩

১২ গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৮২; সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫; শেখ আব্দুল আজিজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১; উল্লেখ্য যে, শেখ আব্দুল আজিজ বলেন, তাঁর বাল্য নাম ছিল কেশর খাঁ এবং প্রকৃত নাম ছিল আলগ খাঁ। মূলত হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর বাল্য পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। প্রাচীন পুঁথি হতে তাঁর কিছু বাল্য পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রঃ মুহাম্মদ আবু তালিব, খুলনা জেলায় ইসলাম,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৬২, নাসির হেলাল, যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, সীমান্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৬৭

১৩ নাসির হেলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭; গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২; উল্লেখ্য যে, পিতার নাম ফরিদ খানও পাওয়া যায়। দ্রঃ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫; সম্প্রতিকালে সৈয়দ মহল্লা গ্রাম নিবাসী জনৈক খন্দকার সিরাজুল হক, খান জাহানের পিতার নাম আলী আকবর বলেছেন। দ্রঃ মুহাম্মদ আবু তালিব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২-৬৩; আর মাতার নাম আঙিনা বিবি বলেছেন। দ্রঃ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫; কথিত আছে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর মাতা আমিনা বিবিকে রাজা গণেশ অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে মারেন। কারণ তাঁর মাতা অতি পর্দানশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি ঘর থেকে বের হতেন না একারণেই গণেশ এ জঘন্য কাজ করে। দ্রঃ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

১৪ গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২; সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

১৫ গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৬ নূর কুতবুল আলম ছিলেন একজন সুবিখ্যাত সূফী-দরবেশ শায়খ আলাউল হকের সুযোগ্য পুত্র ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। পিতার মত তিনিও ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ও ইসলামি ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সুলতান গিয়াস উদ্‌দীন আ'জম শাহের সহপাঠী। তাঁরা উভয়ে শেখ হামিদ উদ্দীন গাঙ্গনসীন নাগরীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। দ্রঃ ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খড, (১২০৩-১৫৭৬ খ্রী:), মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৮৭-৮৮; গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৭ গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২, সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

১৮ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৯

১৯ বাদশাহ্ হোসেন শাহের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতদের মাঝে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তাই এ ব্যাপারে বিশদভাবে আলোকপাত করা অতীব প্রয়োজন। তাঁর শিলালিপি এবং মুদ্রার সাক্ষ্যে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন সৈয়দ বংশের লোক এবং তার পিতার নাম ছিল সৈয়দ আশরাফ আর হোসেন শাহের ১৮টি ছেলে ছিল। দ্রঃ গোলাম হোসেন সলীম, রিয়াজুস্ সালাতীন, কলিকাতা, ১৮৯৮, পৃ. ১৩৬; গনিয়েল নামক তার এক ছেলে হোসেন শাহের সিংহাসন লাভের দু'বছর পরে দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। দ্রঃ এম.আর. তরফদার, হোসেন শাহী বেঙ্গল, পৃ. ৩৮; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পৃ. ৩৬; হোসেন শাহ্ নির্জাপুর থানার টাঁদপাড়া (ব্লকম্যান সাক্ষ্য দিচেছন যে, এ টাঁদপাড়া স্থানটি ভৈরবের নিকটবর্তী আলাইপুর যা খুলনা জেলায় অবস্থিত) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে হোসেন একজন ব্রাহ্মণের অধীনে রাখালের কাজ করেন। রাজা হওয়ার পরে (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রি:) তিনি ব্রাহ্মণকে মাত্র একআনা খাজনায় গ্রামখানি দান করেন। তাই হোসেনের নাম হয় রাখাল বাদশাহ এবং গ্রামের নাম হয় একানা টাঁদপাড়া। দ্রঃ Bengal District Gazetteers, Murshidabad, L. S.S. O'Malley (ed.), Calcutta, 1914, p. 20.

২০ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

২১ গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

২২ গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

২৩ আবদুল করিম,বাংলার ইতিহাস মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭ খ্রি:] বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯,পৃ. ৭৬

২৪ Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. I.A, Muslim Rule in Bengal

Dhaka University Institutional Repository

(600-1170/1203-1757) Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, 1985, p. 152.

২৫ গণেশঃ বাংলার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার পূর্বে গণেশের পরিচয় নিয়েও পণ্ডিতদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে। রিয়াজুস-সালাতীনে বলা হয়েছে যে, তিনি ভাদুরিয়ার জমিদার ছিলেন। দ্রঃ কে.এম. রাইছ উদ্দীন খান, বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩১৪; আর এ অঞ্চলটি রাজশাহী জেলার অন্তর্গত। আবার কেউ কেউ মনে করেন তিনি ছিলেন দিনাজপুর অঞ্চলের রাজা। দ্রঃ শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ), ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১০৩-১০৪; দরবেশ নূর কুতুবুল আলমের সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, গণেশ ছিলেন একজন জমিদার। দ্রঃ কে.এম. রাইছ উদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫; আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন সমগ্র বঙ্গের শাসনকর্তা। দ্রঃ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পৃ. ১৯৭। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কানস এবং বাংলা ভাষায় গণেশ নামে সুপরিচিত। ওয়েস্টমেকট বলেন, কানস এরই সংস্কৃত মূল হলো গণেশ। ব্লকম্যান বলেন, কানস গণেশ হতে পারে না। তবে হেনরী বেভেরীজ এর মতে কানসই গণেশ। তার জাতি নিয়েও মতভেদ রয়েছে। তবে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে অনেকের অভিমত। তার মতে হিন্দু রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের একজন আমীর ছিলেন। দ্রঃ কে.এম. রাইছউদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫; আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭; শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭০; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, পাঁচ হাজার বছরের বাঙ্গলা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, কাফলী পাবলিশার্স, খুলনা, ১৩৮২, পৃ. ১৩৮; শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মধ্যযুগ, কে.বি. প্রিন্টিং, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ৪৩, মোঃ হাসান আলী চৌধুরী, বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস (মধ্যযুগ), আইডিয়াল প্রকাশনী, ১৪ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২১৯; E.V. Westmacot, Ravenshows Gaur, The Calcutta Review, vol. Lxix ,Calcutta, 1879, p. 208; Blochmann, JASB, Old Series, Vol. XLIX, 1879, part. I, p. 287; JASB, Old Series, H. Beverige, 1872, part, I. p. 118; JASB, 1898, vol. 2, part, I, p. 120

২৬ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ) পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

২৭ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

২৮ JASB, Vol. XLIV (44), part I, Calcutta, 1875, p. 287; Ghulam Hussain Salim, Riyazu-S-Salatin (trn. Abdus Salam) Idara-I-Adabiyat-i-Delhi, Riprint 1975, (First Published 1905), p. 113; Dr. Muhammad Mohar ali, Ibid, pp. 152-153; আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২২১

২৯ JASB, Ibid, p. 287; Ghulam Hussain Salim, Ibid, p.114; Dr. Muhammad Mohar Ali, Ibid, p. 153; আবদুল করিম,পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

৩০ Ghulam Hussain Salim, Ibid, p. 115; আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

৩১ আবদুল করিম পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

৩২ Prof. Hasan Askari, Bengal Past and Present, vol. 67, Serial no-130, 1948, pp.38-39

৩৩ Ibid, p. 39; শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৩৪ যোক্কারপোশ শব্দের অর্থ 'ধূলায় আবৃত'। তিনি ছিলেন নূর কুতুবুল আলমের পিতা শায়খ আলাউল হকের শিষ্য ও খলিফা। এর খানকা ছিল পূর্ণিয়াতে। পাণ্ডুয়াতে তাঁর পুত্র বসবাস করতেন এবং তিনি সেখানে রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হন। শোকার্ত পিতাকে সান্ত্বনা জানিয়ে জাহাঙ্গীর সিমনানী এ পত্রটি লিখেছেন- ফ্রান্সিস বুকাননের মতে হোসেন শাহের রাজত্বকালেও হুসায়ন যোক্কারপোশ নামে ছিলেন একজন দরবেশ। এর আচরনের ফলে হিন্দু রাজা মহেশ ঢাকায় চলে যেতে বাধ্য হন এবং এর ভাইয়ের সাথে হোসেন শাহ নিজের মেয়ের বিবাহ দেন। হুসায়ন যোক্কার পোশের সমাধি রয়েছে হেমতাবাদে

৩৫ শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৩৬ Prof. Hasan Askari, Ibid, p. 38

৩৭ শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

৩৮ এই তারিখ ভুল। এটা ভুল প্রমাণ করে শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেন, 'এই অনুচ্ছেদের শেষে যে শিলালিপি উদ্ধৃত হয়েছে, সেই শিলালিপিটি দেখেই মুল্লা তকিয়া স্থির করেছিলেন ইব্‌রাহীম ৮০৫ হিজরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ইব্‌রাহীম যে ৮১৮ হিজরা বা ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ

Dhaka University Institutional Repository

নেই। ৮০৫ হিজরায় গিয়াস উদ্‌দীন আজম শাহ্ বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন, তখন ইব্‌রাহীমের বাংলা আক্রমণের কথা উঠে না। অবশ্য ঐ শিলালিপির কৃত্রিমতা সন্দেহের অতীত। আসল কথা, মুল্লা তকিয়া জানতেন না যে, ইব্‌রাহীম শর্কী দুবার ত্রিহুতে এসেছিলেন, প্রথমবার রাজা কীর্তি সিংহের পিতৃরাজ্য অপহরণকারী আসলানকে শাস্তি দিতে, যার বর্ণনা বিদ্যাপতির কীর্তিলতায় পাওয়া যায়, আর দ্বিতীয়বার এই বাংলা আক্রমণের সময় সম্ভবত, ইব্‌রাহীমের প্রথমবারের ত্রিহুতে আগমনই ৮০৫ হিজরায় ঘটেছিল। আর সেই সময়েই তিনি এই শিলালিপি সংবলিত মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।' শ্রী মুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩, আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩

৩৯ শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪ ; আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

৪০ Prof. Hasan Askari, Ibid, p. 36

৪১ ইব্‌রাহীম শর্কীর অধীনে এলাহাবাদ থেকে পাঁচ মাইল দূরে 'কড়া' নামে একটি জায়গায় মালিক সুলুতা শাহ্যি নামে এক সামন্ত শাসন করতেন। তিনি বিভিন্ন দেশ হতে "সঙ্গীত শাস্ত্রের বই এনে সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতদের নিয়ে একখানি বই লেখান। বইখানির নাম 'সঙ্গীত শিরোমণি" ।এর রচনাকাল ১৪৮৫ বিক্রমাব্দ ও ১৩৫০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪২৮-২৯ খ্রিষ্টাব্দ। দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ কবি সর্ব প্রথম এই সূত্রটি থেকে আলোচ্য তথ্যটি আবিষ্কার করে Journal of the Andhra Research Society, Vol. XI- এ প্রকাশ করেন। পরে এ সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিশদ আলোচনা করেছেন । প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬০, পৃ. ৯০-৯৩ দ্রষ্টব্য। 'সঙ্গীত শিরোমণি'র পুঁথি বর্তমানে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রয়েছে

৪২ "প্রকটিতনয়ং" কথার আসল অর্থ রাজনীতিজ্ঞ'। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এর অনুবাদ করেছিলেন "সুনয়ন সম্পন্ন "। যাত্রী, ২য় বর্ষ,১ম সংখ্যা, ১৩৬৩-৬৪, পৃ. ৬৭, ডঃ আহমদ হাসান দানী তাঁর - Bibliography of the Muslim Inscription of Bengal পুস্তিকায় p. 122

৪৩ যদুর বয়স যার বৎসর ছিল কি না, এই বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নূর কুতুবুল আলম তাঁকে বাচ্চা বলেছেন, কিন্তু এটা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ জ্ঞানবৃদ্ধও বয়োবৃদ্ধ নূর কুতুবুল আলমের নিকট সকলেই বাচ্চা । কিন্তু যদুর বয়স তখন বেশী ছিল বলে মনে করবার পক্ষেও কোন প্রমাণ নেই। আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, দ্রঃ ৬০ নং টীকা , পৃ. ২৬৪

৪৪. Ghulam Hussain Salim, op. cit. pp. 115-116, Dr. Muhammad Mohar Ali, Ibid, p. 153; আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

৪৫ Dr. Muhammad Mohar Ali, Ibid, p. 153
আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি:), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০; ডঃ মুহম্মদ এনামুল, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৪৮, পৃ. ৮৮

৪৬ গৌড় ঃ গৌড় নামটি নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন। তবে গৌড় বলতে কোন অঞ্চলটাকে বোঝাত এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। হর্ষবর্ধনের অনুশাসন লিপি থেকে জানা যায় যে, মৌখরী রাজ ঈশান বর্মণ গৌড়বাসীকে পরাজিত করে সমুদ্র পর্যন্ত বিতাড়িত করেছিলেন। এতে ধারণা করা যায় যে, গৌড় সমুদ্র উপকূল থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না। ৬ষ্ঠ শতকে লেখা বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় দেখা যায় গৌড় অন্যান্য যথা- পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট থেকে পৃথক একটি জনপদ। ভবিষ্য 'পুরানে' গৌড়ের স্থান নির্দেশ করেছে আধুনিক বর্ধমানের উত্তরে পদ্মার দক্ষিণে । শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ সুবর্ণের অবস্থিতিও ছিল এ অঞ্চলে। কে.এম. রাইহ উদ্‌দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩। কাজেই সম্ভবত বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার দক্ষিণাংশ প্রাচীনকালে গৌড় নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গের পাল রাজার 'গৌড়েশ্বর' বা গৌড়রাজ বলে অভিহিত হতেন। গৌড়ে আধিপত্য না থাকলেও সেন বংশীয় রাজাগণ 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন। ডঃ এম.এ. আজিজ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২১

৪৭ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০-৯১

৪৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

৫০ দরবেশ নূর কুতুবুল আলমের কন্যা ও হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর স্ত্রীর নাম "সোনা বিবি"

৫১ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

৫২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

৫৩ আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

৫৪ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৫১

৫৫ খলিফাতাবাদ ঃ খলিফাতাবাদ শব্দের অর্থ হলো প্রতিনিধির কর্মস্থল। এর অন্য নাম হাবেলী কসবা অর্থাৎ বাসস্থানের শহর। এটাই হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর প্রতিষ্ঠিত শেষ ও বৃহত্তম শহর এবং তদীয় রাজ্যের রাজধানী। সম্প্রতি বাংলা একাডেমী হতে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের সূফী সাধক গ্রন্থের লেখক গোলাম সাকলায়েন বলেছেন যে , হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর রাজধানী ছিল পায়গ্রাম কসবায়। কিন্তু তা ঠিক নয়। পায়গ্রাম কসবায় রাজস্ব আদায়ের একটি কেন্দ্র এবং হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত একটি শহর ছিল। কিন্তু রাজধানী ছিল খলিফাতাবাদ বা হাবেলী কসবায়। এ.এফ. এম. আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮
বর্তমান বাগেরহাট জেলার সমগ্র অঞ্চলই খলিফাতাবাদ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি খলিফাতাবাদকে তাঁর শেষ আবাসভূমি ও আবাদকৃত সকল অঞ্চলের রাজধানী করে এখান থেকে বিভিন্ন এলাকায় অনুসারীদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সুন্দরবনের অনাবাদী বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁর প্রচেষ্টায় অচিরেই জনবহুল এলাকায় পরিণত হয় এবং খলিফাতাবাদ বা বর্তমান বাগেরহাট একটি সমৃদ্ধ শহর ও ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। ডঃ এ,কে,এম, আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫

৫৬ Bangladesh District Gazetteers Khulna, K.G. M, Latiful Bari (ed.), op. cit, p. 301

৫৭ - كل نفس ذائقة الموت দ্রঃ সুরা আল-ইমরান, ৩/১৮৫

৫৮ এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মোহর আলী বলেন, The Inscription attached to the tomb says that Khan Jahan died in the end of Dhu al-Hijjah, 863 (end of October 1459 A.D.) Dr. Muhammad Mohar Ali, op. cit., p. 165; JASB, 1867, p.135

৫৯ এ,এফ, এম,আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯; সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পীর আলী মুহাম্মদ তাহির ও পীরালী সম্প্রদায়

Dhaka University Institutional Repository

পীর আলী মুহাম্মদ তাহির ও পীরালী সম্প্রদায়

পীরালী মুহাম্মদ তাহির ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ ধর্মান্তরিত মুসলমান। তিনি হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ও শিষ্য ছিলেন।[১] হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) পায়গ্রাম কসবায়[২] নিবাসকালে পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়।[৩] মূলত Bengal District Gazetteers Khulna (১৯০৮) এর ৬৮ নং পৃষ্ঠায় পীরালী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা রয়েছে ঃ - হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) একদিন রোজার সময় ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। এতে তদীয় ব্রাহ্মণ কর্মচারী মুহাম্মদ তাহির (তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি) বলেন, "ঘ্রাণেন চার্ধ ভোজনং" অর্থাৎ ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন। হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) পরে একদিন খানাপিনার আয়োজন করেন। মাংসের গন্ধে তাহির নাকে কাপড় দিলে তিনি (হযরত খান জাহান আলী (রহঃ)) বলেন, যখন ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন হয়, তখন এই খানা ভক্ষণের পর আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুণ। তদনুসারে তাহির ইসলাম কবুল করেন। মুসলমান হওয়ার পর হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ তাহির। যদিও তিনি অধিকাংশের নিকট পীরালী নামে সুবিদিত।[৪] তাহির আরবী শব্দ এর অর্থ পুতঃপবিত্র, নির্মল ইত্যাদি।[৫] তাই, ইসলাম গ্রহণের পর সত্যিই তিনি পুতঃপবিত্র জীবন যাপন করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট । শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, " ব্রাহ্মণ পরহিংসা করিতে গিয়া আত্মহিংসাই করিয়াছিলেন; কারণ তিনি ধর্ম বা রাজ্য লোভে অথবা সংস্পর্শ দোষে নিজের জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।"[৬]

দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, এই ব্রাহ্মণ সন্তানের পূর্ব নাম ছিল শ্রী গোবিন্দলাল রায়, অথচ গোবিন্দ ঠাকুর নামেই তিনি ছিলেন সুপরিচিত[৭]। আর তিনি ছিলেন হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর প্রিয়পাত্র ও প্রধান উজির।[৮] যশোরের ইতিবৃত্ত প্রণেতা J.Westland তাঁকে (মুহাম্মদ তাহির) হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর দেওয়ান বা মন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] মুহাম্মদ তাহির ছিলেন খুব ধর্মাসক্ত । হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর আধ্যাত্মিক পরশে তিনি সোনার মানুষরূপে গড়ে উঠেছিলেন। তাহির ছিলেন নীরব সাধক। দিনের বেলা পীরের খেদমত, জনসেবা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। রাতের বেলা নীরব সাধনায় লিপ্ত হতেন। হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) তাঁকে খেলাফত দান করেছিলেন; এ জন্য লোকেরা তাঁকে "পীর" বলে মনে করতো। এই তাহিরের বংশধরগণই পরবর্তীকালে পীরালী বংশ নামে সুপরিচিতি লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া Babu Gaour Dass Bysack বলেন, "পীর আলী মুহাম্মদ তাহির গোড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইসলাম ধর্মের বিধানসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। সুশাসন ও ন্যায় পরায়ণতার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।"[১০]

'হযরত খান জাহান আলী (রহ:) বাগেরহাট অবস্থানকালে তিনি পায়গ্রাম কসবায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য রাজকার্য পরিচালনা করতেন। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) পায়গ্রাম কসবায় কয়েক বছর যাবৎ অতিবাহিত করেন। পায়গ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি স্বহস্তে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এ সময় মুহাম্মদ তাহির মন্ত্রী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে সমস্ত কার্যে সাহায্য করতে থাকেন।'[১১] পায়গ্রাম কসবা এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান এখনো বাস করছেন। বোধহয় অনেক খাঁটি উচ্চ বংশীয় উন্নতিশীল মুসলমান পরিবার একত্র হন যা যশোর খুলনার অন্য কোন স্থানে নেই। এদের অনেকে পশ্চিম দেশ হতে আগত সম্ভ্রান্ত মুসলমান অধিবাসীর বংশধর এবং কতক, যে সকল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করেন তাঁদেরই অধস্তন পুরুষ।[১২]

'ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত পীর মুহাম্মদ তাহির আধ্যাত্মিকতায় প্রভূত উন্নতি লাভ করেন এবং জনগণের নিকট তিনি পীর আলী (পীরালী) নামে খ্যাত হয়। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও ধর্ম নিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁকে স্বীয় বিশিষ্ট খলিফা ও উজির মনোনীত করেছিলেন। পীর মুহাম্মদ তাহিরের বংশধরগণ যশোর-খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে এখনো "পীরালী মুসলমান" এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্ববর্তী তাঁর বংশধর পীরালী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়।'[১৩]

খুলনা জেলার প্রাচীন হিন্দু প্রধান স্থান হলো দক্ষিণ ডিহি। সেনহাটি, মূলঘর, কালীয়া প্রভৃতি স্থানের বহু পূর্বে এখানে ছিল উচ্চ শ্রেণীর বসবাস। এ গ্রামের নাম ছিল পায়গ্রাম, এ নাম এখনো আছে। তৎকালে এখানকার রায় চৌধুরী বংশের বিশেষ সুনাম ছিল। খুব সম্ভব তুর্ক আফগান আমলের প্রথম দিকে এ ব্রাহ্মণ বংশ রাজ সরকার হতে সম্মানসূচক রায় চৌধুরী উপাধি পেয়েছিলেন।[১৪] এরা ব্রাহ্মণ, কনোজাগত দক্ষের বংশধর। দক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীর মুর্শিদাবাদের প্রায় ২২ কিলোমিটার (২১.৯৬ কি.মি.) পশ্চিমে গুড় গ্রাম প্রাপ্ত হয়ে সেখানে বাস করেন।[১৫] এদের পূর্ব-পুরুষ গুড় গ্রামের অধিবাসী বলে এরা গুড়ী বা গুড়গ্রামী ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত। এ বংশের কৃতি সন্তান নাগরনাথ ও দক্ষিণানারায়ণ। এদের উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী বংশ পরিক্রমার একটি ছক উপস্থাপন করা হলো ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

রাঢ়ীয় কাশ্যপগণের আদি পুরুষ-

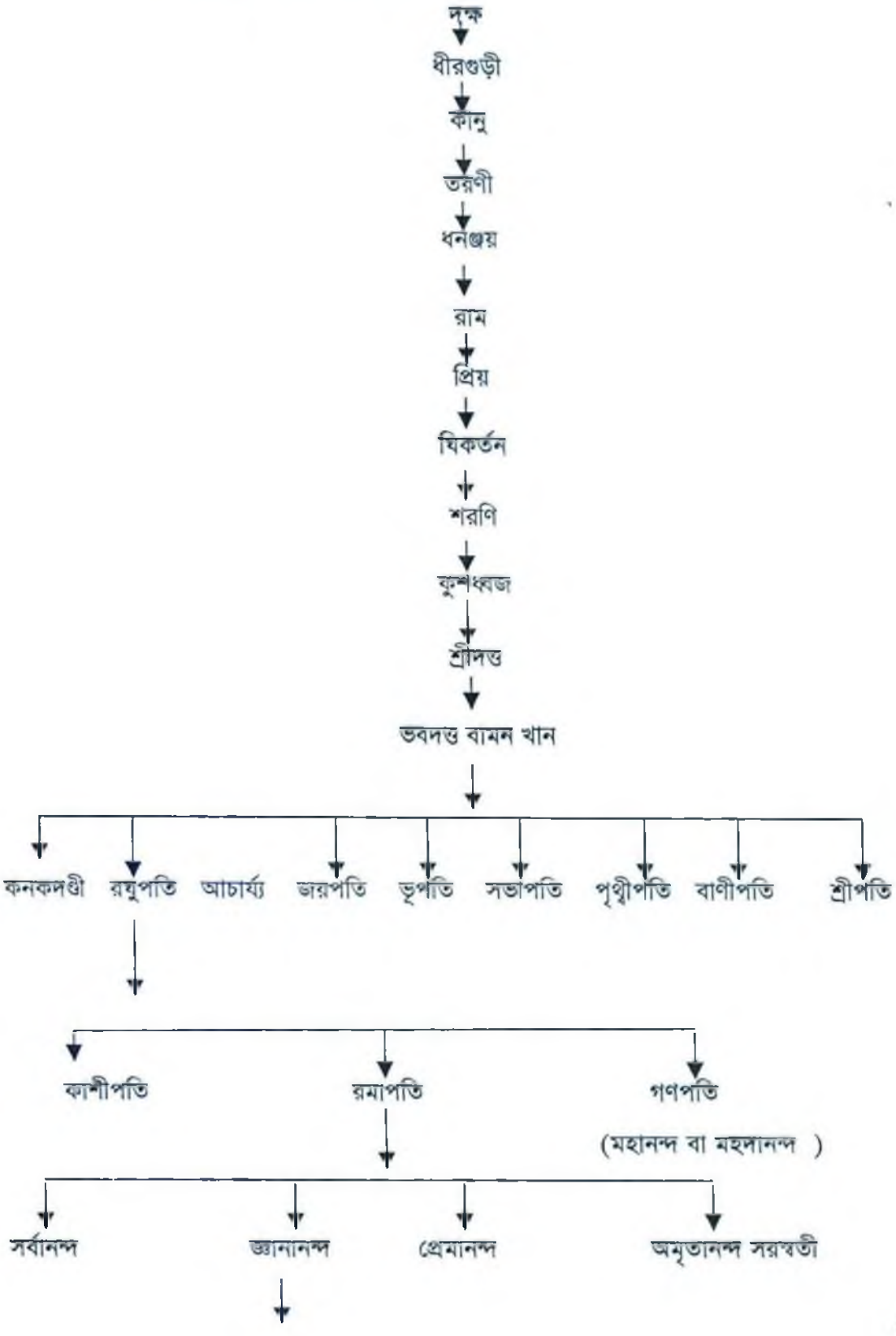

Dhaka University Institutional Repository

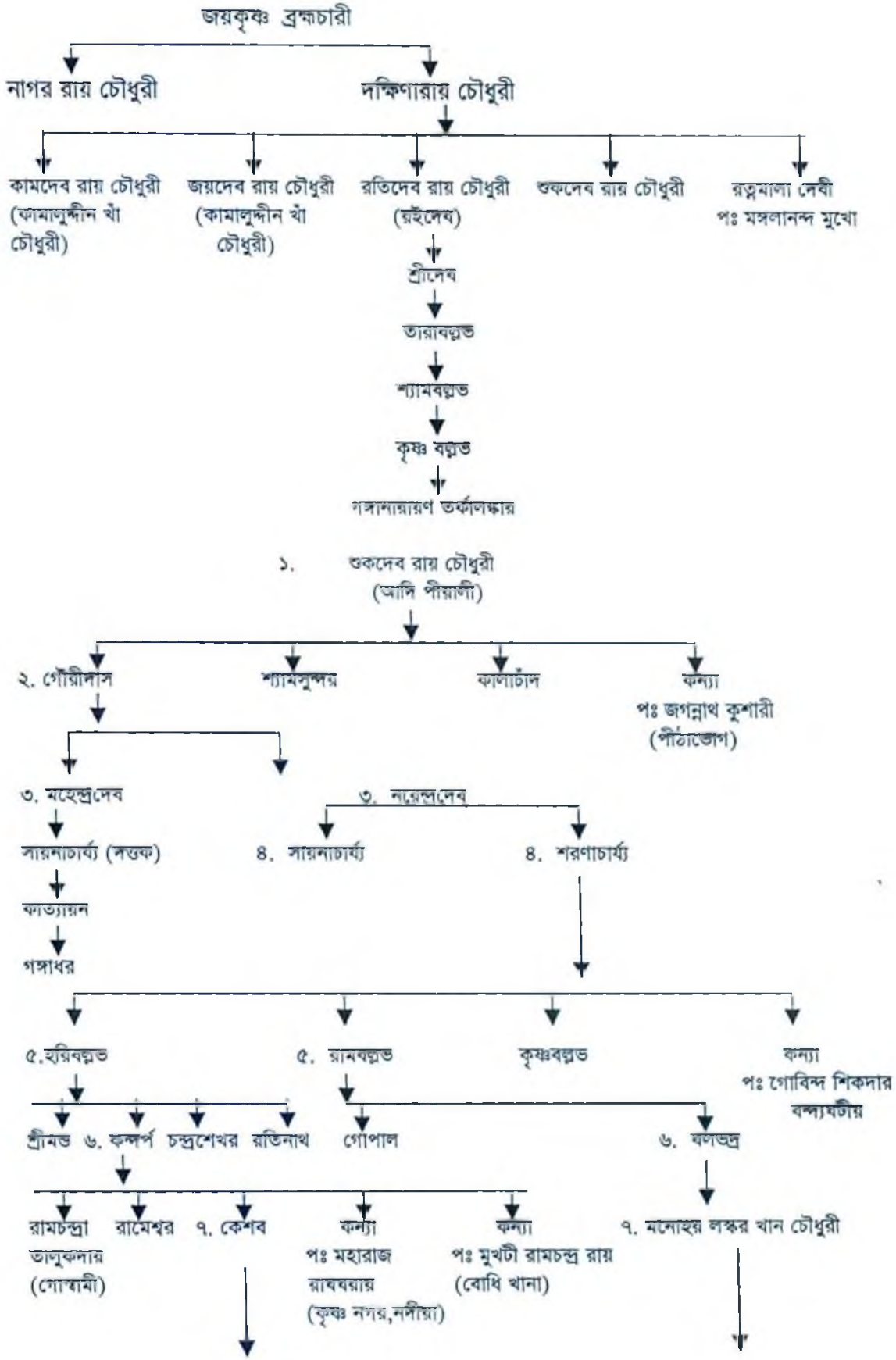

Dhaka University Institutional Repository

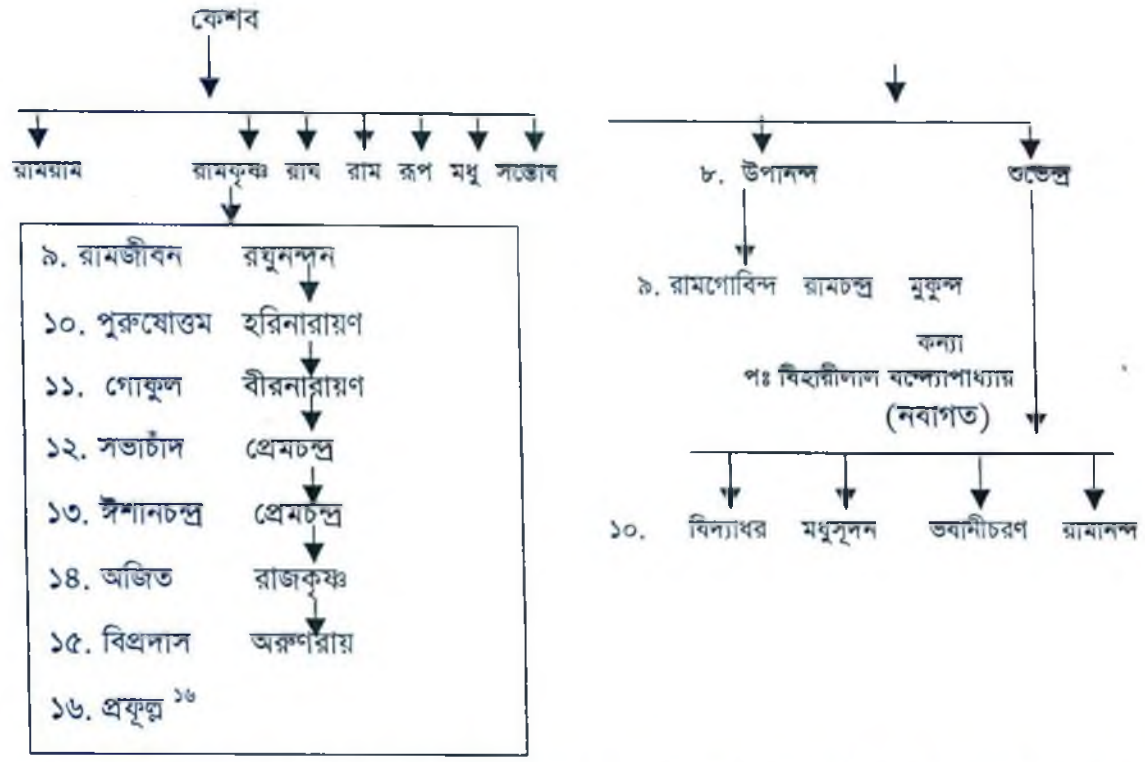

দক্ষিণানাথ রায় চৌধুরীর চারি পুত্রের মধ্যে কামদেব ও জয়দেব মুহাম্মদ তাহিরের অধীনে উচ্চ কার্যে নিযুক্ত হন। মুসলমানের অধীনে চাকরি করলেও রায় চৌধুরীগণ অত্যন্ত সম্মানিত এবং পরাক্রান্ত ছিলেন। তারা নিষ্ঠাবান হিন্দু, এজন্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্রাহ্মণতনয় মুহাম্মদ তাহিরকে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। মুখ ফুটে বিশেষ কিছু বলতে পারতেন না।

মুহাম্মদ তাহিরও তাঁদের গোঁড়ামি সহ্য করতে পারতেন না এবং তাঁর প্রতি সেই নিম্নস্থ কর্মচারীদের অস্পষ্ট ঘৃণার ভাব যে তিনি বুঝতে পারতেন না এমন নয়। ফলে দু'দিকেই অন্তরাকাশে মেঘ সঞ্চয় হচ্ছিল। নবদীক্ষিত পীরালী গোঁড়া হিন্দুকে স্বীয় মতে আনয়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনাটি হলো এভাবে - পবিত্র রমজানের সময় মুহাম্মদ তাহির রোজা রেখেছেন। অন্যদিকে জয়দেব ও কামদেব অন্যান্য কর্মচারীসহ দরবার গৃহে বসে আছেন। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি তার বাটী হতে একটি সুগন্ধি কলম্বা লেবু এনে তাহিরকে উপহার দেন। পীরালী মুহাম্মদ তাহির ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় কামদেব বললেন, "হুজুর , ঘ্রাণ লইলে যে অর্ধেক ভোজন হয়, আপনি যে গন্ধ গ্রহণ করিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন " এবং সঙ্গে সঙ্গে "ঘ্রাণেন চার্ধ ভোজনং" বলে সংস্কৃত শ্লোকেরও উল্লেখ করলেন। পীরালী একটু অপ্রতিভ হলেন বটে, কিন্তু হাড়ে চটে গেলেন এবং কামদেবের বিদ্রূপের বিকট প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প করলেন। গোপনে পরামর্শ স্থির হলো। তিনি একদিন প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমানগণকে নিমন্ত্রণ করে আহার করাবেন। জয়দেব ও কামদেব যথাসময়ে দরবারে উপস্থিত হলেন। কিন্তু দরবারগৃহ পলাণ্ডু, রসুন প্রভৃতি মসলার গন্ধে ভরপুর হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

কামদেব নাকে কাপড় দিয়ে বসেছিলেন। তখন কঠোর বিদ্রূপাত্মক স্বরে পীর আলী জিজ্ঞেস করলেন, "কি সংবাদ চৌধুরী, নাকে কাপড় কেন ? " কামদেব মাংস গন্ধের কথা উল্লেখ করলেন। অমনি পীরালী বললেন, "সেখানে গো-মাংস রন্ধন হইতেছে, তাহা হইলে তোমাদেরও অর্ধেক ভোজন করা হইয়াছে; সুতরাং জাতি গিয়াছে।"[১৭] অতঃপর কামদেব ও জয়দেব ঐ মাংস খেয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। পীরালী তাঁদের উভয়কে অর্থাৎ কামাল উদ্‌দীন খাঁ চৌধুরী ও জামাল উদ্‌দীন খাঁ চৌধুরী উপাধি দিয়ে স্বশ্রেণীভুক্ত করে নিলেন। সংশ্রব দোষে অন্য দু'ভ্রাতা শুকদেব ও রতিদেব পীর-আলী ব্রাহ্মণ হিসেবে সমাজে পরিচিত হলেন।[১৮] এ সম্পর্কে পুঁথিতে যে বিবরণী রয়েছে তা এখানে প্রণিধানযোগ্য ।

"খানজাহান মহামান পাদশা নফর।
যশোরে সনন্দ ল'য়ে করিল সফর।।
তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির।
নারিতে বামুন বেটা হইল জাহির।।
পূর্বেত আছিল সেও কুলীনের নাতি।
মুসলমানী রূপে মজে হারাইল জাতি।।
পীর আলী নাম ধরে পিরল্যা গ্রামে বাস।
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হল সর্বনাশ।।
সুবিধা পাইয়া তাহির হইল উজীর।
চেঙ্গুটিয়া পরগণায় ছাড়িল জিগীর।।
. . .
আঙ্গিনায় ব'সে আছে উজীর তাহির।
কত প্রজা লয়ে ভেট করিছে হাজির।।
রোজার সেদিন পীর উপবাসী ছিল।
হেনকালে একজন নেবু এনে দিল।।
গন্ধামোদে চারিদিক ভোরপুর হইল।
বাহাবা বাহাবা বলে নাকেতে ধরিল।।
কামদেব জয়দেব পাত্র দুইজন।
বসেছিল সেইখানে বুদ্ধে বিচক্ষণ।।
কি করেন কি করেন বলিলা তাহিরে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ্রাণেতে অর্ধেক ভোজ শাস্ত্রের বিচারে।।
কথায় বিদ্রূপ ভাবি তাহির অস্থির।
গোঁড়ামী ভাঙ্গিতে দোঁহের মনে কৈল স্থির।।
দিনপরে মজলীস করিল তাহির।
জয়দেব কামদেব হইল হাজির।।
দরবারের চারিদিকে ভোজের আয়োজন।
শত শত বক্‌রি আর গো-মাংস রন্ধন।।
পলাণ্ড রশুন গন্ধে সভা ভোরপুর।
সেই সভায় ছিল আরো ব্রাহ্মণ প্রচুর ।।
নাকে বস্ত্র দিয়া সবে প্রমাদ গণিল।
ফাঁকি দিয়া ছলে কলে কত পলাইল।।
কামদেবে জয়দেবে করি সম্বোধন।
হাসিয়া কহিল ধূর্ত তাহির তখন।।
জারিজুরি চৌধুরী আর নাহি খাঁটে।
ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন শাস্ত্রে আছে বটে।।
নাকে হাত দিলে আর ফাঁকিত চলে না।
এখন ছেড়ে ঢং আমার সাথে কর খানাপিনা।।
উপায় না ভাবিয়া দোঁহে প্রমাদ গণিল।
হিতে বিপরীত দেখি মরমে মরিল।।
পাক্‌ড়াও পাক্‌ড়াও হাঁক দিল পীর।
থতমত হয়ে দোঁহে হইল অস্থির।।
দুইজনে ধরি পীর খাওয়াইল গোস্ত
পীরালী হইল তারা হৈল জাতিভ্রষ্ট।।
কামাল জামাল নাম হইল দোঁহার।
ব্রাহ্মণ সমাজে প'ড়ে গেল হাহাকার।।
তখন ডাকিয়া দোঁহে আলী খাঁজাহান।
সিঙ্গির জায়গীর দিল করিতে বাখান।।

Dhaka University Institutional Repository

ধনেমানে হয়ে হীন কুটুম্ব স্বঘর।
সমাজে রহিল ঠেলা সেই বরাবর।।
পিরালী রহিল পড়ি কুলাচার্য্য ঘোষে।
রচিল পিরালী কথা নীলকান্ত শেষে।"[১৯]

যাহোক নবদীক্ষিত কামালউদ্‌দীন ও জামালউদ্‌দীন প্রচুর সম্পত্তির জায়গীর পেয়ে সিঙ্গিয়া অঞ্চলে বাস করতে থাকেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণ খুব সম্ভব হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর পায়গ্রাম ত্যাগের পরেই হয়েছে। কথিত আছে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁদেরকে উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছিলেন। তিনি বাগেরহাটে অবস্থানকালে এই দু'ভ্রাতা মাঝে মাঝে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে বাগেরহাট আসতেন। কথিত আছে যে, তাহিরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি হিন্দু থেকে যান। তিনিই সর্ব প্রথম হিন্দু পীরালী এবং তাহিরকে লোকে উপহাসচ্ছলে পীর -অলি বলতো। তাঁকেই কেন্দ্র করে এ দেশে পীরালী গান ও বহু কাহিনী রচিত হয়। ঐকান্তিক ধর্মনিষ্ঠার জন্য শেষ পর্যন্ত তাহির পীর-আলী বা পীরালী আখ্যা পান।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই পীরালী সম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ঃ-

(ক) বিষন পীরাল্যা গ্রাম নবদ্বীপের আড়ে;
(খ) পীরাল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।।
অথবা (গ) পীর আলী নাম ধরে পীরাল্যা গ্রামে বাস।
যে গাঁয়েতে নবদ্বীপের হৈল সর্বনাশ।।[২০]

এতে বোঝা যায়, গ্রামটি পীরালীদের জন্মস্থান বলেই "পীরাল্যা" নামে চিহ্নিত হয়েছে। যশোর জেলায় মুহাম্মদ তাহিরের জন্মস্থান বলে পরিচিত পীরালী বা পীরালা গ্রাম (আধুনিক নাম পেড়োলি) বিদ্যমান। অবশ্য পীরাল্যা গ্রামের যবন কর্তৃক নদীয়ার ব্রাহ্মণকূল নির্মুল হওয়ার কাহিনীর মূলে সত্য এইরূপ হতে পারে - পিরালী[২১] সম্প্রদায় (হিন্দু ও মুসলমান) ব্রাহ্মণকূলের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ায় সুযোগ সুবিধা মত তাঁরা প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করতেন এবং সময় সময় সফলও হতেন।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে অবশ্য পীরালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে আলাদাভাবে দেখা অযৌক্তিক। কারণ যারা ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে মুসলমান হয়ে যান। তাঁরা তো ধর্ম ত্যাগ করেই প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে যারা হিন্দু সমাজভুক্ত থেকেও সামাজিক নির্যাতনের শিকার হন, তাঁদের আক্রোশের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত বা অদীক্ষিত হিন্দু পীরালীগণকেও বাদ দেওয়া যায় না। মোট কথা এই, বাংলা ভারতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার চেতনা সেদিন যে সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করে। পীরালী বা চৈতন্য সম্প্রদায় তারই ফলশ্রুতি । পীরালী সম্প্রদায় যেমন ব্রাহ্মণ্য বিরোধী ছিলেন, শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ও তাই।

ইতোমধ্যে পীরালী সম্প্রদায় বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠে , তাই চৈতন্য সম্প্রদায়ের সংস্কার আন্দোলনে পীরালীর প্রভাব পড়া নিতান্তই স্বাভাবিক। "যে সব উচ্চ বংশীয় হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে অথচ পূর্ব সংস্কার একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি তারাই " পীরালী " মুসলমান নামে পৃথক হয়ে থাকে।"[২২] পীর-আলী মুহাম্মদ তাহিরের কর্ম সাধনায় এ দেশের বহু অমুসলমান ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। এজন্য তাদেরকে "পীর-আলী" বা "পীরেলী" মুসলমান বলা হতো। আর যে বংশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতো, তাদের হিন্দু ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন হিন্দু সমাজের সংশ্রব দোষে মুসলমান না হয়েও সমাজচ্যুত হলো। লোকে তাদেরকে পীরালী ব্রাহ্মণ, পীরালী কায়স্থ, পীরালী নাপিত প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিল।[২৩] এভাবে পীরালী হিন্দু মুসলমান যশোর-খুলনার বহুস্থানে বসবাস করছেন। 'পীরালীদের মধ্যে এখনো অনেক হিন্দু রীতিনীতি প্রচলিত আছে, তবে তারা বর্তমানে অনেক সংস্কার মুক্ত। তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাইরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করছে।'[২৪] পীরালী সম্প্রদায় মূলত যশোরের মুসলমান -হিন্দু মিলনে এই মিশ্র সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম মিলনের একটি হাওয়াও বয়েছিল। পীরালীর প্রভাবে যে সব হিন্দু, মুসলমান সমাজের অঙ্গীভূত হতেন, তাঁরা তো মুসলিম সমাজে গৃহীত হতেন; এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের সহ অবস্থানের ফলে একটি প্রীতি মধুর সামাজিক জীবন গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। শুধু তাই নয়, মুসলিম সমাজভুক্ত হওয়ার পরও হিন্দু সমাজের আচার-আচরণও বহুদিন যাবৎ প্রচলিত থাকতে বাধা ছিল না। বিশেষ করে যেটি নেহায়েত সামাজিক আচরণ ছিলো, যার সঙ্গে মুসলিম ধর্ম বিশ্বাস জড়িত থাকতো না।

এরূপ আচার আচরণে মুসলিম সমাজে আপত্তির কারণ ছিলো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, ধর্মান্তরিত একটি পীরালী মুসলিম পরিবারে হিন্দুদের মত পিতল-কাঁসার বাসন-কোসনের ব্যবহার, বদনার বদলে গাড়ুর ব্যবহার, পীড়ির উপর বসে আহার ইত্যাদিতেও কোন আপত্তি দেখা যেতো না। আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

লোক সঙ্গীতেও এই পীরালী প্রভাব বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ মেয়েলী গানে মুসলিম পরিবারে 'গাড়ুর' ব্যবহারের কথা পাচ্ছি। পুরো গানটি হলো এরূপ ঃ--

ধূয়া।। "মইরমের মা করুণ করে আমার মইরমরে
ও ভালো চালের বাতা ধরে রে।
মা।। ওরে, এইখানেতে খেলতো খেলা আমার মইরমরে,
ভালো খেলবার খেড়ুলরে রে।
আমার শোকের অনলে।।
মেয়ে।।মেয়ে যখন হইছি আমার মা ধনরে,
আমায় নিবে পরে রে।
আমার শোকের অনলে।।
মা।। ওরে, আগে যদি জানতাম আমার মইরমরে।
তোমায় নিবে পরে।
ওরে, গাড়ুর মুখে গামছা দিয়ে
আমার মইরম রে।
রাখতাম তোরে সা'রে রে।
আমার শোকের অনলে।।[২৫]

উল্লেখ্য, গানটি যশোর-খুলনা এলাকার মুসলিম সমাজে প্রচলিত একটি মেয়েলী বিয়ের গান। লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো- এখানে মুসলিম পরিবারে 'বদনার' বদলে 'গাড়ু'র ব্যবহারের কথা রয়েছে। মইরমের মা মেয়ের বিদায়লগ্নে করুণা করছেন দেখে মেয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, এই বিদায় তো স্বভাবিক, প্রত্যেক কন্যাকেই তো স্বামী গৃহে যেতে হবে। তাতে মায়ের মনে সান্ত্বনা জাগছেনা। তিনি আরও নির্মম হয়ে উঠেছেন যেন। গানের শেষ চরণ ক'টিতে আছে ঃ--

আগে যদি জানতাম আমার ময়নারে
তোমায় নিবে পরে।
(ওরে) গাড়ুর মুখে গামছা দিয়ে
আমার মইরম রে,
রাখতাম তোরে সা'রে রে,
আমার শোকের অনলে।।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

এ অংশে "গাড়ুর মুখে গামছা দিয়ে" মইরমরে সেরে রাখার কথা আছে। কিন্তু 'গাড়ু' নামক পানির পাত্র শুধু হিন্দু পরিবারেই ব্যবহারের কথা। মুসলমান পরিবারে গাড়ুর বদলে বদনার ব্যবহার আছে। কোনোক্রমেই গাড়ু মুসলিম পরিবারে ঢুকতে পারে না। তা হ'লে এখানে গাড়ুর প্রসঙ্গ এলো কি করে ? মনে হয়, এখানে 'পীরালী' মুসলিম পরিবারের প্রসঙ্গ এসেছে। পীরালী মুসলিম পরিবারে হিন্দু ঐতিহ্যের চিহ্নস্বরূপ অন্যান্য থালা-বাসনের মত।'গাড়ুর' ব্যবহার বহুদিন যাবৎ চালু ছিলো। হয়তো বা এখনো তার ব্যবহার থাকতে পারে।

ক্রমে ক্রমে পীরালী মুসলমানের সংখ্যা বর্ধিত হতে লাগলো। সাতক্ষীরা ও যশোর অঞ্চলে এই পীরালীদের বাস আছে। যেমন ঃ-- রসুলপুর, পলাশপোল, হাকিমপুর, কুলিয়া, গোদাঘাটা, কোমরপুর, পাথরঘাটা প্রভৃতি গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত পীরালী মুসলমান আছেন। যারা সাধারণত অন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন না। তবে বর্তমানে ওর কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটছে।'গভীর উৎসাহ সহকারে মুহাম্মদ তাহির ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়। বহু ব্রাহ্মণ-কায়স্থকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং তাঁরই সংস্পর্শে বহু ব্রাহ্মণের জাতিচ্যুত ঘটে। এ শ্রেণীর জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণরা এখনো পীরালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। মাগুরার পীর-জয়ন্তীও হিন্দু ছিলেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরও তিনি বহু সংখ্যক হিন্দুকে মুসলমান করেন বলে জানা যায়।'[২৭]

রাজা প্রতাপাদিত্যের পূর্বে বাগেরহাটের হযরত খান জাহান আলী (রহ:) কে কেন্দ্র করে যে পীরালী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল; তাদের জীবন-যাত্রা ও ইতিহাস নিয়ে পরবর্তীকালে পীরালী কথা রচিত হয়েছিল বটে। তবে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য কবির কথা জানা যায় না। অবশ্য হযরত খান জাহান আলী (রহ:) বিশেষ সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবিতকালে নির্মিত বলে কথিত মাযার গাত্রে আরবী ও ফার্সিতে বহু উপদেশপূর্ণ বাণীসমূহ লিখিত হয়েছিল, হয়তো যার সন্ধান আমরা পাইনি তবে আঠারো শতকের রচনা বলে অনুমিত পীরালী কথা।

'বাগেরহাট-খুলনার সুন্দরবন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার পূর্বে যশোর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে পায়গ্রাম কসবাকে নির্ধারণ করে তিনি পীর মুহাম্মদ তাহিরকে এ অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করেন।'[২৮] এ সকল এলাকায় তিনি যাদেরকে স্বীয় খলিফা ও প্রশাসকরূপে নিয়োগ করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ছিল ইসলাম প্রচার, রাস্তা নির্মাণ, অনাবাদী ভূমি আবাদকরণ, জলাশয় খনন, মসজিদ মাদ্‌রাসা স্থাপন, শান্তি-শৃঙখলা রক্ষা ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা। এভাবে তাঁর অনুরক্ত অনুসারী ও খলিফাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত এলাকাসমূহে বহু সড়ক, পুল, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল এবং সুপেয় পানির বহু দিঘি খনন করা হয়েছিল। আর এ সকল দিঘির কয়েকটি খাঞ্জালী দিঘি ও

Dhaka University Institutional Repository

অনেকগুলো তাঁর খলিফাদের নামে পরিচিত। 'পায়গ্রাম কসবাতে খ্যাতনামা ইসলাম প্রচারক মুহাম্মদ তাহির ওরফে পীর-আলীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহু বিধর্মী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।'[২৯]

যশোরে আর একটি সম্প্রদায় রয়েছে। তারাও পীরালী বংশে পরিচিত। এদের আদি পুরুষগণ কায়স্থ ছিল। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর হাতে মুসলমান হওয়ার পূর্বে তাহির খুব সম্মানিত লোক ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলে একেত তিনি হিন্দু সমাজের মহাশ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; তদুপরি তার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার জন্যও লোকেরা তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতো। মুসলমান হওয়ার পর হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁর মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। তাঁর আমলে পীরালী মুহাম্মদ তাহিরের প্রেরণায় যারা মুসলমান হন, তাঁরা পীরালী আখ্যা পান বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে এভাবে যে সকল প্রসিদ্ধ বংশ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন তারাই পীরালী। মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে জনৈক হিন্দু, মুসলমান হয়ে চাঁদ খাঁ নাম ধারণ করেন এবং নবাবের অধীন হাবিলদার ও পরে মীর মুন্সী হন।

"প্রবাদ আছে, প্রতাপাদিত্যের পতনের অব্যবহিত পরে যখন চাঁদ খাঁ পীরালী হন, তখন ১৪০০ ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েছিলেন।"[৩০] চাঁদ খাঁ সাতক্ষীরার অন্তর্গত চাঁদপুরে বাস করেন। ক্রমে ক্রমে ঐ স্থানে শ্রীরামপুর, কুলিয়া, কোমরপুর, পলাশপোল, হেলাতলা, নগরতলা, গণপাতিপুর, পাথরঘাটা, হাকিমপুর, রসুলপুর প্রভৃতি স্থানে প্রায় তিন শত ঘর পীরালী মুসলমানের বাস হয়েছে। উক্ত চাঁদ খাঁ হতে ৯ম ও ১০ম পুরুষ জীবিত আছেন। পায়গ্রামের সন্নিকটে খাঞ্জেপুর প্রভৃতি স্থানে পাঠান আমল হতে বহুসংখ্যক উচ্চ বংশীয় মুসলমানের বাস হয়েছিল। ওরা পীরালী নয়। ওদের বংশধরগণ মুসলমান সমাজে বিশেষ সম্মানিত রয়েছেন। এদের জাতি গৌরব বিদ্যা গৌরবে প্রমাণিত ও সমুজ্জ্বল হয়েছেন।

"জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারের জগন্নাথ কুশারী শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করায় পীরালী হন। ঠাকুর পরিবারের এই পীরালী গল্প আজও অব্যাহত রয়েছে।"[৩১] মধ্যযুগীয় যশোরে ইসলাম প্রচারে আদিকাল থেকে যেমন শহীদ ও গাজীদের প্রাধান্য ছিল, পরবর্তীকালে যশোরে তেমনি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর খলিফাতাবাদ নগর স্থাপন কাল থেকে চিরদিনই যশোর ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর প্রখ্যাত শিষ্য হযরত আবু তাহির ওরফে পীরালীর প্রভাবে যশোরে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ে এ নব জাগরণের কারণে পীরালী ভাববাদের জন্ম হয়।[৩২] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাধির পশ্চিম পার্শ্বে তদীয় বন্ধু ও শিষ্য মুহাম্মদ তাহিরের সমাধি। এর পশ্চিমে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। এর দেয়ালের প্রশস্ততা ৭ ফুটের অধিক। গ্রীষ্মকালেও এ মসজিদের মধ্যে শীতোত্তাপ অনুভূত হয়। মসজিদের বাইরের দেয়াল ৩ ফুট উঁচু। এ মসজিদটি এখনো পূর্বাবস্থায় আছে এবং এখানে ওক্তিয়া ও জুমার নামাজ হয়ে থাকে। সমাধি সৌধের

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণদিকে চারটা আলো দেয়ার ঘর আছে। ওটাতে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। উত্তর -পশ্চিম কোণায় দু'টো প্রাচীনকালীন কাঁঠাল গাছ আজও কালের সাক্ষী হয়ে জীর্ণাবস্থায় বেঁচে আছে। ওদের বয়স প্রায় ৩০০ বছরেরও অধিক হবে।[৩৩] সম্প্রতি দিঘির উত্তর পাড়ে সিড়ির পূর্বদিকে জনসাধারণ কর্তৃক একটি সুন্দর রেষ্ট হাউজ নির্মিত হয়েছে। ওটার সংলগ্ন উত্তর দিকে বড় প্রাচীরের মধ্যে ছয়টা পাকা কবরের নিদর্শন আছে। এটা সম্ভবত খাস গোরস্থান ছিল। এ মাযারগুলো হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর প্রধান শিষ্যদের বলে অনুমিত হয়।[৩৪] মুহাম্মদ তাহির হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সহকর্মীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অতি আপনজন। এরূপ উভয়ের পাশাপাশি সমাধি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় বহন করে। পীরালীর সমাধি গাত্রও অর্ধ গোলাকৃতি প্রস্তর দ্বারা আবৃত। প্রস্তরের উপর লেখা রয়েছে ঃ--

"হাজিহি রওজাতুম মুবারাকাতুন মির রিয়াজিল জান্নাতি ওয়া হাজিহি সাক্বিয়া তুললি হাবিবিহী ইসমুহু মুহাম্মদ তাহির ছালাছা ছিত্তিনা ওয়া ছামানিয়াতা"।[৩৫]

অর্থ ঃ এ স্থান বেহেস্তের বাগিচার অংশ বিশেষ এবং এটা জনৈক বন্ধুর সমাধি - নাম মুহাম্মদ তাহির, তারিখ ৮৬৩ জিলহজ্জ। মুহাম্মদ তাহির যে হযরত খান জাহান আলী (রহ:)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, এখানে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। কবরগাত্রে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাধির ন্যায় সূরা তাকাসুর, আল্লাহর মহান গুণাবলী বা নামসমূহ, কালেমা তৈয়্যেবা ও কালেমা শাহাদত লিখিত রয়েছে।

পীরালী মুহাম্মদ তাহিরের সমাধিটি সম্পূর্ণ পাথরের তৈরি। উপরের গোলাকৃতি অংশে আরবী শিলালিপি রয়েছে। ৮৬৩ হিজরির জিলহজ্জ মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। শিলালিপি অনুযায়ী হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এবং মুহাম্মদ তাহির একই সালে ইন্তেকাল করেন। কতদিনের পার্থক্যে ইন্তেকাল করেছেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে জনশ্রুতি মতে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দাফনের ১৩ দিন পর আসরের শেষ রাকআতের শেষ সিজদায় ইহজগত ত্যাগ করেন।[৩৬] পীর হযরত খান জাহান আলী (রহ:) -কে দাফন করেন মুহাম্মদ তাহির এবং মুহাম্মদ তাহিরকে দাফন করেন তার আপন ভ্রাতা মুহাম্মদ মোতাহের। মুহাম্মদ তাহিরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর যখন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হন; তখন তাঁর ভ্রাতা অরবিন্দু ঠাকুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ভাইয়ের পক্ষ সমর্থন করেন ও মুহাম্মদ মোতাহের নাম ধারণ করেন।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পীরালী মুহাম্মদ তাহির হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সংস্পর্শে থেকে দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। যা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১ W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol. 11, Trubner and Co., London, 1877, p. 230; Khoundkar Alamgir, Indigenous and Extraneous Elements of Sultanate Architecture of Bengal, Ph.D. Thesis (Unpublished), University of Dhaka, 2002, p. 213

২ পায়গ্রাম কসবা ঃ যশোর থেকে প্রায় ৩২.২০ কিলোমিটার পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। পায়গাঁও ফার্সি শব্দ, এর অর্থ সুসংবাদ আর কসবাও ফার্সি শব্দ, এর অর্থ শহর । সুতরাং এই পায়গাঁও হতে পায়গা বা পায়গ্রাম নাম হয়েছে। পায়গ্রামে কসবা বা কসবায়ে পায়গাঁও অর্থে সুসংবাদ দানের শহর বোঝায়। ফুলতলা হতে প্রায় ৬.৪৪ কিলোমিটার উত্তরে এ নগরের অবস্থান ছিল। দ্রঃ এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, লিঙ্কম্যান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃ. ১১৬; কসবা সম্বন্ধে আরও জানা যায়, কসবা হচ্ছে সুলতানি আমলের উপবিভাগীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র। প্রশাসনিক উপবিভাগগুলোর মধ্যে ইকলিম, ইকতা, মুকতা, ইরতা ও কসবা নামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৩৭টি কসবার সন্ধান পাওয়া গেছে। কসবাগুলোর বেশীরভাগই বর্তমান জেলা শহরের মধ্যে বা অদূরে অবস্থিত ছিল। এসব কসবার নামের সাথে অনেক রাজকীয় আমলার পদবির সংযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কাজীর কসবা, কোতোয়ালের কসবা, নগর কসবা ইত্যাদি। কসবাগুলোর অবস্থান একটির সাথে অপরটির দূরত্ব, রাষ্ট্রীয় কিংবা প্রাদেশিক রাজধানীর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নামের সাথে যুক্ত রাজকীয় পদবি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে কসবাকে সুলতানি আমলের একটি উপ-বিভাগীয় কেন্দ্র বলা যেতে পারে। সুলতানি আমলের 'কসবা' কে জেলা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কসবায় দায়িত্বে ছিলেন একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন কাজী ও একজন কোতোয়াল, মোগল আমলে অধিকাংশ কসবাই পূর্বের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। নিম্নে কয়েকটি কসবার নাম উল্লেখ করা হলো ঃ খুলনার পায়গ্রাম কসবা, মুন্সীগঞ্জ জেলায় কাজীর কসবা ও নগর কসবা, টাঙ্গাইল জেলায় কসবা আটিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা, লক্ষ্মীপুর জেলার শহর কসবা, বৃহত্তর রংপুরের কসবা নূরপুর, দিনাজপুরের কসবা সাগরপুর, বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় চোয়ারা কসবা, আমরুল কসবা, কিসমত কসবা ও কসবা মান্দা এবং গৌয়নদী উপজেলার বড় কসবা ও লাখেরাজ কসবা। বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ), খণ্ড ২, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ২১৩-২১৪

৩ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩২১, পৃ. ৩০১

৪ Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.),The Bengal Secretariat Book Depot., Calcutta, 1904, p. 68

৫ ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪৭২; মুহম্মদ আলাউদ্দীন আল আযহারী, বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, প্র. ১৬১৬

৬ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪

৭ এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৮ Bengal Distric Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), op. cit., p.68; শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), বিশ্বকোষ, একাদশ ভাগ, কলিকাতা, ১৩০৭, পৃ. ৪৮৩

৯ Calcutta Review, Mr. J. Westland, Calcutta, 1857, p. 72

১০ JASB, vol. XXXVI (36), Babu Gaour Dass Bysack, On the Antiquities of Bagerhat, Calcutta, 1867, p. 132

১১ ডঃ এ,কে,এম, আইয়ুব আলী, খান জাহান (ইসলামী বিশ্বকোষ, নবম খণ্ড) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫০৫

১২ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১

১৩ ডঃ এ,কে,এম, আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫

১৪ এ, এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

১৫ Nagendranath Vasu Prachyavidyamaharnava and Late Byomkesh Mustaphi, The castes and sects of Bengal , Vol. III, Calcutta, 1331, p. 121

১৬ Ibid, p. 216-217

১৭ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫-৩০৬; শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা:), বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩

Dhaka University Institutional Repository

১৮ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬; শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু , বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩

১৯ Nagendranath Vasu Prachyavidyamaharnava and Late Byomkesh Mustaphi, Ibid, pp. 154-156

২০ আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পাদিত), যশোর জেলার ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২৪৩

২১ পীরালী - প্রাচীন বঙ্গদেশের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যারা যশোর-খুলনা অঞ্চলের পীর আলীর সংস্পর্শে এসে আপন সমাজ থেকে পতিত হয়েছিল। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৭৫৬

২২ মোঃ নুরুল ইসলাম, খুলনা জেলা, খুলনা, ১৯৮২, পৃ. ২৯১

২৩ Probhat Kumar Mukharjee, Rabindra Jiboni, VolI, Vishwabharati Granthalaya, Calcutta, 1353,PP. 3-4; শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪

২৪ মোঃ নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২

২৫ আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬

২৬ আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬-৪৭

২৭ চৌধুরী শামসুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৯৯

২৮ ডঃ এ,কে,এম, আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৫০৫

২৯ অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দীন, সুফী ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ২০৪

৩০ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

৩১ মুহাম্মদ আবুতালিব, খুলনা জেলায় ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২০

৩২ অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব, যশোর জেলায় ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১, পৃ. ১২৭

৩৩ এ ,এফ, এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

৩৪ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

৩৫ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

৩৬ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), সূফীয়ায়ে কিরাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর অবদান

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অবদান

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) বাংলায় আগমন করেন। বিশেষ করে তিনি ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রথমে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের বারবাজারে তারপর পর্যায়ক্রমে মুড়লী (যশোর), পায়গ্রাম কসবা, খানপুর, বিদ্যানন্দকাটি, মাগুরাঘোনা, তালা, ভাঙ্গানলতা, খলিফাতাবাদ তথা বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে তাঁর কর্মসূচী চালিয়ে যান। এ সময় তাঁর সাথে অনেক শিষ্য যোগ দেয়। তারা তাঁর সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে থাকেন এবং তিনি এতদাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ইসলামের আলো পৌঁছিয়ে দেন। দলে দলে অমুসলিমগণ তাঁর কর্মে ও ইসলামের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেন। আর এই মসজিদগুলো ছিল ইসলাম প্রচারের প্রাণকেন্দ্র । এক্ষেত্রে তিনি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর নীতি অনুসরণ করেন। তিনি মহানবীর অনুকরণে মসজিদ নির্মাণ করেন। যেটি একদিকে ছিল ইবাদতখানা, অপরদিকে ছিল ইসলাম প্রচারের প্রাণকেন্দ্র, দরবারগৃহ ও শিক্ষাকেন্দ্র । এ অঞ্চলের লোকজন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান যুগ যুগ ধরে স্মরণ করে আসছে। ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে তিনি এ অঞ্চলের সামাজিক কর্মকাণ্ডও চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি তৎকালীন সময়ে মানব কল্যাণার্থে অসংখ্য দিঘি, পাকা রাস্তা, সরাইখানা, সেনানিবাস, বসতবাটি প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাঁর অসংখ্য কীর্তিরাজি এখনো তাঁর কর্মে প্রমাণ করছে। তাঁর এই কর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণের সেবা করা। তিনি জনসাধারণের নিকট তার সুশাসন ও ন্যায় বিচার পৌঁছিয়ে দেন। তাইতো তিনি মানুষের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছেন। এই মহান সাধক ও কর্মবীরের জীবন বড় বর্ণাঢ্য । বহু জ্ঞান-পিপাসু পাঠক তার জীবন সম্পর্কে জানতে উদগ্রীব। কিন্তু এ পর্যন্ত তার কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তেমন কোন গবেষণা কর্ম রচিত হয়নি। বিশেষ করে ইসলাম প্রচার ও খলিফাতাবাদ নগর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তার সঠিক ও যথাযথ মূল্যায়নের জন্যে গবেষণা কর্ম হওয়া অতি জরুরী। তবে তাঁর জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও তা পাঠক সমাজের সকল চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। এসব কারণে আমি "দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) -এর অবদান" শীর্ষক তথ্যবহুল এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির এ পর্যায় বিশ্লেষণ করার প্রয়াস রাখছি ঃ -

Dhaka University Institutional Repository

৬.১ দক্ষিণবঙ্গে আগমন ও ইসলাম প্রচার

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় আগমন করেন।[১] আরও জানা যায়, তিনি গৌড়ের পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম সুলতান নাসির-উদ্‌দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রি:) এর সময় বাংলায় আগমন করেন।[২]

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) মূলত নদীপথে দক্ষিণবঙ্গে আগমন করেন। কারণ তখন বাংলায় আগমনের একমাত্র পথ ছিল নৌপথ। তবে যতদূর জানা যায়, তাতে তিনি গৌড় হতে পদ্মা নদী দিয়ে মেহেরপুরের নিকটবর্তী ভৈরব নদীতে প্রবেশ করেন। আর তখন দক্ষিণবঙ্গে আগমনের একমাত্র পথ ছিল ভৈরব নদী। এরপর সেখান থেকে চুয়াডাঙ্গা হয়ে ঝিনাইদহ এবং ঝিনাইদহ হতে যশোরের বারবাজারে উপনীত হন।[৩] আর তিনি এই বারবাজারে আগমনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আস্তানা স্থাপন এবং জনসেবাসহ ইসলাম প্রচার শুরু করেন। শুধু তাই নয়, দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচার কার্যের সুবিধার্থে তিনি বহু মসজিদ ও সড়ক নির্মাণ এবং জন কল্যাণার্থে বহু দিঘি খনন করেন। এ পর্যায়ে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাঁর আগমন ও ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদানের উপর আলোকপাত করা হলো ঃ

৬.১.১ বারবাজারে আগমন ও ইসলাম প্রচার

দক্ষিণবঙ্গে আগমনের সময় হযরত খান জাহান আলী (রহ:) বিভিন্ন স্থানে খানকাহ স্থাপন করে ইসলাম প্রচার ও জনসেবামূলক কাজ করেন।[৪] বারবাজার তন্মধ্যে একটি স্থান যেটি যশোর জেলা শহর থেকে ১৬.১০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে যশোর ঝিনাইদহ প্রধান সড়কের নিকটবর্তী মৃত প্রায় ভৈরব নদের পাশে অবস্থিত ।[৫] কথিত আছে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ও তাঁর এগার জন সঙ্গী (আউলিয়া)সহ প্রথমে বারবাজারে আগমন করেন। আর এ স্থান থেকেই তাঁর দক্ষিণবঙ্গ জয়ের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বারবাজার[৬] অতি প্রাচীনতম স্থান।

বারবাজার নামকরণের বহু তথ্য অনুসন্ধানের পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) সহ মোট বারজন আউলিয়া এ স্থানে আগমন করেন। ফলে তাঁদের স্মরণেই এ স্থানের নামকরণ হয় বারবাজার। আরও জানা যায় যে, বারজন আউলিয়া অধ্যুষিত স্থান বলেই সে জায়গার নাম হলো বারবাজার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, কুমিল্লায় একটি বিলের নাম হয়েছে বার আউলিয়ার বিল। কারণ বারজন আউলিয়া নাকি বিল দিয়ে একবার হেঁটে গিয়েছিলেন।

অপরদিকে একটি দরগার নাম বার আউলিয়ার দরগাহ। মূলত এভাবেই বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানের নামকরণ হয়েছে।[৭] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ব্যতীত বাকি যে এগারজন আউলিয়া তাঁর সহযাত্রী

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ-

১.	এখতিয়ার খাঁ	২.	আ'যম খাঁ
৩.	আনোয়ার খাঁ	৪.	শাহাদত খাঁ
৫.	রেজাই খাঁ	৬.	বদর খাঁ
৭.	ছুটি খাঁ	৮.	কেদার খাঁ
৯.	শের খাঁ	১০.	দিদার খাঁ
		১১.	আহমদ খাঁ।[৮]

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ও তাঁর এগারজন সঙ্গী সহ (আউলিয়া) এ বারবাজারেই সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৯] উক্ত জরাজীর্ণ ঐতিহাসিক মসজিদটি আজও হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর কীর্তি ঘোষণা করছে। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি বাগেরহাটের পশ্চিমে রণবিজয়পুর ফকির বাড়িতে অবস্থিত হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অন্যতম কীর্তি মসজিদের আকৃতি বিশিষ্ট।[১০] এ মসজিদের দেয়াল গাত্রের প্রশস্ততা 8Error! ফুট। দীর্ঘ দিন যাবৎ উক্ত মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ১৩৩৪ (বাং) সালে ফুরফুরার মরহুম পীর মওলানা আবু বকর সিদ্দিক সাহেব এখানে এসে পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে নামাজ পড়া আরম্ভ করেন।[১১] তখন থেকে অদ্যাবধি বারবাজারের মসজিদটি লোকজনের নিকট অতি পবিত্র মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে এবং পাঁচ ওয়াক্তসহ জুমার নামাজ আদায় হয়। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ইসলাম প্রচারের সুবিধার্থে এখানে একটি খানকাহ[১২] শরীফ নির্মাণ করেন। আর এই খানকাহ শরীফে নবাগত মেহমানদের সাথে তিনি অমায়িকভাবে মিশতেন এবং তাদেরকে দীনের তালিম দিতেন আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অনেক নসিহত করতেন।[১৩]

শুধু তাই নয়, বারবাজারে কয়েকটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এবং তাঁর খননকৃত কয়েকটি বিরাট দিঘির চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। এগুলো হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর কীর্তি বলে অনুমিত হয়।[১৪] কথিত আছে যে, বিখ্যাত চাঁদ সওদাগরের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল এ বারবাজারে যা মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধ এ তিন সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলেমিশে সুন্দর সুশৃঙ্খল-রূপে গড়ে তুলেছিল। কে বা কারা এ নগরীর পত্তন করে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়।[১৫]

ভারতবর্ষের মধ্যে বারবাজার একটি প্রধান বাণিজ্য বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) যখন এ স্থানে আগমন করেন, তখন এটা ছিল একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।[১৬] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর আগমনের পর এ এলাকায় আরও উন্নতি সাধিত হয় এবং তাঁর মধুর ব্যবহার ও সুমিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় ইসলাম ধর্মের কথা শুনে বিভিন্ন স্থান হতে লোকেরা দলে দলে বারবাজারে এসে ভীড় করতে থাকে। তিনি তাওহীদের মর্মবাণী প্রচার করতে শুরু করেন। ফলে অতি দ্রুত তাঁর প্রচারিত বাণী ও সুনাম সুখ্যাতি বারবাজারের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১৭]

জনসাধারণের মধ্যে তাঁকে এক নজর দেখা ও তাঁর সুমিষ্ট ভাষা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় । সে কারণে বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন বারবাজারে এসে সমবেত হতে থাকে। এ এলাকার লোকজন তার সাধুতা ও সেবামূলক কার্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে।[১৮] তাঁর নির্মিত বারবাজারের প্রথম মসজিদে লোকজন এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ফলে দিন দিন শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চতুর্দিকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে।[১৯] এমনকি বারবাজারে তাঁর অবস্থানের দরুন এ স্থানটি মুসলমানদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং এ এলাকার মানুষের ইসলামি মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে এখানকার গ্রামগুলোর নামকরণও পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন ঃ - সাদিকপুর, দৌলতপুর, রহমতপুর, এনায়েতপুর, মুরাদগড় ও হাসিলবাগ প্রভৃতি। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালে এ অঞ্চলটি ছিল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল।[২০]

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর জনহিতকর কার্যাবলী ও ইসলাম প্রচারে মুগ্ধ হয়ে এতদাঞ্চলের অধিকাংশ লোকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হন। আর এভাবে বারবাজারে ইসলাম প্রচার সম্পন্ন হলে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁর দু'জন বিশ্বস্ত শিষ্য গরীব শাহ ও বাহরাম শাহ এর উপর বারবাজার এলাকার প্রশাসনিক দায়িত্বভার অর্পন করেন এবং তিনি ইসলাম প্রচারের তাগিদে বারবাজার ত্যাগ করে মুড়লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

৬.১.২ মুড়লী কসবায় আগমন ও ইসলাম প্রচার

মুড়লী অতি প্রাচীন স্থান। এটা ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। তৎকালে এখানে ছিল বৌদ্ধ সংঘারাম । মধ্যযুগে এখানে আরও ছিল সেনাবাহিনীর জন্য একটি কেল্লাবাটি।[২১] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) সেখানে ইসলাম প্রচারের একটি কেন্দ্র সংস্থাপন করেন এবং তিনি ঐ স্থানের নাম রাখেন মুড়লী কসবা। কসবা ফার্সি শব্দ । এর অর্থ শহর, কেননা তাঁর আগমনের ফলে এটা শহরে পরিণত হয়।[২২]

মুড়লী কসবা বর্তমান যশোর জেলার একটি উপশহর।[২৩] সেকালে বারবাজার হতে মুড়লী কসবা পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার নাম ছিল গাজীর জাঙ্গাল এবং গাজীর জাঙ্গালের যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু হলো খাজালীর বা হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর জাঙ্গাল বা রাস্তা। অদ্যাবধি বাগেরহাটে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দরগাহ পর্যন্ত এই রাস্তার অস্তিত্ব বিদ্যমান।[২৪] তাছাড়া এখানে হাজী মুহাম্মদ মহসিন কর্তৃক স্থাপিত ইমাম বাড়ি আজও বিদ্যমান রয়েছে। এটা একটা ঐতিহাসিক স্থান।[২৫] হযরত খান

Dhaka University Institutional Repository

জাহান আলী (রহ:) মুড়লীতে বেশিদিন অবস্থান করেননি। তারপরও তিনি এখানে ও এর পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে অনেকগুলো দিঘি খনন, মসজিদ নির্মাণ ও পাকা রাস্তা তৈরি করেন। ফলে এ স্থানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়।[২৬] যশোর জেলা তখন ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিপূর্ণ । তাদের পরোক্ষ শাসন ও শোষণ এবং মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন ও নিপীড়নের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। মানব কল্যাণ ও মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রেম-প্রীতি, সাম্য-মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপন কল্পে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ও তাঁর দু'জন বিশ্বস্ত সহচর হযরত গরীব শাহ ও হযরত বাহরাম শাহকে সেখানে ইসলাম প্রচার কার্যে নিযুক্ত করেন।[২৭] তাঁরা মুড়লী ও তাঁর আশ-পাশের সকল স্তরের মানুষের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শের কথা অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেন। ফলে ইসলাম প্রচারে মুগ্ধ হয়ে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বহুলোক বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দরবারে ভীড় জমাতে থাকে এবং তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী শুনে তারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে অসংখ্য অমুসলিম দলে দলে স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[২৮] শুধু তাই নয়, তাঁর নিকট মানব জীবনের সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করে নব মুসলমানদের ঈমান ও ইয়াকীন আরও দৃঢ়তর হতে থাকে। ধর্মপ্রচার ও মানব সেবা এ দু'টি ছিল হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বধর্মের প্রতি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধাশীল এবং পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা ছিল তাঁর অপর বৈশিষ্ট্য। তিনি কোন ধর্মের নিন্দা বা সমালোচনা করতেন না। তবে তিনি মানুষকে শিরক ও কুফুরের প্রতিক্রিয়া ও কুফল সম্বন্ধে বোঝানোর জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।[২৯] আর এ কাজে তিনি সফলও হন পরিপূর্ণভাবে। এভাবে মুড়লী কস্‌বা শহরে পরিণত হয়। তখন হযরত খান জাহান আলী (রহ:) মুড়লীতে হযরত গরীব শাহ্ ও হযরত বাহরাম শাহ্ নামক তাঁর দু'জন সহচরকে রেখে যান। তাঁরা হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর নির্দেশিত মতে সেখানে ইসলামের দাওয়াতি কার্য চালু রাখেন।[৩০] মুড়লী কসবা থেকে সামনে এগুবার সময় হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁর অনুচরবর্গ দু'ভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে একদলকে কপোতাক্ষ নদী বেয়ে সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলের বেতকাশি এবং অন্যদল ভৈরবকূল দিয়ে পায়গ্রাম কসবায় পাঠান।

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) ইসলাম প্রচারের জন্য যে দলটিকে সুন্দরবন থেকে বেতকাশি পর্যন্ত প্রেরণ করেছিলেন, এখন সেই দলের উপর আলোচনা করার প্রত্যাশা রাখছি ঃ -

কপোতাক্ষ নদের তীর ঘেঁষে সুদূর সুন্দরবনের বেতকাশি পর্যন্ত ইসলামের মর্মবাণী পৌছানোর জন্য যে দলটি অগ্রসর হন তার নেতৃত্বে ছিলেন বুড়ো খাঁ[৩১] এবং তাঁর পুত্র ফতেহ খাঁ। ইসলাম প্রচারক এই বাহিনী ক্রমান্বয়ে রাস্তা তৈরি করে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন সংলগ্ন বেতকাশি পর্যন্ত অগ্রসর হন। রাস্তাটি সম্প্রারিত ছিল খানপুর, কেশবপুর, বিদ্যানন্দকাটি হয়ে মাগুরাঘোনা, ভাঙ্গানলতা, ভায়ড়া, তালা, কপিলমুনি

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে সরলগ্রাম পর্যন্ত যান। এরপর শিবসা নদী অতিক্রম করে আমাদি, মসজিদ কুড় হয়ে বেতকাশি পর্যন্ত যান।[৩২]

দক্ষিণবঙ্গের এ স্থানগুলোতে তাঁরা খানকাহ স্থাপনসহ নানা রকম কর্মকাণ্ডে অবদান রাখেন। যা এখনো তাদের কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে ।

৬.১.৩ খানপুরে আগমন ও ইসলাম প্রচার

হযরত বোরহান খাঁ ও তাঁর পুত্র কতেহ খাঁর নেতৃত্বাধীন বাহিনী হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর হেদায়াত ও দোয়া নিয়ে আল্লাহর দীনের দাওয়াত তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য এক মহানব্রত নিয়ে যশোর ত্যাগ করে সাতক্ষীরায় প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি খানপুরে অবস্থান নিলেন। এ স্থানের পূর্বনাম জানা যায় না, তবে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর উপাধি খান শব্দের দ্বারা সে স্থানের নামকরণ করা হয় খানপুর।[৩৩] যা বর্তমান তালা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। জানা যায়, সে সময় এ এলাকায় অল্প সংখ্যক মুসলমানদের বাস ছিল। কিন্তু তাদের ঈমান আমলের ব্যাপারে কোন ধারণা ছিল না। এই ইসলাম প্রচারক দল সেখানে অবস্থান নিয়ে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের মাঝে ঈমান ও আমলের পরিপূর্ণতা আনতে সক্ষম হন।[৩৪]

আর এ দলের ধর্মীয় আচরণ, চরিত্রের মাধুর্য ও আমলের নিষ্কলুষতা দেখে মুগ্ধ হয়ে বহু অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৩৫] ফলে খানপুর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়। খানপুরে ও তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ ইসলাম প্রচারের কথা আজও স্মরণ করে তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে থাকে।

৬.১.৪ বিদ্যানন্দকাটিতে[৩৬] আগমন ও ইসলাম প্রচার

খানপুরে দাওয়াতি কার্য সমাধা করে তাঁরা বিদ্যানন্দকাটিতে আগমন করেন। খানপুরের মত এখানেও ইসলাম প্রচার ও ইসলামের অধ্যাত্ম মানুষের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছাতে থাকেন। ফলে এ এলাকার অনেক বিধর্মী স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৩৭] এই ইসলাম প্রচারক দল এখানকার মানুষের সুপেয় পানির অভাব পূরণার্থে একটি বিরাট আয়তনের দিঘি খনন করেন। এ দিঘিটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ে বিভিন্ন মতানৈক্য রয়েছে। যেমন ঃ- Bengal District Gazetteers Jessore (১৯১২) এর ১৪১ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, এ দিঘির দৈর্ঘ্য ২৩৫৮ ফুট এবং প্রস্থ ১০৬২ ফুট।[৩৮] অনুরূপভাবে Bangladesh District Gazetteers Jessore (১৯৭৯) এর ৩০২ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, এ দিঘির

Dhaka University Institutional Repository

দৈর্ঘ্য ২৩৫৮ ফুট এবং প্রস্থ ১০৬২ ফুট।[৩৯] অন্যদিকে নূরুল্লাহ মাসুম বিদ্যানন্দকাটি দিঘির দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাপ সম্বন্ধে বলেন যে, এ দিঘির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪০০ ফুট এবং প্রস্থ ১০০০ ফুট।[৪০]

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তিটি অত্যন্ত Authentic বলে আমি মনে করি।

এ দিঘির সুপেয় পানীয় স্থানীয় জনগণ এ পীরের কারামত তথা অলৌকিক বলে মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে পান করে থাকে।[৪১] উল্লেখ্য যে, সমগ্র সুন্দরবন এলাকার পানি লবণাক্ত হলেও এর ফলে বিশেষ করে এ দিঘির পরিচিতি গোটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দিঘিটির পানি খুবই সুপেয় বা মিষ্টি। বিদ্যানন্দকাটিতে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর নামে একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও এখানে বছর শেষে হযরত খান জাহান আলী (রহ:)এর নামে মেলা (ওরস) হয়।[৪২] দেশ-বিদেশের বহু ভক্তগণ এ মেলায় (ওরসে) অংশ গ্রহণ করেন। এ বিদ্যানন্দকাটির নিকটবর্তী গ্রাম সরফাবাদ ও মির্জাপুর গ্রামেও কয়েকটি দিঘি খনন করেন।[৪৩]

এ সরফাবাদ গ্রামটির নাম নিয়ে নানা কথা রয়েছে । যেমন ঃ- Bangladesh Population Census (1974)এর ১১৪নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত গ্রামটির নাম সরফাবাদ।[৪৪] অন্যদিকে শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র তার "যশোহর খুলনার ইতিহাস" গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, বিদ্যানন্দকাটির নিকটবর্তী গ্রামটির নাম হচ্ছে সারবাবাদ বা সারবাবাজ।[৪৫] তেমনি ব্যতিক্রমভাবে এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল তার "সুন্দরবনের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলেন যে, উক্ত গ্রামটির নাম হলো সরফাবাজ।[৪৬]

উপর্যুক্ত আলোচনায় এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, বিদ্যানন্দকাটির নিকটবর্তী গ্রামটির নাম সরফাবাদ রাখাই যুক্তিযুক্ত। কারণ Bangladesh Population Census (1974) এর বর্ণনাটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে আমি মনে করি। অন্যদিকে তালা থানার ত্রিমোহিনীর সন্নিকটে গোপালপুরে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দু'জন[৪৭] শিষ্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৪৮] গোপালপুরের দক্ষিণে কপোতাক্ষের কূলে মেহেরপুর গ্রামে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অপর শিষ্য পীর মেহের উদ্‌দীনের মাযার বিদ্যমান। উক্ত পীরের নামে সে স্থানের নাম হয় মেহেরপুর।[৪৯] কথিত আছে, মেহেরপুরে তখন কোন গ্রাম বা লোকালয় ছিল না। তিনি স্বীয় খানকাহর পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। ক্রমে বহু লোক এসে তার খানকাহর চতুর্দিকে বসতি স্থাপন করতে থাকে। মেহেরপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী চতুর্দিকে পীর মেহের উদ্‌দীন বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি এতদাঞ্চলের লোকের নিকট পীর মেহের উদ্‌দীন নামেই সুপরিচিত।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

পীর মেহের উদ্‌দীনের ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবার ফলে এ অঞ্চলের মানুষ অতি সহজে ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সেজন্য এ অঞ্চলের মানুষ আজও তার অবদানের কথা স্মরণ করে তার রূহের মাগফেরাত কামনা করে থাকে।

৬.১.৫ আমাদি মসজিদকুড়ে আগমন ও ইসলাম প্রচার

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অনুচর বোরহান খাঁ ও ফতেহ খাঁর কর্মস্থল ছিল আমাদি। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর প্রেরিত ইসলাম প্রচারক এ দল সুন্দরবনের নিকট আমাদিতে পৌছান। আর এটাই ছিল তাদের শেষ সীমানা। এখানে তাঁরা খানকাহ স্থাপন করেন। তাঁরা এখান থেকে সুন্দর বনাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[৫১] ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে নানাবিধ জন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডও চালিয়ে যান। পরবর্তী কালে এখান থেকে তাঁরা শাসনকার্যও পরিচালনা করতেন।[৫২] তদানীন্তন কালে সুন্দর বনাঞ্চলে সুশৃঙ্খলিত সরকার না থাকলেও হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর শিষ্যরা খলিফাতাবাদ হতে মুরশিদের নির্দেশ নিয়ে বিচার কার্যও করতেন।[৫৩] এখানে পূর্ববর্তী হিন্দু ও মুসলমান আমলের অনেক কীর্তি এখনো বর্তমান।[৫৪] তারা পরবর্তীকালে আমাদি-কে কেন্দ্র করে সমগ্র সাতক্ষীরাঞ্চলের সকল স্থানে গ্রাম-গঞ্জে, মহল্লায়-মহল্লায় ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফলে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দর বনাঞ্চলে ইসলাম প্রচার প্রসারে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। সে কারণে এ অঞ্চলের মানুষ তাদের অবদানের কথা অতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকেন।

৬.১.৬ বাগেরহাটে আগমন ও ইসলাম প্রচার

অন্য দলটি ভৈরব নদীর তীর ধরে সামনের দিকে চলছিল, সে দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত খান জাহান আলী (রহ:)। তিনি তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে ভৈরব নদীর তীর ঘেঁষে সামনে এগুতে থাকেন। এ অঞ্চলেও চলার কোন পথ ছিল না, পুরো অঞ্চলই ছিল সুন্দরবন এলাকার নিকটে। সারি সারি বন আর অসংখ্য নদী-নালা ও খালের দেশ সেটা, রাস্তা-ঘাট তৈরি করবে কে? পথ চলার শুধুমাত্র উপায় নৌকা, তাও নিরাপদ নয়। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে সামনের দিকে চলছেন। সৈন্যরাই রাস্তা তৈরি করছে। খাবার পানির দরকার, তাই খনন করা হচ্ছিল দিঘি। দু'টো লাভ - একাধারে দিঘি খনন এবং সেই মাটি দিয়ে রাস্তা তৈরি। সুন্দরবন অঞ্চলে নদীর পানি লবণাক্ত । আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে নদীর কাছাকাছি খনন করা দিঘির পানি কিন্তু ততটা লবণাক্ত হয় না। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার কারণেই দিঘির পানি সুপেয় হতো।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) পথিমধ্যে রামনগর গ্রামে একটি বড় দিঘি খনন করেন। এ দিঘিটি যশোর-খুলনা সড়ক পথে যশোর হতে ৬.৪৪ কিলোমিটার দূরে রাস্তার ডানদিকে অবস্থিত। যেটি বর্তমানে শাহ্বাটির দিঘি নামে সুপরিচিত এবং এটা এখন বনভোজন কেন্দ্রে (Picnic Corner) পরিণত হয়েছে ।[৫৬]

ইতোমধ্যেই দিঘির চেহারা সুন্দর করার জন্য চারধারে প্রচুর গাছ লাগান হয়েছে এবং বাউণ্ডারী দেয়া হয়েছে। কোন ক্লান্ত পথিক অনায়াসেই পথ চলতে গিয়ে এখানে বিশ্রাম নিতে পারে। আর এ দিঘির পানি সুপেয় অর্থাৎ মিষ্টি। তাঁর এ ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ উপলব্ধি করে এ অঞ্চলের লোকজন তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গী হন।

এরপর হযরত খান জাহান আলী (রহ:) শাহ্বাটির দিঘির কার্য সমাপনান্তে সিঙ্গিয়া স্থান ঘুরে পায়গ্রাম কসবায় সদলবলে আগমন করেন। তিনি সর্বপ্রথম যে স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন, সেই স্থানের নাম হচ্ছে খাঞ্জেপুর। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর নামানুসারেই এ নাম হয়েছে। এ স্থানের আদি নাম জানা যায় না। অবশ্য তিনি এ শহরের নাম রাখেন 'পায়গ্রাম[৫৭] কসবা'।

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁর সঙ্গী সাথীদের অনেককেই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন। ফলে গড়ে উঠে নতুন বসতবাটি। জানা যায় যে, তিনিও এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি অবস্থান-কালে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি এলাকার শাসনদণ্ডও হাতে নেন। তবে অন্যান্য শাসকদের মত তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মেতে উঠেন নি। তিনি যেখানেই পদার্পণ করেছেন, সেখানেই ইসলামের আদর্শ প্রচার করেছেন। ফলে লোকজন ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর চরিত্র ও ব্যবহারে অভিভূত হয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের মর্মবাণী ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার জন্য কোন স্থান জয় করার পর নিজে সে অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ না করে, অন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করে সামনের দিকে অগ্রসর হন।[৫৮]

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) পায়গ্রাম অবস্থান কালে খানকাহ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। ফলে সঙ্গী-সাথীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অনুমতি প্রদান করেন। এই গ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি একটি রাস্তাও নির্মাণ করেন।[৫৯] রাস্তাটির উত্তর দিকের নাম উত্তর ডিহি[৬০] ও দক্ষিণ দিকের নাম দক্ষিণ ডিহি;[৬১] এখনো এ স্থানে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর খননকৃত সানের পুকুর, আঁধার পুকুর ও দুধ পুকুরের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।[৬২] এ গ্রামের চারিদিকে তাঁর নির্মিত রাস্তার চিহ্ন এখনো দেখা যায়। এ স্থানের পাশেই অধুনা ঈদগাহ । এরই সন্নিকটে একখানা মনোরম প্রস্তর পড়ে অছে। ওটা এখন খাঞ্জালী কীর্তির একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর কতিপয় সঙ্গী এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আরও জানা যায়, তাঁর বংশধরদের কেউ কেউ এখনো এ গ্রামে বসবাস করছেন।[৬৩] এখানে অবস্থান কালেই

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত পীরালী-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। পীরালীগণ ইতিহাস খ্যাত। এখানকার দায়িত্ব তার প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ তাহিরকে দিয়ে সদলবলে পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেন।[৬৪]

তিনি বাগেরহাট যাওয়ার পূর্বে পায়গ্রাম কসবা হতে পূর্বদিকে বাসুড়ী গ্রামে আস্তানা গাড়েন। তথায় তিনি জনগণের পানীয় অভাব পূরণার্থে একটি বিরাট দিঘি খনন করেন। আজও তাঁর সৃষ্টি প্রায় ২৩.৩৪ একর দিঘিটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। দিঘির পাড়ে অনেক ফলবান বৃক্ষে ভরপুর। এখানে প্রতি বছর হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর স্মরণে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।[৬৫] সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি সদলবলে আবার ভৈরব নদী পার হয়ে দক্ষিণ পাড়ে যান। এখানে শুভরাড়া বা শুভড়া গ্রামে অবস্থান করেন। এখানেও এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ অদ্যাবধি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সগর্ব উপস্থিতি ঘোষণা করছে।[৬৬]

উল্লেখ্য চাঁদ সওদাগর, যার বিশাল বাণিজ্য নৌবহর ছিল, তার বাড়িও ছিল এই গ্রামে। তার সপ্তডিঙ্গা মধুকর ইতিহাস বিখ্যাত। কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন চাঁদ সওদাগর হযরত খান জাহান আলী (রহ:)-এর আমলের মানুষ। অন্যেরা কিন্তু তা মানতে চায় না।

যাহোক, হযরত খান জাহান আলী (রহ) শুভরাড়া গ্রাম থেকে রানাগাতি, গোপীনাতপুর এবং নাউলী হয়ে ধূলগ্রামে আগমন করেন। তিনি বেশি দিন এর কোন স্থানেই থাকেন নি। এরপর ধূলগ্রাম হতে ভৈরব নদীর তীর ধরেই তিনি সিদ্ধিপাশা গ্রামের মধ্যদিয়ে বারাকপুরে আসেন।[৬৭] তিনি বারাকপুর[৬৮] হতে সদলবলে ঘোষগাতি ও দিঘলিয়ার মধ্য দিয়ে পুনরায় ভৈরব তীরের উত্তর পাশে অবস্থান নেন। সেই স্থানটা বর্তমানে খুলনা বি.এল.কলেজের খুবই নিকটে অবস্থিত। আজও ব্রহ্মগাতি গ্রামে দু'টি খাজালী দিঘি রয়েছে, যা হযরত খান জাহান আলী (রহ:) স্মৃতি ধারণ করে আছে ।

এরপর হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ব্রহ্মগাতি থেকে ফরমায়েশ খানা, সেনহাটি ও চন্দনীমহল গ্রামের মধ্য দিয়ে আতাই নদীর তীরে আসেন এবং আতাই নদী অতিক্রম করে সোলপুরের সেনের[৬৯] বাজারে উপনীত হন। যা বর্তমানে খুলনার উপশহর।[৭০]

এ সকল স্থানে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) সামাজিক উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি জামে মসজিদ। যার চারকোণে চারটি সুদৃঢ় মিনার রয়েছে[৭১]। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ও তাঁর সৈন্য-সামন্ত আর পীর আউলিয়াদের বিশাল বহর নিয়ে তিনি অগ্রসর হন তালিমপুর, শ্রীরামপুর, নৈহাটি ও সামন্তসেনা[৭২] প্রভৃতি অঞ্চল একের পর এক জয় করে সোজা সাতসিকা ও আট টাকার পার্শ্ব দিয়ে রাধদিয়ায়[৭৩] পৌঁছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তিনি রাংদিয়া ত্যাগ করে মধুদিয়া, আকরা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে বাদখালীর বিল অতিক্রম করে বাগেরহাটের সন্নিকটে প্রাচীন ভৈরব নদীর তীরে সুন্দরঘোনা গ্রামের উপকণ্ঠে পৌঁছলেন এবং তিনি এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন।[৭৪] তাই অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে গড়ে উঠতে থাকে ঘর-বাড়ি। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ও তাঁর অনুচরবর্গ পবিত্র ইসলামের সাম্য-মৈত্রী, প্রেম-প্রীতি আর শান্তির অমিয় বাণী নিয়ে বাগেরহাট জয় করেন এবং এর নতুন নামকরণ করেন খলিফাতাবাদ।[৭৫] এ নামকরণের ব্যাপারে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর ইসলামের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ পেয়েছে। মুসলমানদের আবাসভূমি বলেই তিনি সম্ভবত খিলাফতের স্মরণে এরূপ নামকরণ করেন। যেমন- মুসলিম শাসনামলে চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে ইসলামাবাদ রাখা হয়েছিল।

খলিফাতাবাদ বা খলিফাতে আবাদ একটি বিশেষ ঐতিহাসিক নাম। এর বর্তমান নাম হচ্ছে বাগেরহাট। কুইপিট শব্দের অর্থ- খলিফাত আর আভাজ শব্দের অর্থ হলো আবাদ। অর্থাৎ পর্তুগীজ ভাষায় খলিফাতাবাদকেই কুইপিটাভাজ বলা হয়।[৭৬]

ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে তিনি এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা, যোগাযোগের জন্য মহাসড়ক ও সেতু নির্মাণ, সুপেয় পানির জন্য বহু সংখ্যক দিঘি খনন, খাদ্যের জন্য উন্নত কৃষি ও ইবাদতের জন্য অসংখ্য মসজিদ এবং শিক্ষার জন্য মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[৭৭] তাঁর শিষ্যবর্গকে তিনি শুধু ধর্মই শিক্ষা দিতেন না বরং ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি কর্ম শিক্ষাও দান করতেন। তাদের শিক্ষা ছিল "ইবাদত বজুব খেদমতে খালুকে নিত" । অর্থাৎ - ইবাদাত জনসেবা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৭৮]

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) খলিফাতাবাদ নগর প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এর মধ্যে অসংখ্য মসজিদ, রাস্তা-ঘাট, দিঘি প্রতিষ্ঠা ও খনন করেন। এখন আমি সে সব নিয়ে বিশ্লেষণের নিরিখে আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করছি ঃ--

৬.১.৭ ষাট গম্বুজ মসজিদ (পরিশিষ্ট- ১)

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম চিত্তাকর্ষক নিদর্শন স্বরূপ বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদটিকে আখ্যায়িত করা হয়। যেটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্যিক নিদর্শন রূপে বিদ্যমান। তিনি দক্ষিণবঙ্গের বিশাল এলাকা জয় করে তৎকালীন গৌড়ের পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম সুলতান নাসির উদ-দীন মাহমুদ শাহের (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রি:) সম্মানে বিজিত অঞ্চলের নামকরণ করেন খলিফাতাবাদ। এরূপ অসাধারণ একটি ভবন সময়ের করাল গ্রাসে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ সরকার এর সংস্কার ও মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ধারাবাহিকভাবে এ-প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। বিশ শতকের আশির দশকের শুরুতে ইউনেস্কো-র (UNESCO) উদ্যোগে এই ঐতিহাসিক পুরাকীর্তিটির রক্ষণাবেক্ষণে এক কার্যকরী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং তা বর্তমানে শেষের পর্যায়ে।

নামকরণ ঃ 'ষাটগম্বুজ' এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে ষাটটি গম্বুজ বিশিষ্ট। তবে প্রকৃতপক্ষে মসজিদটিতে একাশিটি গম্বুজ পরিলক্ষিত হয়, মসজিদের ছাদে সাতাত্তরটি এবং বাকি চারটি চার কোণের কর্ণার টাওয়ারের উপর। এ ব্যাপারে দু'টি বিশ্লেষণ রয়েছে। যেমন - কেন্দ্রীয় নেভের উপর স্থাপিত সাতটি চৌচালা ভল্ট মসজিদটিকে 'সাতগম্বুজ' মসজিদ হিসেবে পরিচিত করে, কিন্তু সময় পরিক্রমায় এই 'সাতগম্বুজই 'ষাটগম্বুজ' রূপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্লেষণ অনুসারে মসজিদের বিশাল গম্বুজ-ছাদের ভারবহণকারী মসজিদ অভ্যন্তরের ষাটটি স্তম্ভ সম্ভবত একে 'ষাট খাম্বাজ' (খাম্বাজ অর্থ স্তম্ভ) হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলে। এটি অসম্ভব নয় যে, এই 'খাম্বাজ' শব্দটিই পরবর্তীকালে বিকৃতরূপে 'গম্বুজ' এ পরিণত হয়ে মসজিদটিকে ষাট গম্বুজ হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছে।[৭৯] শেষোক্ত বিশ্লেষণটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। ষাট গম্বুজ (৬০) মসজিদ বলা হলেও মূলত এর গম্বুজ সংখ্যা অনেক বেশি। তবে মূল মসজিদের ছাদটি যেহেতু ষাট গম্বুজ বিশিষ্ট এজন্য একে ষাট গম্বুজ মসজিদ বলা হয়। ষাট গম্বুজ মসজিদের নামানুসারে গ্রামটির নামও ষাট গম্বুজ হয়েছে। বাগেরহাট থেকে খুলনার পথে রওয়ানা করে কলেজ ষ্টেশনের পরে যে রেল ষ্টেশনটি হয়েছে তাও ষাট গম্বুজ ষ্টেশন নামে অভিহিত। এ মসজিদটি আজ (২০০৪) থেকে প্রায় ৫৫৫ বছর পূর্বে তৈরি হয়েছিল।[৮০]

ভূমি নকশা ও বর্ণনা ঃ প্রাচীর বেষ্টিত মসজিদটি বর্তমান বাগেরহাট শহর থেকে ৪.৮৩ কিলোমিটার পশ্চিমে ঘোড়া দিঘির পূর্বপাড়ে অবস্থিত।[৮১]

প্রাচীর বেষ্টিত মসজিদ প্রাঙ্গনে প্রবেশের জন্য শুরুতে দু'টি প্রবেশপথ ছিল। তন্মধ্যে একটি পূর্বদিকে এবং অন্যটি উত্তর দিকে। বর্তমানে পূর্ব দিকের প্রবেশ পথটি পুনঃনির্মাণ করা হলেও উত্তর দিকেরটি বর্তমানে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পূর্ব দিকের প্রবেশ পথটি, যা নিজেই একটি স্বতন্ত্র ভবনের দাবিদার, মসজিদের কেন্দ্রীয় খিলানপথ বরাবর স্থাপিত। খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথটি দীর্ঘ ৭.৯২ মিটার ও চওড়া ২.৪৪ মিটার। এটি পুরু ২.৪৪ মিটার এবং এর উপরিভাগ সুদৃশ্যভাবে বাঁকানো।[৮২] মসজিদ অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য খিলান পথ রয়েছে। পূর্ব প্রাচীরে এগারটি, উত্তর এবং দক্ষিণ প্রাচীরে সাতটি করে, পশ্চিম প্রাচীরে রয়েছে একটি খিলানপথ। ষাট গম্বুজ মসজিদটি প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। সেই সময়ে বাংলাদেশে এত বড় মসজিদ আর ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিশালকায় হর্মের সম্মুখ দিকে মাঝখানে একটি বড় খিলান, এর পাশে উভয় দিকে পাঁচটি করে ছোট খিলান রয়েছে। এর প্রাচীরের প্রশস্ততা ৯ ফুট। ষাট গম্বুজ মসজিদ ও হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাধি-সৌধ তথা স্থাপত্য বৈচিত্রে ভাস্বর ।

ষাট গম্বুজ মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ে বিভিন্ন মতানৈক্য রয়েছে, যেমন- Bengal District Gazetteers Khulna (১৯০৮) এর ১৬৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, ষাট গম্বুজ মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৫৯ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ১০৫ ফুট।[৮৩]

অনুরূপভাবে Bangladesh District Gazetteers Khulna (১৯৭৮) এর ৩৭৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, ষাট গম্বুজের দৈর্ঘ্য ১৫৯ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ১০৫ ফুট।[৮৪] অপরদিকে Ahmad Hasan Dani ষাট গম্বুজ মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সম্বন্ধে বলন যে, এর দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট।[৮৫]

অনুরূপভাবে Dr. Syed Mahmudul Hasan এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমন্ধে বলেন যে, ষাট গম্বুজ মসজিদের দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট ।[৮৬]

অনুরূপভাবে বাংলা বিশ্বকোষ চতুর্থ খণ্ডের ৫০৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, এর দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট ।[৮৭]

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিবরণটি যথার্থ নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। ষাট গম্বুজ মসজিদের অভ্যন্তরে গম্বুজের উচ্চতা ২১ ফুট ৭ ইঞ্চি।[৮৮]

অসংখ্য গম্বুজ সমৃদ্ধ মসজিদের বিশাল ছাদটির ভারবহন করছে মসজিদ অভ্যন্তরীস্থ স্তম্ভসারি। মসজিদের উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত ছয়টি স্তম্ভসারি বিদ্যমান। প্রতিটি সারিতে দশটি করে স্তম্ভ রয়েছে। তাই মসজিদটিতে মোট ষাটটি স্তম্ভ রয়েছে। যার বেশিরভাগই সরু প্রস্তর নির্মিত। তবে এর মধ্যে ছয়টি বিশালকার। স্তম্ভ গুলো হয় ইট, নতুবা পাথরের ব্লক দ্বারা বেষ্টিত। দেখে মনে হয় প্রথম থেকেই এগুলো এরকম। সবগুলো প্রস্তর স্তম্ভই দুই অথবা তিনটি পাথরের ব্লক একটির উপর আরেকটি স্থাপন করে প্লাগ-হোল পদ্ধতিতে এবং লোহার দণ্ড প্রবিষ্ট করে নির্মিত। সরু প্রস্তর স্তম্ভগুলোর স্তম্ভ শীর্ষ (Capitals) ও ভিত্তি (Pedestals) বর্গাকার এবং এদের মধ্যবর্তী অংশ অষ্টভুজাকার।[৮৯] সম্প্রতি ইটের একটি বাড়তি স্তর তৈরি করে এগুলোকে আদি রূপে সংস্কার করা হয়েছে।

অলঙ্করণ ঃ ষাট গম্বুজ মসজিদের অলঙ্করণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পোড়ামাটির ফলক ও ইট সংযোগে সাধিত হয়েছে। এ সকল গোলাকার গম্বুজের হেলানভাব। সরল অলঙ্করণ ও কার্নিসের বক্রতায় তোঘলক স্থাপত্য রীতির প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট । এর ভেতর বাইরে বিশেষ করে খিলানের উভয় পাশের ত্রিভূজাকার অংশে ফুল, লতাপাতা ইত্যাদি পোড়ামাটির অলঙ্করণ আছে। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) রীতির

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্যের মাঝে মাঝে বহুবর্ণে রঞ্জিত মীনা করা চাকচিক্যময় টালির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব-পশ্চিমে ৬০ টি প্রস্তর স্তম্ভের উপর সাতটি করে এগার শ্রেণীতে সর্বমোট ৭৭ টি গম্বুজ আচ্ছাদিত একটি আয়তাকার স্থাপত্য নিদর্শন।[৯০]

সত্তরটি গম্বুজ গোলাকৃতির মধ্যের সারিতে চৌকোণা বিশিষ্ট সাতটি গম্বুজ রয়েছে। এ গম্বুজগুলো চৌচালা রীতিতে নির্মিত। মসজিদের দরজার সংখ্যা মোট পাঁচিশটি । 'পশ্চিম দিকের দরজাটি ছোট। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ও অমাত্যগণ দরবারের কাজ চলার সময় এ দরজা দিয়ে যাতায়াত করতেন।' [৯১] এ মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় মেহ্‌রাবের পাশে নির্মিত ক্ষুদ্র প্রবেশপথ। এটি উত্তর ভারতের কিছু মসজিদে দেখা যায়, তবে বাংলায় অপ্রচলিত। এই রীতিটি সম্ভবত আদি মুসলিম স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত মসজিদ থেকে ধার করা হয়েছে। আদি মুসলিম স্থাপত্যে মসজিদ পশ্চাতের এই প্রবেশপথটি ব্যবহৃত হতো খলিফা, গভর্নর বা ইমাম কর্তৃক। তাই এই পথটি ব্যবহৃত হতো খলিফাতাবাদের শাসক হযরত খান জাহান আলী (রহ:) কর্তৃক । যার বাসস্থান মসজিদের উত্তর দিকে সামান্য দূরত্বেই অবস্থিত ছিল।[৯২] মসজিদের চার কোণে চারটি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। ছাদ হতে কয়েক ফুট উচ্চ এবং এর মাঝে ক্ষুদ্র কুঠরি আছে। ঘুরানো সিড়ি ছিল পূর্ব দিকের দু'টো মিনারের মধ্যে । এর একটির নাম "আঁধার কোঠা" , অন্যটি "রওশন কোঠা"[৯৩]

Bangladesh District Gazetteers Khulna (১৯৭৮) এর ৩৭৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, এই সুউচ্চ মিনারে উঠে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর গুপ্তচরগণ বহিঃশত্রুর যাতায়াত পর্যবেক্ষণ করতেন।[৯৪] এছাড়া Sir John Marshall "ষাট গম্বুজের" মিনার সম্বন্ধে বলেন, ষাট গম্বুজের চারকোণের মিনারগুলো তোঘলক স্থাপত্য শিল্পের জ্বলন্ত নিদর্শন। এর আভ্যন্তরীণ প্রশস্ত স্থান অতীব সুন্দর। তবে প্রস্তর স্তম্ভের আধিক্যের জন্য এর সৌন্দর্য কিছুটা ম্লান হয়েছে।[৯৫] এভাবে মসজিদটি "ষাট গম্বুজ" নামে সুপরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এর গম্বুজ সংখ্যা ষাট নয়, বরং এর গম্বুজ সংখ্যা সর্বমোট ৮১টি। ৬০ টি খাম্বা বা থামের (Pillar) উপর ৭৭ টি গম্বুজ এবং চার কোনে ৪টি গম্বুজ রয়েছে।[৯৬]

ষাট গম্বুজের মিনারে দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন উচ্চ স্বরে আজান দিয়ে নামাজের জন্য মুসল্লিদেরকে আহ্বান করতেন।[৯৭] এ মসজিদটি ঠিকই নামাজের জন্য ব্যবহৃত হতো, তবে এতে শাসনকার্য পরিচালনার্থে মাঝে মাঝে দরবার বসতো।[৯৮] তুর্ক-আফগান আমলে এদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রবর্তন হয়। তদানীন্তন কালে প্রত্যেক মসজিদে আরবী, ফার্সি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো। জানা যায়, তিনি মসজিদ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কর্মসমূহ মসজিদেই হতো। লণ্ডনে প্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থে

Dhaka University Institutional Repository

(The Cambridge History of India) ষাট গম্বুজের একটি সুন্দর ফটো দেয়া হয়েছে এবং এর স্থাপত্য শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।[৯৯]

তৎকালে মসজিদটি দেয়াল ঘেরা ছিল । এখন শুধু পূর্বদিকের তোরণসহ সামান্য দেয়াল পরিদৃষ্ট হয়। তোরণ গাত্রে এবং মসজিদে অসংখ্য লতাপাতা, পদ্মফুল ও অন্যান্য মনোরম নক্সাও উৎকীর্ণ ছিল। এখনো ভারত উপমহাদেশে এ মসজিদটি গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।[১০০]

এ মসজিদের নির্মাণ শৈলী ও ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল বলেন, 'এ উপমহাদেশে তুর্ক-আফগান স্থাপত্যের মধ্যে ষাট গম্বুজ বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছে। প্রস্তর বিহীন সুন্দরবন এলাকায় এ বিশালকায় অট্টালিকা যে মর্মর স্বপ্নের স্থান অধিকার করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।' [১০১]

ষাট গম্বুজের স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে L.S.S. O'Malley (ed.) বলেন যে, 'ওটা হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাধি সৌধের স্থাপত্য শিল্প অপেক্ষা নিম্নমানের। O'Malley- এর মতে এটা একটি ভোজনালয়।[১০২] আজও ষাট গম্বুজ পরিদর্শনে দৈনিক অসংখ্য লোকের ভীড় হয়। প্রতি বছর চৈত্র-পূর্ণিমায় যে মেলা হয়, সে সময় অগণিত দর্শক এ অট্টালিকা দেখে তৃপ্তি লাভ করে এবং এর স্থাপত্য শিল্প দর্শনে স্তম্ভিত হয়ে যায়।[১০৩] বিশালকায় জলাশয় পার্শ্বে বিশালকায় মসজিদ ও দরবারগৃহ এর নির্মাণ কর্তার অন্তরের বিশালতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ষাট গম্বুজ হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর প্রধান সৌধ। এটা নির্মাণ করতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল এবং অসংখ্য দেশী -বিদেশী রাজমিস্ত্রী নিয়োজিত ছিল। কথিত আছে যে, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) জৌনপুর হতে দক্ষ মিস্ত্রী আনয়ন করে, এ সুরম্য হর্মের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেছিলেন। জৌনপুর তখন স্বাধীন ছিল এবং সম্ভবত জৌনপুর রাজ্যের শাসনকর্তার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[১০৪]

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) কোন স্বাধীন সুলতান না হয়েও দক্ষিণবঙ্গে মানবতার কল্যাণে যে বিশাল কীর্তিরাজি রেখে গেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর অমর কীর্তি ষাট গম্বুজ মসজিদের নির্মাণ শৈলী যে শৈল্পিক সৌন্দর্যকে সম্রাট শাহ্জাহানের তাজমহলের নির্মাণ শৈলী ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করলে অত্যুক্তি হবে না। তিনি ছিলেন মহৎ হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর অন্তরের বিশালতা ছিল আকাশের মত, যার কারণে প্রজা মঙ্গলের জন্য এত অধিক জনহিতকর কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

জলীল সাহেব ঠিকই বলেছেন, "বিশালকায় জলাশয় পাশে বিশালকায় মসজিদ ও দরবার গৃহ উহার নির্মাণ কর্তার অন্তরের বিশালতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।"[১০৫]

Dhaka University Institutional Repository

ষাট গম্বুজ মসজিদ একদিকে যেমন স্থাপত্য শিল্পে অনন্য স্থানের অধিকারী, অপরদিকে এটা দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারের মূল কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, ষাট গম্বুজ মসজিদটি তিনটি কাজে ব্যবহৃত হতো। যেমন -১. উপাসনামূলক সমাবেশ হিসেবে, ২. আদি মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত সংসদভবন হিসেবে, ৩. এবং পারস্যের আর্দিস্তানের ইসপাহান জামি বা মসজিদ-ই-জামি মাদ্‌রাসা হিসেবে।[১০৬]

৬.১.৮ ঘোড়াদিঘি (Ghora Dighi)

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) বাগেরহাট আগমন করে সর্বপ্রথম বিশালকায় একটি দিঘি খনন করেন, যার নাম ঘোড়াদিঘি। 'এটি ষাটগম্বুজের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।'[১০৭] এ দিঘিটির আয়তন প্রায় ১০০ একর।[১০৮] এ ঐতিহাসিক দিঘিটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর চিরস্থায়ী কীর্তি। এর গভীরতা কোন কোন স্থানে ২৫ ফুটের অধিক। দিঘিতে বার মাস পানি থাকে। এর পানি সুপেয়। এতদাঞ্চলে গভীর জলাশয় বিরল। বাংলাদেশের অন্যতম এ দিঘিটি প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর পূর্বে খনন করা হয়। 'এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০ ফুট এবং প্রস্থ ১২০ ফুট।'[১০৯] চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন চারিদিকের পানি শুকিয়ে যায়, তখনও এ দিঘিতে প্রায় ১৮ ফুট পানি থাকে ।[১১০] এ দিঘির নাম নিয়ে প্রবাদ রয়েছে। 'এক দৌড়ে একটি ঘোড়া যতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিল; ততদীর্ঘ দিঘি খনন করা হয়েছিল। এজন্য ঘোড়াদিঘির নাম হয়েছে।'[১১১] কেউ বলেন এ নাম হয়েছে এ কারণে যেহেতু হযরত খান জাহান আলী (রহ:) দিঘিটি খননের পর ঘোড়া নিয়ে পরিদর্শন করেছিলেন বলে। এছাড়া আরও জানা যায়, এখানে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ ও ঘোড় দৌড় হতো বলে এ নাম হয়েছে।[১১২]

উক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় বর্ণনাটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে আমি মনে করি। দিঘিতে বিভিন্ন ধরনের মাছও রয়েছে । পূর্বে এতে কুমীর ছিল, কিন্তু এখন নেই।[১১৩]

৬.১.৯. হযরত খান জাহান আলী (রহ:)এর বসতবাটি (Residential Quarters of Hazrat Khan Jahan Ali (R.)

ষাট গম্বুজ মসজিদ থেকে একটি খাঞ্জালী রাস্তা উত্তরমুখী হয়ে ভৈরব পর্যন্ত এবং অন্য রাস্তাটি পূর্ব দিকে বাগেরহাট শহর পর্যন্ত আর তৃতীয় রাস্তাটি উত্তরমুখী হয়ে নদীর তীর দিয়ে প্রথম রাস্তার সাথে মিশেছে। এই শেষোক্ত রাস্তার পশ্চিম পাশেই ভৈরব তীরে হযরত খান জাহান আলী (রহ:)এর গড়বেষ্টিত বাড়িটি ছিল। গড়ের চিহ্ন বর্তমানে আর নেই বললেই চলে। তবে এখানে কয়েক খানা বিশাল প্রস্তর স্তম্ভ পড়ে রয়েছে। তাই এখানে সোনা মসজিদ নামে একটি মসজিদ ছিল।[১১৪] প্রবীণ লোকেরা এই মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখেছেন। "বাড়ীর সংলগ্ন এই মসজিদে সম্ভবতঃ খান জাহান দৈনন্দিন নামাজ আদায়

Dhaka University Institutional Repository

করিতেন।"[১১৫] পূর্বদিকে ছিল বাড়ির সদর। নদীর তীরে পাকা ঘাট ও হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর আবাস বাটির তোরণ ছিল। এর পাশেই ছিল ছিলেখানা বা অস্ত্রাগার। রক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে শান্তি রক্ষা হতো। বাড়ির দেয়াল ছিল প্রায় ৮ ফুট এবং প্রশস্ত ছিল প্রায় ৫ ফুট। লোকেরা এই বাড়িকে সোনা বিবির বাড়ি বলে।[১১৬] এই প্রাচীরের বেষ্টনী সর্বাপেক্ষা অধিক কারণ এখানেই হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর নিজস্ব বাড়ি এবং অস্ত্রাগার ছিল।

কথিত আছে যে, তিনি অস্ত্র-সস্ত্র, ইষ্টক ও মৃন্ময়পাত্র প্রস্তুতের জন্য কর্মকার, কুম্ভকার,রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারিগর সাথে এনেছিলেন।

ঘোড়াদিঘি খনন, ঘাট গম্বুজ ও স্বীয় বসতবাটি নির্মাণের পর হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এখানেই স্থায়ীভাবে শেষ জীবন অতিবাহিত করার মনস্থ করেছিলেন। তিনি যে অগনিত ধন-ভান্ডার সঙ্গে এনেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

আর এ বাড়ির পরিধি কতটুকু ছিল তা সঠিকভাবে বলা দুরূহ। তবে বাড়ি বলতে এখন (২০০৪ খ্রি:) কিছুই নেই। আছে শুধু ইট পাথরের ধ্বংসস্তূপ। এমনকি ইটগুলোও বেশিরভাগ সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে পড়ে রয়েছে শুধু অজস্র ইটের টুকরা আর বেশ কয়েকটি বড় বড় পাথরের টুকরা। এগুলো ছিল খুব সম্ভব কোন ইমারতের স্তম্ভ।[১১৭]

"হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর আবাসবাটি এলাকায় প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে দু'টি মসজিদ ছিল বলে জানা যায়। একটির নাম ছিল সোনা মসজিদ। এখন মসজিদ দু'টির কোন চিহ্ন নেই।"[১১৮] তিনি সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গল আবাদ করে লোকালয় স্থাপন করেন। বিশেষ করে বাগেরহাটের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলও তিনি আবাদ করে মসজিদ, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, দিঘি খনন এবং ধর্ম চিন্তা ও ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়।

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত খলিফাতাবাদ নগরে জীবনকাল কাটান এবং তাঁর ইন্তেকালের পরও এ শহর জনাকীর্ণ ছিল। খলিফাতাবাদ নগরের সীমানা সম্পর্কে Bangladesh Population Census (1974)- এ এভাবে বর্ণনা দিয়েছে। যেমন ঃ- পশ্চিমে সায়েড়া, শদুল্লাপুর হতে পূর্বে বোটপুর পর্যন্ত এ শহর প্রায় ১১.২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল। দিঘিরপাড় , কাড়াপাড়া, সিংড়াই, বাদেকাড়াপাড়া, খাঁরদুয়ার, বোটপুর, ফতেপুর, সোনাতলা, সরাই, মুনিগঞ্জী, রণবিজয়পুর, হরিনখানা, মুন্সীগঞ্জ দশআনী, কাঁঠাল, বাগমারা, দারিতালুক, কুলিয়াদইড়, জোয়ারেরকুল পোলঘাট, রাজাপুর, মগরা, পাটেরপাড়া, দেওয়ালবাটি, ফুলতলা, বাসাবাটি, সুন্দরঘোনা, বারাকপুর, নোনাডাঙ্গা, চুনাখোলা, নির্জাপুর, প্রভৃতি গ্রাম খলিফাতাবাদ নগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১১৯] সর্বত্র অসংখ্য জলাশয়, বসতবাটির নিদর্শন, মসজিদ,

Dhaka University Institutional Repository

গোরস্থান প্রভৃতি দর্শনে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ নগরে সর্বত্র ঘন বসতি ও অসংখ্য লোকের বাস ছিল। এখনো যে কোন স্থান খনন করলে ইষ্টক ও পাথর পাওয়া যায়। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) বহু মসজিদ ও অসংখ্য দিঘি খনন করেছেন। তবে বাগেরহাট অঞ্চলে ২৫/২৬ টি বড় বড় দিঘি ব্যতীত আরও বহু পুকুর ও জলাশয়ের চিহ্ন রয়েছে।[১২০] যাহোক, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর শহর মগরার খাল ও ভৈরব নদীর উভয় তীর হতে দক্ষিণে মোস্তফাপুর ও কাড়াপাড়ার বিল পর্যন্ত প্রায় ৬.৪৪ কিলোমিটার প্রশস্ত ছিল। নগরের সর্বত্র আজও তাঁর কীর্তিরাজি দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে নদীর তীরে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর আবাসবাটী ও তোরণ ছিল; তথা হতে রাস্তা মগরার খালের কূল দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে পূর্বদিকে গিয়েছিল। এখন ভৈরবের প্রাচীন খাতকে মগরার খাল বলা হয়।[১২১] এরই পশ্চিম তীরে জাহাজ বোঝাই হয়ে দেশ-বিদেশ হতে বাণিজ্যপোত পণ্য সম্ভারের আমদানি ও রপ্তানি কার্য চালাতো এবং নগর নির্মাণের প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র এ স্থানে অবতরণ করা হতো। এ স্থানের নাম হচ্ছে জাহাজঘাটা। অদ্যাবধি মগরা গ্রামে রাস্তার পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ পাথরের স্তম্ভ জাহাজঘাটার স্থান নির্দেশ করছে।[১২২]

৬.২ হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অন্যান্য কীর্তিরাজি

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর প্রতিষ্ঠিত খলিফাতাবাদ নগরী সুরক্ষিত ছিল। প্রত্যেক রাস্তার প্রবেশদ্বারে রক্ষীদের অবস্থানের স্থান আজও দেখতে পাওয়া যায়। রক্ষীরা নগরের শান্তিরক্ষা সাধারণের গতিপথ নির্দেশ প্রভৃতি কার্য পরিচালনা করতো। ষাট গম্বুজ মসজিদ হতে বাগেরহাট পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্ব দিয়ে এখনো বহু দিঘি, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও প্রস্তর খণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে তাঁর জীবনের বহুমুখী কীর্তিরাজির উপর আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করছি ঃ --

৬.২.১ রণবিজয়পুর মসজিদ (পরিশিষ্ট- ২)

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর বাড়ি থেকে প্রায় ১.৬১ কিলোমিটার পূর্বদিকে রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি মসজিদ রয়েছে। এটি রণবিজয়পুর গ্রামে অবস্থিত বলে রণবিজয়পুর মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়।[১২৩] এ মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট যা দেখতে খুবই মনোরম।[১২৪]

পেয়ালা আকারে নির্মিত এ বিরাট ও উঁচু গম্বুজ যেন একটা দর্শনীয় বস্তু। নিচের দিকে (Base) গম্বুজের ব্যাস ৩৬ ফুট। এতবড় গম্বুজওয়ালা মসজিদ বাংলাদেশের আর কোথাও নেই।[১২৫] 'বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেকবাহু বাইরের দিকে ৫৬ ফুট এবং ভেতরের দিকে ৩৬ ফুট লম্বা। ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরগুলো প্রায় ১০ ফুট প্রশস্ত।'[১২৬]

Dhaka University Institutional Repository

চার কোণে চারটি গোলাকার মিনার বা টারেট রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে রয়েছে তিনটি দরজা। পত্রাকৃতির খিলানের সাহায্যে প্রবেশ পথগুলো নির্মিত। উত্তর ও দক্ষিণের দেয়ালে তিনটি অলঙ্কৃত মেহরাব রয়েছে।[১২৭]

আরও জানা যায় যে, মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে দরজা রয়েছে। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি সুন্দর মেহরাব। আর মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দু'টো জানালা রয়েছে যাতে ভেতরের বাতাস প্রবাহিত হতে পারে।[১২৮] এ রণবিজয়পুর মসজিদটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর আমলে নির্মিত হয়েছিল। ফলে এর গঠন-প্রণালী ও স্থাপত্য কৌশলই তা প্রমাণ করে।[১২৯]

৬.২.২ বিবি বেগিনীর মসজিদ (পরিশিষ্ট- ৩)

বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত ষাট গম্বুজ ইউনিয়নের মগরা নামক গ্রামে এ মসজিদটি অবস্থিত।[১৩০] বিবি বেগিনীর এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদকে সিঙ্গার ও রণবিজয়পুর মসজিদের সাথে তুলনা করলে অত্যুক্তি হবে না। কারণ এ তিনটি মসজিদের আকার আকৃতি যেন একই রূপের।[১৩১] এ মসজিদটি বর্গাকারে তৈরি। এর প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে প্রায় ৫০ ফুট লম্বা এবং ভেতরের দিকে প্রায় ৩২ ফুট লম্বা।[১৩২] দেয়ালগুলো হযরত খান জাহান আলী (রহ:) আমলের ইটের তৈরি ও প্রায় ১০ ফুট প্রশস্ত। চারকোণে চারটি গোলাকার মিনার বা টারেট রয়েছে। "মসজিদের পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে দরজা রয়েছে।"[১৩৩] ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে তিনটি মেহরাব, এগুলো পূর্ব দেয়াল বরাবর। মেহরাবগুলোতে ছিল অতি সুন্দর চিত্রফলক। এখনো সেগুলোর কিছু চিহ্ন দেখা যায়। বর্তমানে ছাদের উপরে একটি মাত্র গম্বুজ রয়েছে যেটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) আমলের। এ মসজিদের গম্বুজটি চারদিকের ছাদের উপরে নির্মিত হয়েছে। তলদেশে এর ব্যাস প্রায় ৩২ ফুট ।[১৩৪] মসজিদের চারদিকের বেষ্টনী ছিল প্রাচীর। বেষ্টনী প্রাচীরের বাইরে উত্তর -পূর্ব কোণে বেশ কয়েকটি পাকা কবর ছিল। এখনো এগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিবি বেগিনীর কবর ছিল কিনা কেউ বলতে পারে না। এ মসজিদকে কেন বিবি বেগিনীর মসজিদ বলা হয়? বহু অনুসন্ধানের পরও কোন তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর আমলের এ মসজিদটি বহুকাল ধরে জীর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল।[১৩৫] বর্তমানে এটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণে এসে তার পূর্ব শ্রী কিছুটা ফিরে পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৩ চুনাখোলা মসজিদ (পরিশিষ্ট- ৪)

বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত খানপুর ইউনিয়নের চুনাখোলা নামক গ্রামে একটি মাঠের মধ্যে এ প্রাচীন মসজিদটি অবস্থিত।[১৩৬] এ মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকারে তৈরি। এটি চুনাখোলা গ্রামে অবস্থিত বলেই এর নামকরণ হয়েছে এরূপ। চারিদিকে চাষের জমির মাঝখানে লোকালয়ের বাইরে এ ভগ্ন মসজিদের অস্তিত্ব যেন নিঃসঙ্গতার বেদনার প্রতীক। তাই সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক মসজিদটির ব্যাপক মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।[১৩৭] বাইরের দিকে এর প্রত্যেক বাহু প্রায় ৪১ ফুট ও ভেতরের দিকে ২৫ ফুট লম্বা। দেয়ালগুলো ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি পুরু। মসজিদের বাইরের চারকোণে রয়েছে চারটি মিনার বা টারেট। এগুলো খান জাহানী রীতি অনুযায়ী গোলাকার এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে ঢালাই করা ব্যাণ্ড দ্বারা বিভক্ত।[১৩৮] ইমারতের তিনটি কার্নিস চিরাচরিত বাংলার স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী বাঁকানো। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর-দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে মোট পাঁচটি ধনুকাকৃতির খিলান দরজা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দরজার প্রশস্ততা পূর্ব দেয়ালের মাঝের দরজার সমান। কিবলা দেয়ালের অভ্যন্তরভাগে পূর্বদিকের প্রবেশ পথ বরাবর খিলানযুক্ত তিনটি ধনুকাকৃতির মেহরাব রয়েছে।আয়তাকার কেন্দ্রীয় মেহরাবটি চিরাচরিত নিয়মে দেয়ালের বাইরে সম্প্রসারিত এবং তা ছাদ পর্যন্ত উঁচু। সম্পূর্ণ ছাদ জুড়ে অর্ধগোলাকৃতির বিশাল গম্বুজটি ভেতরের দিকে স্কুইঞ্চের উপর স্থাপিত।[১৩৯]

মসজিদে ব্যবহৃত পোড়ামাটির অলঙ্করণে তেমন কোন স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়নি। অলঙ্করণের ক্ষেত্রে জালির কাজ, ফুল ও লতাপাতার ডিজাইন, যুক্ত বৃত্ত, বিষমকোণী চতুর্ভুজ এবং প্রচলিত ঝুলন্ত মোটিফ স্থান পেয়েছে। বর্তমানে এ অলঙ্করণগুলো শুধু মেহ্‌রাবের কুলুঙ্গীতে খিলানের উপরে এবং কার্নিসে লক্ষ্য করা যায়।[১৪০] চুনাখোলা মসজিদের গাত্রে কোন শিলালিপি নেই। তবে স্থানটি জনশ্রুতি মতে মসজিদটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর কোন কর্মচারী নির্মাণ করেছিলেন। নির্মাণরীতিতে এর সমর্থন মেলে।

৬.২.৪ সিঙ্গার মসজিদ (পরিশিষ্ট- ৫)

বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত ষাট গম্বুজ থেকে প্রায় ৯০০ ফুট দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সুন্দরঘোনা গ্রামে সিঙ্গার মসজিদ নামে একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে।[১৪১] সিঙ্গার মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট যা রণবিজয়পুর মসজিদের ন্যায়। তবে তুলনামূলক সিঙ্গার মসজিদটি ছোট কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর।[১৪২]

১. বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৪১ ফুট এবং ভেতরের দিকে ২৫ ফুট লম্বা।[১৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

২. অপরদিকে আ.কা.মো.যাকারিয়া বলেন, বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৩৯ ফুট এবং ভেতরের দিকে ২৫ ফুট লম্বা।[১৪৪]

উপর্যুক্ত দু'টি বর্ণনার মধ্যে প্রথমটি আমার নিকট অত্যন্ত Authentic বলে প্রতীয়মান হয়। ইষ্টক নির্মিত এ সিঙ্গার মসজিদের প্রাচীরগুলো প্রায় ৭ ফুট প্রশস্ত। চারকোণে চারটি মিনার রয়েছে। সেগুলোর নিম্নাংশ প্রায় নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম। উপরের অংশ এবং ক্ষুদ্র গম্বুজগুলো অদ্যাবধি টিকে আছে।[১৪৫]

এ মসজিদের পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। আর উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে রয়েছে একটি করে প্রবেশ পথ।[১৪৬] এ দরজা দু'টোর দু'পাশে প্রত্যেক দেয়ালেই রয়েছে দু'টো করে কুলুঙ্গী (Niche)। মসজিদটির কেন্দ্রীয় দরজা বরাবর পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে একটি অলঙ্কৃত মেহ্‌রাব।[১৪৭] এ মেহ্‌রাবের উভয় পার্শ্বে পূর্ব দেয়ালের প্রবেশ পথ দু'টোর বরাবর পশ্চিম দেয়ালে দু'টো কুলুঙ্গী (Niche) রয়েছে । মসজিদের ছাদের মাঝখানে বিরাট আকারের একটি গম্বুজ রয়েছে এবং এর উপর এখন অনেক গাছ জন্মেছে।[১৪৮] এ সিঙ্গার মসজিদটি যেন হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অন্যতম একটি কীর্তি যাতে কোন দ্বিধা নেই।

এ মসজিদটির মেরামত সম্বন্ধে Khoundkar Alamgir বলেন যে, " This mosque has been renovated but the cornice and the top of the four corner towers are still incomplete."[১৪৯]

৬.২.৫ নয় গম্বুজ মসজিদ (পরিশিষ্ট- ৬)

ঠাকুর দিঘি বা খাজালী দিঘির পশ্চিম পাড়ে নয়টি গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে বলে একে নয় গম্বুজ মসজিদ বলা হয়।[১৫০] "তিন সারিতে ৩টি করে মোট নয়টি গম্বুজ রয়েছে এ মসজিদের ছাদে। পশ্চিম দিক ব্যতীত অন্য তিন দিকেই তিনটি করে দরজা রয়েছে।"[১৫১] মসজিদের বাইরে ও ভেতরের দেয়ালগুলো ২০ ফুট করে উঁচু এবং অপূর্ব কারুকাজ খোদিত প্রতিটি ইট প্রবেশ দ্বারে ব্যবহৃত হয়েছে। দেয়ালে বিভিন্ন লতা-পাতা ও ফুল অলঙ্কিত রয়েছে। গম্বুজগুলো ছয়টি স্তম্ভের উপর অবস্থিত।[১৫২] কয়েক বছর পূর্বে মসজিদটির চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মসজিদটি সংস্কার করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে (To bring or Restored) এনেছে। "ষাট গম্বুজ মসজিদ ছাড়া এতবড় ও এমন সুন্দর মসজিদ বর্তমান বাগেরহাট অঞ্চলে আর দেখা যায় না।"[১৫৩]

বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু প্রায় ৫৪ ফুট লম্বা। দেয়ালগুলো ৮Error! ফুট প্রশস্ত। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে ৪টি পাথরের স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলো ১১ ফুট উঁচু ।[১৫৪] এ ৪টি স্তম্ভ ও চার পাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ৯টি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজগুলো দেখতে অতি মনোরম। এ স্তম্ভগুলোর মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপের মত একটি গর্ত রয়েছে।[১৫৫] কথিত আছে এ দাগটি পীর সাহেবের বৃদ্ধাঙ্গুলের দাগ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাদটা হলো, একদিন পীর[১৫৬] সাহেব পাথরটা শক্ত কি না পরখ করার জন্য চাপ দিলে, সে চাপ পাথর সইতে না পেরে নরম হয়ে তার বুকে আঙ্গুলের ছাপ ধারণ করে নিয়েছিল। ভক্তরা এখানে গিয়ে চোখের পানি ফেলে চুমু খায়।[১৫৭]

মসজিদের চারদিকে অনেক জায়গা জুড়ে বেষ্টক প্রাচীর ছিল। সেই দেয়াল এখন ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু তার চিহ্ন আছে। মসজিদ অঙ্গনে আরও কিছু ইমারত ছিল বলে ধারণা হয়। অঙ্গনের বাইরেই একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মসজিদের উত্তরে হযরত খান জাহান আলী (রহ:)-এর মাযারের খাদেমদের বসতবাটী।[১৫৮] মসজিদে কোন শিলালিপি নেই। এ মসজিদটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তাছাড়া মসজিদের গঠন প্রণালী এবং স্থাপত্য কৌশলই তা প্রমাণ করে।[১৫৯]

৬.২.৬ মসজিদকুড় মসজিদ[১৬০] (Masjidkur Masjid)

(আনু. ১৪৫০ খ্রি:)

আমাদি একটি গ্রামের নাম।[১৬১] এটি খুলনা শহর থেকে প্রায় ৫৬.৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, সাতক্ষীরা জেলা শহর থেকে প্রায় ৪৮.৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং আগ্রা কপিলমুনি থেকে প্রায় ২৪.১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সময়ে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। কালক্রমে এ স্থান পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে এবং মসজিদটি আংশিকভাবে মাটি চাপা পড়ে।[১৬২]

পরবর্তীকালে এ স্থান যখন আবাদ শুরু হয়, তখন জঙ্গল কেটে মাটি খুঁড়ে মসজিদটিকে নতুন করে আবিষ্কার করা হয়। এ স্থানের নতুন নামকরণ হয় মসজিদকুড় বলে। তাই এ মসজিদটির নামকরণও হয় মসজিদকুড় মসজিদ নামে।[১৬৩] এ মসজিদটি সুন্দরবন অঞ্চলের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।[১৬৪]

এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বর্গাকারে নির্মিত। এর বাইরের দিকে ৫৪ ফুট ও ভেতরের দিকের মাপ ৪০ x ৪০ ফুট এবং দেয়ালের ভিত্তি ৭ ফুট প্রশস্ত।[১৬৫] মসজিদের চারকোণে চারটি গোলাকার মিনার বা টারেট রয়েছে। পশ্চিম দিক বদ্ধ অথচ সেদিকে ভেতরে তিনটি মেহ্‌রাব বা কুলুঙ্গী (Niche) রয়েছে। অপর তিন দিকে তিনটি করে খিলান ও খোলা দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দিকেই মধ্যবর্তী দরজাটি সামান্য বড়। কিন্তু সব মসজিদের মত এরও পূর্ব দিকে সদর ছিল, সেদিকে কার্নিসে ও খিলানের উপরে ইষ্টকে কারুকার্য আছে। কতকগুলো ইষ্টকে পদ্ম উৎকীর্ণ; কতকগুলো এক প্রকার মালা বা রজ্জু নানাভাবে বিলম্বিত ও

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্ত ; Bengal District Gazetteers Khulna (১৯০৮) এর ১৮৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ওটা বঙ্গেশ্বর নাসির উদ্‌দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজচিহ্ন।[১৬৬]

মসজিদকুড়ের বিখ্যাত নয়গম্বুজ মসজিদ সুন্দরবন এলাকার একটি প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন। এর উভয় দিকে তিনটি করে মোট নয়টি গম্বুজ রয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী গম্বুজটি সামান্য কিছু বড়।[১৬৭] বাগেরহাটের সুবিখ্যাত ষাট গম্বুজ ও নয় গম্বুজ মসজিদের সঙ্গে আলোচ্য মসজিদের গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য কৌশলের যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে পণ্ডিতেরা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এ মসজিদটি অপর দু'টো মসজিদের সমসাময়িক । সুতরাং এদিক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ মসজিদটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। Sir J. Westland ও উপর্যুক্ত বক্তব্যে একমত পোষণ করেন।[১৬৮]

মসজিদকুড়ের দক্ষিণ গাঁয়ে আমাদি গ্রাম। আমাদি পুরাতন গ্রাম। এ গ্রামে বুড়ো খাঁ ও ফতেহ খাঁ উভয়ের স্থায়ী বসতি ছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। এখানে তাঁদের দু'জনেরই পাকা কবর ছিল বলে শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্র তার "যশোহর খুলনার ইতিহাস" গ্রন্থের ২৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে বলেন যে, "আমাদি গ্রামের পশ্চিম দিকে নদীর কূলে বুড়ো খাঁ ও ফতেহ খাঁ উভয়ের কবর ছিল।"[১৬৯] কপোতাক্ষ তীরে বুড়ো খাঁ ও ফতেহ খাঁর মাযার আজও বিলীন হয়ে যায়নি। বুড়ো খাঁর মাযার নদীর স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে এখনো টিকে আছে। এ মাযারের উপর দু'শত বছরের অধিক কালের একটি চাঁপা ফুলের গাছ এখনো শোভা বর্ধন করছে । এ সমাধিস্থলের সন্নিকটে তাদের গড় বেষ্টিত বাড়ি ও আস্তানা ছিল।[১৭০]

৬.২.৭. গোড়া মসজিদ (Ghora Mosque)

ইসলামি স্থাপত্যের এক অনুপম ও ঐতিহাসিক নিদর্শন বুকে ধারন করে বারবাজারের গোড়া (গোড়াই) মসজিদটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঢাকা-যশোর মহাসড়ক থেকে পশ্চিম দিকে রেললাইন পার হয়ে গরুহাটি ছেড়ে কিছুদূর অগ্রসর হলেই কাঁচা রাস্তার বাম হাতে যে মসজিদটি দেখা যায়, তার নামই গোড়া মসজিদ।[১৭১] এ মসজিদ থেকে ৯০ ফুট দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রায় ১.৬৭ একর আয়তনের একটি প্রাচীন পুকুর, যার নাম গোরাই পুকুর বা গোড়াপুকুর। সান বাঁধানো ঘাট ছিল পুকুরের পশ্চিম পাড়ে। তার কিছু নিদর্শন আজও পরিলক্ষিত হয়। 'এ মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার। প্রায় প্রত্যেক বাহু ৩০ ফুট লম্বা এবং ২০ ফুট লম্বা ভেতরের দিকে। দেয়াল হলো ৫ ফুট প্রশস্ত।'[১৭২]

চারকোণে চারটি সুন্দর মিনার রয়েছে অষ্টকোণাকৃতির। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। দরজা বরাবর তিনটি মেহরাব পশ্চিম দেয়ালে

Dhaka University Institutional Repository

আছে। পোড়া মাটির ফলকে মেহ্‌রাবগুলো লতা-পাতা ও ফুল ইত্যাদি অলঙ্করণে খচিত । মসজিদের অভ্যন্তরে চার দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে ও দেয়াল ঘেঁষে চারটি পাথরের স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের একমাত্র গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত । প্রায় অর্ধাবৃত্তাকারে উপুড় করা পেয়ালার আকৃতিতে নির্মিত গম্বুজটি দেখতে অত্যন্ত মনোরম।[১৭৩] গম্বুজের কেন্দ্রস্থলে দেড় থেকে দু'ফুট ব্যাসের একটি গোলাকার ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। গম্বুজের ঐ ছিদ্র সারাতে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৫০ জন কর্মচারী প্রায় তিন মাস পরিশ্রমের পর সক্ষম হয়। পোড়ামাটির চমৎকার অলঙ্করণ মসজিদের বাইরের দেয়ালেও ছিল। এগুলো পরবর্তীতে মেরামত করা হয়েছে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য। এক পর্যায়ে মসজিদটির সামনের দিক ছাড়া বাকি তিন দিক মাটির ঢিবির নিচে চাপা পড়ে। পরক্ষণে মাটি সরিয়ে ফেলা হয়। এখানে এখনো নিয়মিত নামাজ পড়া হয়।[১৭৪]

এটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) কর্তৃক নির্মিত বহু সংখ্যক মসজিদের একটি। যদিও আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ গ্রন্থের লেখক মসজিদটি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করে তিনি বলেন, গোরাই মসজিদের গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য কৌশল দেখে মনে হয় না যে, এটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। বাগেরহাট অঞ্চলে তাঁর সময়ে নির্মিত মসজিদগুলোর স্থাপত্য কৌশলের সঙ্গে গোরাই মসজিদের স্থাপত্য কৌশলের খুব একটা মিল নেই। 'এটির দেয়াল মাত্র ৫ ফুট প্রশস্ত।[১৭৫] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর কোন মসজিদের দেয়াল ৭/৮ ফুটের কম প্রশস্ত নয়। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) মসজিদগুলোর কোণে যে সমস্ত মিনার (turret) দেখা যায়, সেগুলো সবই গোলাকার। আর গোরাই মসজিদের মিনারগুলো অষ্ট কোণাকৃতির। গম্বুজের আকারও ঠিক খান জাহানী ষ্টাইলের নয়। এতে মনে হয়, এ মসজিদটি খান জাহান কর্তৃক নির্মিত হয়নি। এটি খুব সম্ভব হোসেন শাহ্ কিংবা তার পুত্র নসরত শাহ্ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

৬.২.৮ জিন্দাপীর পরিশিষ্ট- ৭

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর সমসাময়িক বা পরবর্তী কীর্তিরাজির মধ্যে জিন্দাপীরের সমাধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৭৬] সুদৃঢ় চারটি স্তম্ভের উপর গম্বুজ নির্মিত। এর চতুর্দিকে ইষ্টকের গাঁথুনি। জিন্দাপীরের সমাধিসৌধ প্রাচীনকালীন স্থাপত্য শিল্পের সাক্ষ্য দিচ্ছে । বর্গাকারে নির্মিত এ মাযারের প্রত্যেক বাহু ছিল ২০ ফুট দীর্ঘ। দেয়ালগুলো ছিল ৫ ফুট প্রশস্ত এবং উপরে ছিল একটি মাত্র গম্বুজ।[১৭৭] বিভিন্ন প্রকার লতা-পাতা ও আগাছা সমাধির উপর জন্মিয়ে ওটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে দেয়ালের উর্ধ্বাংশ ও গম্বুজ টিকে নেই। এখনো উত্তর দেয়ালের অনেকখানি টিকে আছে। জিন্দাপীরের

Dhaka University Institutional Repository

পাকা কবরটি ইমারতের মধ্যভাগে রয়েছে। এ সমাধির প্রতি লোকের খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতে দেখা যায়।[১৭৮] কেউ কেউ বলেন জিন্দাপীরের প্রকৃত নাম আহম্মদ খাঁ, L.S.S. O'Malley বলেন, জিন্দাফকিরের প্রকৃত নাম আহম্মদ আলী। আবার কেউ বলেন, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ আহম্মদ শাহ্ ওরফে জিন্দাপীর।[১৭৯]

এ মাযারের পশ্চিম পার্শ্বে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটা ইবাদত খানা আছে। পিতার সমাধির উত্তরে স্বীয় পুত্রের সমাধি বিদ্যমান। পরবর্তীকালে এখানে অনেকগুলো কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে গোরস্থানটির বিশেষ উন্নতি হয়েছে। খলিফাতাবাদের কীর্তিরাজি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সময় নির্মিত হয়েছিল । তাঁর তিরোধানের পর রাজধানীর আরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। জিন্দাপীরের গোরস্থানের পার্শ্বে আরও ১৩টা পাকা কবর এবং অসংখ্য কাঁচা কবর আছে। তাঁর বংশধরদের সবগুলোই কবর বলে দাবী করা হয়। জিন্দাপীর সাহেবের বাসভবন ছিল মাযারের উত্তরে, সে চিহ্ন এখনো পরিলক্ষিত হয়।[১৮০] 'গোরস্থানের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দু'টো দিঘিকে ' ছোট কোমরা' ও ' বড় কোমরা' বলা হয়। উত্তর দিকের দিঘিটা নলখাগড়া ও হাজিবনে পূর্ণ।' [১৮১]

এ গোরস্থানের জনৈক খাদেম দাবী করেন যে, জিন্দাপীর একজন শাসক দরবেশ ছিলেন এবং তিনি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর বহু পূর্বে এদেশে আগমন করেছিলেন। এ সমস্ত স্থান তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পূর্ণ ছিল এবং এর উপরেই জনবসতি গড়ে উঠেছিল। পীর সাহেবের বংশধরদের নামে পূর্বে লাখেরাজ ও পীরোত্তম সম্পত্তি ছিল । হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সঙ্গে জিন্দাপীরের সম্পর্ক কতটুকু ছিল তা জানা যায় না ।

৬.২.৯. খাঞ্জালী দিঘি (Khanjali dighi)

(১৪৫০ খ্রি:)

বাগেরহাট শহর থেকে ষাট গম্বুজ মসজিদ ও ষোড়া দিঘির দূরত্ব প্রায় ৬.৪৪ কিলোমিটার। এই প্রধান রাস্তা হতে একটি রাস্তা দক্ষিণমুখী হয়ে দরগাহ পর্যন্ত মিশেছে। এখানেই অবস্থিত হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর খনিত বৃহত্তম দিঘি ; যা ঠাকুর দিঘি নামে প্রসিদ্ধ।[১৮২] অথচ সাধারণ জনগণের নিকট এটি খাঞ্জালী দিঘি নামে সুপরিচিত।[১৮৩] এ বিশাল দিঘির ভূমির পরিমাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতানৈক্য রয়েছে। যেমন - Bangladesh District Gazetteers Khulna (১৯৭৮) এর ৩৭৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, প্রায় ১৮০ একর ভূমি জুড়ে এ বিশাল দিঘির অবস্থান।[১৮৪] অপরদিকে Muslim Monuments of Bangladesh এর গ্রন্থকার Dr. Mahmudul Hasan বলেন, এ বিরাট ভূমির পরিমাপ প্রায় ৬.৬৭ একর।[১৮৫] দৈনিক ইনকিলাব

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে, এ দিঘির ভূমির পরিমাপ প্রায় ১২০ একর।[১৮৬] আ.কা.মো. যাকারিয়া বলেন, এ বিশালকায় দিঘির ভূমির পরিমাপ প্রায় ৬৬.৬৭ একর।[১৮৭]

উপর্যুক্ত বিভিন্ন মতভেদ গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রথম বক্তব্যটি অত্যন্ত Authentic বলে সুবিদিত।

পরগণা সম্মেলনে অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ সভাপতির আসন থেকে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা হতে জানা যায় যে, এ দিঘিটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর ইন্তেকালের ৯ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে এ বিশালকায় দিঘিটি খনন করা হয়। তৎকালীন খলিফাতাবাদের জনগোষ্ঠীর সুপেয় পানির অভাব দূরীকরণার্থে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এ অঞ্চলে ৩৬০ টি ছোট বড় দিঘি ও পুকুর খনন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাঁর সমাধির নিকটস্থ খাঞ্জালী দিঘি।[১৮৮] এ দিঘির পানি অত্যন্ত সুপেয়, অনেকের মতে নানা প্রকার রোগ-পীড়া নিরাময় করে। তাছাড়া লবণাক্ত অঞ্চলে এ দিঘির পানি লোকজনের চাহিদা মেটায়।[১৮৯] এ দিঘিটির দৈর্ঘ্য ২০০০ ফুট পূর্ব-পশ্চিমে এবং প্রস্থ ১৮০০ ফুট উত্তর-দক্ষিণে।[১৯০] এর গভীরতা ৪০ ফুটের উর্ধ্বে।[১৯১] এ খাঞ্জালী দিঘির নাম নিয়ে নানা কথা রয়েছে যেমন - Bengal District Gazetteers Khulna এর ১৬৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, এ দিঘি খনন করার সময় এখানে একটি ধ্যানী বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এজন্য এটিকে ঠাকুর দিঘি বলা হয়।[১৯২] উল্লেখ্য যে, স্থানীয় আদি বাসিন্দারা ওটাকে ভুলবশত শিব ঠাকুরের মূর্তি বলে শনাক্ত করে।

এ দিঘির নামকরণ নিয়ে নূরুল্লাহ নাসুন বলেন, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধ সকলের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সকলেই তাঁকে সম্মান করতো। তখন ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা তাঁকে ' ঠাকুর' সম্বোধন করতো এবং তাঁরই বিশেষ তত্ত্বাবধানে এ দিঘিটি খনিত হয়। ফলে এ দিঘির নাম কালক্রমে ঠাকুর দিঘিতে রূপান্তরিত হয়।[১৯৩]

এ.এফ. এম. আব্দুল জলীল বলেন, পীরালী মুহাম্মদ তাহির ছিলেন হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর প্রিয়তম বন্ধু। তিনি ছিলেন পূর্বে ব্রাহ্মণ এবং হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁকে আদর করে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি তারই স্মৃতি রক্ষার্থে এ দিঘির নাম রেখেছিলেন ঠাকুর দিঘি বলে।[১৯৪]

উপর্যুক্ত বিবরণগুলো বিশ্লেষণের নিরিখে আলোচিত হয়, তাই প্রথম উক্তিটি অত্যন্ত যথার্থ বলে আমি মনে করি। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের মধ্যে " ঠাকুর দিঘির" নাম বিদ্যমান থাকলেও এ বিশালকায় দিঘিকে " খাঞ্জালী দিঘি" এবং "ঘোড়া দিঘি" কে " ষাটগম্বুজের দিঘি" বলা হয়। বর্তমানে দিঘিটি সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তথা সরকারের সংস্কারের কোন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ঝোপ-জঙ্গল ও কচুরিপানায় পরিপূর্ণ হয়ে তলদেশ ভরাট হতে চলেছে।[১৯৫] এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের আওতাধীন

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এ বিশালকায় দিঘির সংস্কারমূলক কাজ করে, এ দিঘির শ্রী বৃদ্ধি করা উচিত বলে আমি মনে করি।

সর্বজন স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের বৃহত্তম দিঘি হিসেবে এটি হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর খনিত শেষ দিঘি। যে কোন নামে এটিকে অভিহিত করলে তাঁর মহত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হবে না। এ দিঘির পাড়গুলো যেন পাহাড়ের মত উঁচু। প্রত্যেক পাড়ের মাঝখানে একটি করে প্রশস্ত পাকা ঘাট ছিল।[১৯৬] এ ঘাটগুলোতে দাঁড়িয়ে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরা কাফিরুন, সূরা আহাদ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে দীর্ঘিকার পানিতে ফুঁক দিয়েছিলেন। এমনকি দিঘির মাঝখানে আয়াতুল কুরসী পড়েও ফুঁক দিয়েছিলেন।[১৯৭]

এ দিঘিতে সারা বছর মৃদু ঢেউ লেগে থাকে। বাতাসের বেগ বাড়লে ঢেউয়ের গতি ও তাল বাড়ে, মনে হয় যেন কোন ক্ষ্যাপা হ্রদ। এ ঘাটে বসে কাটিয়ে দেয়া যায় ঘন্টার পর ঘন্টা । আর যদি এখানে বসেন কোন কবি, তাহলে তো কোন কথাই নেই। ঘাটে বসে সমীরণে মৃদু তরাঙ্গায়িত দিঘিকে সামনে রেখে নির্দ্বিধায় সে কবিতা লিখতে পারবে। এখানে দাঁড়িয়ে অনুভব হবে প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য অন্য কোথাও নেই। দিঘির দক্ষিণ ও পশ্চিম তীরে অগণিত নারকেল গাছ, সে দৃশ্যকে আরও মোহনীয় করে তুলেছে, ইচ্ছে হলেই চলে আসা যায় না। ঐ দৃশ্য ধরে রাখলে অনুভূতি আসবে আল্লাহর কী অপূর্ব সৃষ্টি, চিন্তা-ভাবনার কোন কিনারা খুঁজে পাবে না। সেখানে বসে থাকতে খুব ভাল লাগবে। এ দিঘিতে উঠা-নামার জন্য বিরাট ঘাট রয়েছে। এটি ৬০ ফুট লম্বা, এর মোট ২৮ টি সিঁড়ি রয়েছে।[১৯৮]

শত শত লোকজন রোগ নিরাময়ের জন্য এ দিঘিতে গোসল করে এবং এর স্বচ্ছ পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করে। বর্তমানে এ দিঘিতে ' ধলাপাড়' ও ' কালাপাড়' নামক কুমীরের বংশধরেরা বাস করছে। এ দিঘিতে প্রচুর মাছও রয়েছে।[১৯৯]

৬.২.১০ কুমীরের বর্ণনা (Description of Crocodile)

মুসলিম জাহানের বিশিষ্ট অলি[২০০] ও সূফী-সাধক তথা বাগেরহাটের হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাধি সৌধের দক্ষিণ পাশে ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি বিশালকায় দীর্ঘিকা খনন করা হয় যা খাঞ্জালী দিঘি নামে সুপরিচিত।[২০১]

এ দিঘির কুমীর সম্বন্ধে " দক্ষিণের বাদশাহ্ খান জাহান আলী (রহ:)" এর গ্রন্থকার নূরুল্লাহ মাসুম বলেন যে, " দক্ষিণাঞ্চলের বিপদসঙ্কুল এলাকায় প্রচুর কুমীর ছিল। এখনো আছে, তবে খুবই কম। তৎকালে পানি বৃদ্ধির কারণ অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস বা বানের পানিতে ভেসে দু'টি কুমীর এ দিঘিতে ঢুকে পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

এবং পরে আর বের হতে পারেনি বা পর্যাপ্ত স্থান, খাদ্য ও নিরাপত্তার কারণে কখনোই এ স্থান ছেড়ে যায় নি। তাই, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) স্নেহবাৎসল্য সহকারে কুমীরদের খাদ্য দিতেন।"[২০২]

অন্যদিকে খাজালী দিঘির কুমীর সম্বন্ধে Dr. Mahmudul Hasan বলেন যে, "According to legend, Khan Jahan brought two very big crocodiles from Sundarbans and put them into the Thakur Dighi.[২০৩] উপর্যুক্ত গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রথম বিবরণটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে আমি মনে করি। হিংস্র প্রাণী Crocodile পালিত Alligator এর মত যুগ যুগ ধরে এ দিঘিতে বাস করছে। Crocodylia বর্গের Crocodylidae গোত্রের জলজ সরীসৃপ। এদের ১৩টি প্রজাতির অধিকাংশই প্রধানত পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের উষ্ণমণ্ডলের প্রাণী। কুমীর নামটি সাধারণত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, কেননা কুমীর বলতে অ্যালিগেটর (Alligator) এবং ঘড়িয়ালকেও (Gharial) বোঝায়। বাংলাদেশে এক প্রজাতির ঘড়িয়াল (Gavialis gangeticus) ও দুই প্রজাতির প্রকৃত কুমীর।[২০৪]

আকৃতির দিক থেকে কুমীর সাধারণত তিন ধরনের দেখা যায়। যেমন ঃ --

১. Crocodile [২০৫](কুমীর)

২. Alligator [২০৬] (কুমীর)

৩. Gharial [২০৭] (কুমীর)

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর খনিত দিঘিতে দু'টো Crocodile দীর্ঘকাল ব্যাপী বাস করছে। তাই তিনি ওদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কুমীর দু'টোর মধ্যে একটির নাম ধলাপাড় আর অন্যটির নাম কালাপাড় রাখেন।[২০৮]

এ দিঘিতে ধলাপাড় ও কালাপাড়ের বংশধরেরা এখনো জীবিত আছে। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) উক্ত নামে ডাক দিলেই দিঘির ঘাটে Crocodile দু'টো চলে আসত। এমনকি স্থানীয় ফকির সম্প্রদায়ও এ নামে ডাক দিলে দিঘির ঘাটে Crocodile দু'টো এখনো চলে আসে।[২০৯]

দেশ-বিদেশের হাজার হাজার দর্শনার্থী এখানে এসে কুমীর দেখে হাঁস, মুরগী, ছাগল খেতে দেয়। তাছাড়া দিঘির মাছ খেয়েও কুমীর জীবন ধারণ করে। বর্তমানে স্থানীয় ফকিররা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে কারণ দর্শনার্থীদের দেয়া হাঁস,মুরগী, ছাগল ইত্যাদি কুমীরকে খেতে না দিয়ে বাজারে বিক্রি করে। আবার কোন কোন সময় নিজেরা বাড়িতে নিয়ে ভক্ষণ করে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই মাঝে মধ্যে দিঘির এ ক্ষুধার্ত কুমীরগুলো খাবার না পেয়ে দিঘির পাড়ে কখনো বা আশে পাশের খালে চলে আসে।[২১০] দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর মাযার সংলগ্ন বিশাল দিঘি ছেড়ে ১৬ ফুট লম্বা একটি কুমীর প্রায় ৮০$\frac{১}{২}$কি.মি. দূরবর্তী বাগেরহাট খুলনা মহাসড়কের পাশে শুয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ছিলো।[২১১] স্থানীয় লোকজনের অভিমত হচ্ছে ক্ষুধার তাড়নায় কুমীরটি তার আস্তানা ছেড়ে উঠে এসেছে। এ অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর ঘটনা আতঙ্ক ও কৌতূহলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন বাগেরহাটের শত শত মানুষ।[২১২]

কয়েক'শ বছরের পুরানো এ মাযারের একজন খাদেম বলেছেন, কুমীররা কদাচিৎ খাদ্যের সন্ধানে পানি ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে আসে। খাঞ্জালী দিঘিতে অনেক বড় বড় মাছও রয়েছে। ওর কোনও কোনটি খুব বড়। এ দিঘিতে পনের বিশ মন ওজনের মাছও রয়েছে। কিন্তু ভয়েই হোক কিংবা হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর ভক্তিতেই হোক কোনও লোক ওগুলো (মাছ) ধরে না।[২১৩] দিঘির কুমীরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধলাপাড় ও কালাপাড় বলে ডাক দিলে ওরা প্রায়ই খাবারের লোভে ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। মুরগী ও ছাগলের ডাক শুনলেও কুমীর এসে থাকে।[২১৪] চৈত্র-পূর্ণিমায় মেলার সময় কুমীরেরা খাবারের লোভে সিড়ির উপর উঠে বসে থাকে। এরা সাধারণত প্রচুর আহার পায়। তাই নরমাংস ভক্ষণ হতে বিরত থাকে। দিঘির পাড়ে অনেক লোক কুমীর দেখার জন্য ভীড় জমায়। সিড়ির উপর কুমীর দেখে শিশুরা আনন্দ পায়। মেলার সময় দর্শকদের ভীড়ে দুর্বল লোকের পক্ষে কুমীর দেখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।[২১৫] কুমীরদের জীবন ধারণ ও বংশ বৃদ্ধির পদ্ধতি বড় অদ্ভুত ধরনের। এদের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা ভয়ানক হিংস্র প্রকৃতির এবং নিজেরাও নিজেদের প্রতি মোটেই সহনশীল নয়। এদের নিতান্ত স্বাভাবিক ও সহজ চলাফেরা দেখলেও মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।[২১৬] শীতকালে যৌন মিলন হয়।[২১৭]

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে দিঘিতে যখন পানি থৈথৈ করে তখনই স্ত্রী কুমীরের পেটে ডিমের সূত্রপাত হয়।[২১৮] আর প্রজনন ঋতুতে অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুন মাসে স্ত্রী কুমীর দিঘির উঁচু পাড়ে জঙ্গলের ভেতর অপেক্ষাকৃত নির্জন ও নিরাপদ স্থানে আগাছা ও মাটি দিয়ে প্রায় ৭৫ সেন্টিমিটার উঁচু ও ২ মিটার চওড়া টিবির মতো বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ে । পক্ষান্তরে অনেক সময় খোড়া পুরানো গর্তেও এরা ডিম পেড়ে থাকে।[২১৯] স্ত্রী কুমীর প্রায় ১২ থেকে ১৩ সপ্তাহ ব্যাপী ঐ ডিমে তা দেয়। অর্থাৎ সূর্যের আলো এবং বালুর তাপে ও স্ত্রী কুমীর শ্বাস প্রশ্বাসের তাপেও এ ডিমে তা দেয়া হয়। স্ত্রী কুমীর প্রায় ২০-৭২ (গড়ে ৫০) টি ডিম পাড়ে এবং এর ডিমগুলো রাজহাঁসের ডিম্বাকৃতি। তবে ওটার চেয়ে একটু লম্বা। ডিমের খোসা সেলুলাইড প্লাষ্টিকের মত মোলায়েম।[২২০] ডিমের প্রতি এদের দরদ অপরিসীম। এরা এক মুহূর্তের জন্যেও এ ডিমগুলো রেখে বাইরে যেতে চায় না। গর্তের সামনে ডিমগুলো বালুর নিচে আবৃত থাকে। আর কুমীরের দেহটা থাকে গর্তের মধ্যে। এ সময়ে গর্তের সামনে একটা পাখিও যেতে পারে না। সামান্য কিছু একটা দেখলেই সে ভয়ানকভাবে গর্জন করে তাড়া দেয়। এমনকি মাঝে মধ্যে পুরুষ কুমীর এদের বাসা তদারক করতে এসে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। কিন্তু কোন স্ত্রী কুমীরই তখন তাকে খাতির দেখায় না। বরং ভাবটা এমনই দেখায় যে, "খবরদার আমার বাসার দিকে এসো না।" তেমনি মানুষ দেখলেও সে ভয়ঙ্করভাবে ফোস ফোস করতে থাকে।

প্রায় ১২ হতে ১৩ সপ্তাহ ব্যাপী এ স্ত্রী কুমীরের কোন খাওয়া থাকে না। বেশী ক্ষুধা পেলেও তখন এরা মাটি ও বালু খেয়ে ডিমের কাছেই পড়ে থাকে । শত ডাকলেও এরা তখন ডিমগুলো রেখে কোথাও যায় না। অনেক ক্ষেত্রে গর্তের নিকট এসে লোকে এদের মুরগী খেতে দিয়ে যায়। এরা ওখানে বসেই দু'একটা মুরগী খেয়ে ফেলে। কুমীরের জিহ্বা নেই বলে এদের সবকিছুই গিলে খেতে হয়।[২২১]

সতীশ বাবু বর্ণনা করেছেন, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর ধলাপাড় ও কালাপাড়ের বংশধরেরা নরমাংস লোভ পরিহার করেছিল বলে তাদের বংশধরগণও সেই গুণ পেয়েছে। এখনো ঠাকুর দিঘিতে কুমীর আছে। এরা মানুষকে আক্রমণ করে না।[২২২] বাগেরহাট জেলার হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাধির প্রবীণ খাদেম বলেছেন যে, দিঘির কুমীরগুলো একেবারে তীরে আসে, কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। এ দিঘির কুমীরগুলো মানুষের মাংস খেয়েছে এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস দিঘির কুমীরে মানুষ ভক্ষণ করে না। লোকেরা কুমীরকে খাওয়াবার জন্য মুরগী, ছাগল প্রভৃতি মানত করে থাকে। কুমীরকে খাওয়ালে মরহুম পীর সাহেব খুশী হবেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বলে লোকেরা বিশ্বাস করে।[২২৩]

ডঃ এনামুল হক লিখিত "বঙ্গে সূফী প্রভাব" গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত এ.এফ. এম. আব্দুল জলীল কুমীর সম্পর্কে বলেন যে, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দিঘির কুমীরের নিকট গ্রাম্য যুবতী নারীরা কিছু আকাঙ্ক্ষা করলে নিশ্চিত ফল পেয়ে থাকে। তারা দিঘিতে গোসল করে কুমীরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। তারা মুরগী ও ছাগল উৎসর্গ করে তাদের প্রথম আশার ফল কুমীরকে দিতে প্রতিজ্ঞা করে। এ প্রতিজ্ঞা তারা ভঙ্গ করে না। প্রথম নবজাত শিশুকে পানির নিকট এনে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

এককালে এ ধরনের কুসংস্কার দক্ষিণবঙ্গে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করতো। বর্তমানে এটা একেবারেই হ্রাস পেয়েছে বললেই চলে।[২২৪] একটা জ্বলন্ত ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা। খুলনা জেলার এক নমঃশূদ্র দম্পতি সন্তানাদি না হওয়ায় পীর হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দরগায় মানত করে যে সন্তান জন্মিলে কুমীরের মুখে দিয়ে আবার ফেরত নিয়ে যাবে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস পীরের কুমীরে মনুষ্য ভক্ষণ করে না এবং সন্তানকে কুমীরের নিকট দিলেও ফিরিয়ে দিয়ে থাকে। যথাসময় এ গ্রাম্য অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দম্পতির একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে । সন্ধ্যার সময় পিতা-মাতার প্রাণ প্রিয় নবজাত শিশুকে এনে খাঞ্জালী দিঘির পাকা ঘাটের সিড়ির উপর রেখে দেয়। তারা ভেবেছিল কুমীরে

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেটাকে স্পর্শ করে ফেরত দিবে। কিন্তু দিঘির এ হিংস্র জন্তুটা নবজাত শিশুকে নিঃশঙ্কচিত্তে উদরস্থ করে ফেলে। বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে এ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।

পীরের দরগায় ক্রন্দনের রোল পড়ে যায়। স্থানীয় লোকের মধ্যে নিদারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। সন্তান শোকে পিতা-মাতা প্রায় পাগল হয়ে পড়ে। এ সংবাদ পুলিশের কর্ণগোচর হলে পিতা-মাতার নামে একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হয়। দরগার ফকিরদের বিরুদ্ধেও জোর তদন্ত পরিচালিত হয়। কিন্তু তারা এ দুর্ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়। পিতা-মাতার বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে। ম্যাজিস্ট্রেট আসামীদ্বয়কে দায়রায় সোপর্দ করেন। খুলনা দায়রা জজের কোর্টে জুরীর সাহায্যে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে নিম খুনের অপরাধে বিচার কার্য পরিচালিত হয়। বিচারে উভয়ের ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আসামীদ্বয় কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করলে তৎকালীন মাননীয় বিচারপতি তারেক আমীর আলী জজ কোর্টের রায় ন্যায় সঙ্গত বলে মন্তব্য করেন। তবে মাননীয় বিচারপতি দয়াপরবশ হয়ে কারাদণ্ডের মেয়াদ হ্রাস করে মাত্র তিন বছর করে দেন। " Calcutta weekly Notes" -এ এই মামলার রিপোর্ট যথারীতি প্রকাশিত হয়।

একমাত্র পুত্র সন্তান হারাবার পর কারাবরণ ও নিঃস্ব অবস্থায় নিদারুণ মানসিক রোগে পিতা জেলখানায় দেহত্যাগ করেন। অনাথিনী মাতা জেল থেকে মস্তিস্ক বিকৃত অবস্থায় একেবারে উন্মাদিনী হয়ে যায়।

তৎকালীন যুক্ত বাংলার গভর্নর খুলনা জেল পরিদর্শনে এসে জেল কর্মাধ্যক্ষের নিকট এ সংবাদ শ্রবণ করে বিশেষ মর্মাহত হন। তিনি ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪০১ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে স্ত্রীলোকটার অবশিষ্ট কারাদণ্ড মওকুফ করে খালাস দেন এবং রিলিফফাণ্ড হতে তার পুনর্বাসনের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা এককালীন মঞ্জুর করেন। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফকাস সাহেবের আদেশে সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মোতাহারুল হক সাহেব ১৯২২ সালের কোন একদিনে ঐ সাহায্যের অর্থ নিয়ে স্ত্রীলোকটার বাড়িতে গিয়ে ঐ অর্থ দান করে আসেন।[২২৫]

একটি স্ত্রী কুমীরকে আর একটি স্ত্রী কুমীর মোটেই সহ্য করতে পারে না, তদ্রূপ একটি পুরুষ কুমীর অন্য একটি পুরুষ কুমীরকে দেখামাত্র এমন আক্রমণ করে যে কোন একজন মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তারা সংগ্রাম থেকে নিরস্ত হয় না এবং জীবন্ত কুমীরটি মৃত কুমীরটিকে ছিড়ে খেয়ে ফেলে। পুরুষদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যে ছোট সেই পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে। স্ত্রী কুমীরও অনেক সময় একের আক্রমণ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যে পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে। একে অন্যকে দেখামাত্র যদিও তারা আক্রমণ করে, তবুও একজন যদি পরাজয় স্বীকার করে পানির নিচে ডুব দিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। তবে স্ত্রী কুমীরদের মধ্যে আক্রমণকারীকে অনেক সময় নিরস্ত হতে দেখা যায়। বছরের বিশেষ এক সময় এরা আনন্দ মুখর ও সাথে সাথে বেশী হিংস্র হয়ে উঠে। বর্ষাকালই এদের সেই সময়। তখন তারা পরস্পর মারামারি করে এবং স্ত্রী কুমীর পুরুষ কুমীরের সঙ্গ লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে।

"দেখা যায় একটি পুরুষ কুমীরের আওতায় চার বা ততোধিক স্ত্রী কুমীর থাকতে পারে কিন্তু কোন অবস্থাতেই তার আওতায় বা এ দিঘিতে আর একটি পুরুষ কুমীর থাকা সম্ভব নয়। এভাবে এ দিঘির মধ্যে রচিত হয়েছে পুরুষ ও স্ত্রী কুমীরের বহু প্রণয় উপাখ্যান।"[২২৬] শীতের দিনে এই কুমীরকুল শীতে বড়ই কাতর হয়ে পড়ে। তখন এরা পানি থেকে ডাঙ্গায় উঠে পড়ে এবং উষ্ণতার লোভে ঘন্টার পর ঘন্টা রৌদ্রের মধ্যে পড়ে থাকে। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি তখন এদের তেমন কোন আগ্রহ-ই পরিলক্ষিত হয় না।

মাঝে মাঝে দেখা যায় খাদেমগণ এদের ঘুমন্ত স্থানে গিয়েই এদের জন্য আনিত খাবার দিয়ে আসেন। তখন এদের অলসতায় পেয়ে বসে। ডাকলেও তখন এরা সহজে নড়তে চায় না, বরং মনে হয় বিরক্তই বোধ করে। পেটে ডিম এলে কুমীরের ক্ষুধা পেলে প্রায়ই এরা মাটি খেয়ে রৌদ্রে শুয়ে থাকে। এ সময় এদের প্রধান খাদ্য হলো মাটি। আর শীতের সময় এরা পানিতে থাকতে চায় না।

প্রায় ১২-১৩ সপ্তাহ পর কোন এক সময় ডিমগুলো ফোটার উপক্রম হয়। ডিমগুলো ফোটার সময় হলে স্বাভাবিক নিয়মেই স্ত্রী কুমীর বুঝতে পারে।[২২৭] আর স্ত্রী কুমীর সামনের গর্ত হাতা দিয়ে খুড়ে ডিমগুলো বের করে ফেলে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই ডিমগুলো আপনা-আপনিই ফেটে এক একটা কুমীরের বাচ্চা বেরিয়ে আসতে থাকে এবং মায়ের বুকের ভেতর দৌড়ে যায়। তখন কুমীর মায়ের খুশী আর ধরে না। সে সানন্দে খুশীতে লাফাতে থাকে। আর অতি ক্ষিপ্রতার সাথে এক একটা বাচ্চা ধরে আর টপাটপ গিলে খেতে থাকে। বাচ্চারা সর্বত্র ছোটাছুটি করতে থাকে। আর তখন বাচ্চাদের মা তাদের সবগুলোকে ধরে খাবার জন্য সাংঘাতিক চঞ্চল ও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনি অবস্থার ভেতরে পড়ে বাচ্চারা প্রাণ হারায়। কেউ কেউ অবস্থা বেগতিক দেখে মায়ের দিকে না গিয়ে দিঘির পানির দিকে দৌড় দেয় এবং এখানে সেখানে ঝোপ-ঝাপের ভেতরে লুকোবার চেষ্টা করে । তখন বাচ্চা না দেখে কুমীর মায়ের ভীষণ কান্না পায়। এত সাধনার ধন তারা কোথায় লুকালো ? তাই অতি দুঃখের সাথে সে তখন নাছোড়বান্দা হয়ে তাদের খুঁজতে থাকে। সে তার বাচ্চাদের ঝোপ-ঝাপের নিচে সর্বত্র খুঁজতে খুঁজতে যাকেই পায় তাকেই ধরে পেটের মধ্যে চালান করতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর পুরুষ কুমীর এ বাচ্চা ফোটার খবর পেলেই তো কথা নেই। এ বাচ্চা ধরে খেতে তার উৎসাহের কোন অন্ত নেই। এমনি করে এ কুমীরের একটা অংশ বৃদ্ধি হওয়া কঠিন অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। কদাচিৎ দু'একটা কুমীর বাইরে থেকে বড় হয়ে দিঘিতে আসে। "তাই প্রায় ৫৫৫ বছরেও চার-পাঁচটির বেশী কুমীর এই দিঘিতে দেখা যায় না।" [২২৮]

"হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দিঘিতে প্রাপ্ত চারটি কুমীরের মধ্যে একটি মাত্র পুরুষ কুমীর। সেটির বয়স প্রায় ৭০ বছর।"[২২৯] ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে কুমীর পরিবার দিঘির পাড়ে বাসা করেছিল এবং স্ত্রী কুমীর ডিমও পেড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ডিম নিষিক্ত হয়নি। ডিম ভেঙ্গে দেখা গেছে, ভেতরে কুসুম নেই। বাচ্চা না হওয়ার কারণ হতে পারে পুরুষ কুমীরটির বার্ধক্য ও প্রজননে অক্ষমতা। স্ত্রী কুমীর তিনটির বয়স অবশ্য তুলনামূলকভাবে কম। অন্য দেশের চিড়িয়াখানা বা ভারত থেকে সক্ষম পুরুষ কুমীর এনে এখানে প্রজননের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

"ভারতের মদ্রাজে ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্কে আকছার ছানা উৎপাদিত হচ্ছে । ভারত থেকে উপহার হিসেবে কুমীর আনা সম্ভব।"[২৩০] স্ত্রী কুমীর ডিম দিলে তার কিছু থেকে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা ফোটানো সম্ভব। প্রজনন পর্যায় বৃদ্ধ পুরুষ কুমীরটিকে পৃথক রাখতে হবে।[২৩১] এই প্রজাতির কুমীরের বৈজ্ঞানিক নাম "Crocodilus Palustris" বাংলায় বলা হয় স্বাদু পানির কুমীর।[২৩২]

এগুলো বাংলাদেশের নদী মোহনা ও সুন্দরবনের উপকূলে বাসছিল, এক'শ বছর পূর্বেও প্রচুর দেখা যেত। আবাসস্থল ধ্বংস ও ব্যাপক শিকারের জন্যই এরা বিপন্ন। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়াতে এরা বিস্তৃত ।[২৩৩] এরা এখন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কয়েকটি রয়েছে বাগেরহাটের হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দিঘিতে আধা প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং এগুলোর অস্তিত্ব এখনো কোন মতে টিকে আছে। আরও রয়েছে চিড়িয়াখানায়। তবে সেগুলোর প্রজনন হয় না।[২৩৪] লোনা পানির কুমীরের (বৈজ্ঞানিক নাম "crocodilus porosus") সন্ধান পাওয়া যায়।[২৩৫] লোনাপানি ও স্বাদুপানির কুমীর দৃশ্যত অভিন্ন এবং প্রাকৃতিক অবস্থানে শনাক্ত করা কঠিন।[২৩৬]

সবকিছু মিলিয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, লোনা পানির কুমীরের সংখ্যা দু'শরও কম। অথচ ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চলে হাজার হাজার কুমীর ছিল। এ প্রজাতির কুমীরও এখন হুমকির সম্মুখীন। বিভিন্ন কারণে এ প্রজাতির বিপর্যয় হচ্ছে । কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. নির্বিচার নিধন

২. দিন-রাত লোকজনের যাতায়াতের ফলে নিভৃতির অভাব

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাসা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জলজ উদ্ভিদের অভাব ইত্যাদি।

বিশ্ব বাজারে কুমীরের চামড়াও খুব দামী। একটি কুমীরের চামড়ার মূল্য ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা।[২৩৭] এছাড়া কুমীরের দেহের বিভিন্ন অংশ তথাকথিত যৌন শক্তিবর্ধক ঔষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন কোন দেশে। এসব কারণে কুমীর মারা পড়ছে চোরা শিকারীদের হাতে।

ডঃ সোহ্‌রাব সরকারের মতে, এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলো লক্ষণীয় ঃ

১. কঠোর তত্ত্বাবধানে এসব কুমীরের সংরক্ষণ

২. বিশেষ প্রজনন মৌসুমে সার্বক্ষণিক পাহারা

৩. প্রজনন এলাকায় লোকজন চলাচল বন্ধ করা

৪. কুমীরের বাসা তৈরির উপযোগী জলজ উদ্ভিদের সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে তা নিশ্চিত করা

৫. সর্বোপরি এদের প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকতে দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, কুমীরের মূল্য দু'রকমের যথা :

১. বাণিজ্যিক

ও

২. প্রাকৃতিক

কুমীরের প্রধান খাদ্য হচ্ছে মাছ, তবে এরা মূলত অসুস্থ দুর্বল মাছই খায়। এরা কোরাল মাছ খায়। যেগুলো অন্য সব মাছই খেয়ে ফেলে।

তাছাড়া কুমীর যখন পানির তলায় কাদার মধ্য দিয়ে হাঁটে, তখন কাদার ভেতর থেকে পচে যাওয়া জৈব পদার্থ উঠে আসে। এর ফলে "প্ল্যাঙ্কটন" জন্মায় যা সমস্ত প্রজাতির মাছের প্রধান খাদ্য।[২৩৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, কুমীর, ব্যাঘ্র, সর্প, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু রীতিমত পোষ মানে না। একদিন না একদিন এদের প্রকৃত স্বভাব বের হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে মহাত্মা শেখ সাদী বলেন ঃ

"শার্দুল শিশু শার্দুল হবে শেষে সে
যদিও পালিত হয় মানবের বেশে সে।"[২৩৯]

তবে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর crocodiles সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কারণ তিনি এদের অত্যন্ত আদর ও স্নেহ-বাৎসল্য সহকারে খাবার দিতেন। ফলে এরা সর্বদা অনুগত থাকতো। আর এরা এখনো লোকজনের কোন ক্ষতি সাধন করে না।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.১১ রাস্তাঘাট

দিঘি ও মসজিদের পাশাপাশি যাতায়াতের সুবিধার জন্য হযরত খান জাহান আলী (রহ:) রাস্তাও নির্মাণ করেছেন। রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে। তৎকালে দক্ষিণবঙ্গে নদী-নালা আর জঙ্গলে ভরপুর ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, এ এলাকার উন্নতির জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করা অতীব প্রয়োজন। এ কারণে তিনি যে স্থানেই পদার্পণ করেছেন প্রায় সকল স্থানেই রাস্তা নির্মাণ করেছেন।[২৪০]

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) ছিলেন একজন প্রখ্যাত নির্মাতা। তিনি বাগেরহাট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মহাসড়ক, সামন্তসেনা থেকে বাঁধখালি পর্যন্ত ৩২.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক এবং শুভরাড়া থেকে খুলনার দৌলতপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অপর একটি সড়ক নির্মাণ করেন বলে জানা যায়।[২৪১] সামন্তসেনা থেকে পিলজঙ্গ পর্যন্ত "হাতী ধরার রাস্তা" নামে একটা রাস্তা ছিল। ষাট গম্বুজ হতে পশ্চিনমুখী সামন্তসেনা পর্যন্ত পাকা রাস্তার চিহ্ন এখনো আছে। ওটাই হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর বৃহত্তম পাকা রাস্তা।[২৪২] পার্শ্ববর্তী জমি হতে আধুনিক পন্থায় মাটি ফেলে প্রথমে কাঁচা রাস্তা প্রস্তুত করা হতো। তারপর ঐ মাটি বসে গেলে পরে ইঁটের উপর খোয়া ফেলে রাস্তা তৈরি করা হতো। দীর্ঘস্থায়ী রাস্তা করার জন্য তিনি ইষ্টক সাজিয়ে রাস্তা নির্মাণ করতেন।

"ষাট গম্বুজের প্রায় ৮০Error! কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নদীর তীরে রাস্তাটি ৫০০ (পাঁচশত) বছর ধরে টিকে আছে"।[২৪৩] তিনি বারবাজার হতে মুড়লী (যশোর), পায়গ্রাম, আলাইপুর হয়ে খলিফাতাবাদ পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তাটি নির্মাণ করেন।[২৪৪] পরে বারবাজার খলিফাতাবাদ সড়কের সাথে মনিরামপুর, কেশবপুর, বিদ্যানন্দকাটি হয়ে আটারই,তালা, পাইকগাছা, আমাদি ও বেতকাশি পর্যন্ত একটি দীর্ঘ রাস্তা নির্মিত হয়। অপর একটি সড়ক পায়গ্রাম,ফুলতলা, ডুমুরিয়া, আরশনগর, আটারই ও তালা হয়ে লাবসা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২৪৫]

এই সুদীর্ঘ সড়ক দু'টির সাথে আরও কয়েকটি সড়ক মিলে মূল সড়ক তৎকালে সবচেয়ে কর্মকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। সড়ক নির্মাণে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা ইতিহাসে বিরল। তিনি জানতেন যে সুন্দর রাজপথ ব্যতীত যাতায়াতের সুবিধা ও নগরের শোভা বর্ধিত হতে পারে না। সেজন্য তিনি শহর ও শহরতলীর সর্বত্র পাকা রাস্তা নির্মাণ করেন।[২৪৬] আজও তার তৈরি সুবিস্তীর্ণ রাস্তা ও পথঘাট এদেশের মানব মনে গ্রথিত করে রেখেছে। তিনি রাস্তা নির্মাণে যে শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অভিনব ও যুগোপযোগী। তাঁর অধিকাংশ শিল্পীই এ দেশীয় ছিল। প্রবাদ আছে যে, জৌনপুর ও গৌড় থেকে তিনি কিছু সংখ্যক শিল্পী আনয়ন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.১২ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান ও বহিঃ আক্রমণ হতে দক্ষিণবঙ্গ রক্ষার্থে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেন।[২৪৭] তাঁর ছিল বিশাল সেনাবাহিনী ও ব্যারাকপুরে সেনা অবস্থান। জানা যায় ব্যারাকপুরে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ও পরবর্তী শাসকদের প্রধান সেনানিবাস ও দুর্গ ছিল।[২৪৮] যদিও তার কোন চিহ্ন আজ আর নেই, তবে এ স্থানের বর্তমান অবস্থা এবং ধ্বংসাবশেষগুলো খতিয়ে দেখলে পূর্বে সেনানিবাস যে ছিল, তা অনুমেয়।[২৪৯] একাধিক অস্ত্রাগারের পরিচয় খলিফাতাবাদে পাওয়া যায়। সেটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) নির্মাণ করেন।[২৫০] শুধু তাই নয়,পিলজঙ্গ, ফতেপুর প্রভৃতি স্থানে হযরত খান জাহান আলী (রহ:)এর সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের ছোট ছোট যুদ্ধ হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে বড় রকমের কোন যুদ্ধ তখন সংঘটিত হয় নি।[২৫১] খলিফাতাবাদেই তার দক্ষিণবঙ্গের প্রধান সেনানিবাস ছিল।[২৫২] তাছাড়াও হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর পুলিশ বাহিনীও ছিল। খলিফাতাবাদ নগরী তারা সুরক্ষিত রাখতো। সাধারণের গতিপথ নির্দেশ, নগরের শান্তিরক্ষা প্রভৃত কার্য পরিচালনা করতো।[২৫৩]

৬.২.১৩ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ছিলেন বিদ্যান ও বিদ্যোৎসাহী। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁর এলাকায় ফার্সি সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। খলিফাতাবাদ ব্যতীত পায়গ্রাম কসবা, বারবাজার ও যশোর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল। এছাড়াও তাঁর একটি মাদ্‌রাসা ছিল ষাট গম্বুজ মসজিদে।[২৫৪]

৬.২.১৪ মুসাফির খানা

ইসলামের সুমহান বাণী শ্রবণ করার জন্য তীনদেশীয় আগন্তুক পথিকদের সুবিধার্থে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) একটি মুসাফির খানা নির্মাণ করেন।[২৫৫] তিনি এখানে আগন্তুকদের খানা-পিনাসহ সকল প্রকার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। উক্ত মুসাফির খানাকে সরাইখানাও বলা হতো। সরাইখানা হতেই বাগেরহাটের সোরাই গ্রামের উৎপত্তি হয়েছে।[২৫৬]

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর এ সরাইখানা দ্বারা দক্ষিণবঙ্গের বহু লোক উপকৃত হতো। দক্ষিণবঙ্গের জনগণ হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাজ সেবা, মধুর ব্যবহার, সুমিষ্ট ভাষায় ইসলামের দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে দক্ষিণবঙ্গ অল্প দিনেই মুসলমানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি স্বয়ং নিজেই সমস্ত জনহিতকর কাজের তত্ত্বাবধায়ন করতেন এবং এ সমস্ত আর্থ-

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষভাবে যারা সহযোগিতা করেছিলেন, তারা হচ্ছেন যেমন ঃ - মুহাম্মদ তাহির, গরীব শাহ, বাহরাম শাহ, বুড়ো খাঁ, ফতেহ খাঁ, খালাস খাঁ, এখতিয়ার খাঁ, বড় আযম খাঁ, ছোট আযম খাঁ, আনোয়ার খাঁ, শাহাদত খাঁ, রেজাই খাঁ, দিদার খাঁ প্রমুখ।[২৫৭] এদের নিঃশর্ত ও প্রত্যক্ষ কাজের ফলে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) তাঁর জনহিতর কার্য এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুকুটহীন সম্রাট হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) দক্ষিণবঙ্গের জনসাধারণের কল্যাণার্থে তাঁর জীবন সর্বস্ব ব্যয় করেছেন। পার্থিব ক্ষমতার প্রতি তাঁর কোন রকমের লোভ-লালসা ছিল না। একমাত্র তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজ সেবা ও ইসলাম প্রচার করা। অর্থাৎ তিনি আজীবন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর শিষ্যত্বে যারা ধন্য হয়েছিল তারা অধিকাংশই হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। আর এই দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো রাস্তা তৈরি করা, দিঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ। ফলে তাঁর অসংখ্য কীর্তি গড়ে উঠে দক্ষিণবঙ্গে । হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর কীর্তিসমূহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত যশোর, ঝিনাইদহ, খুলনা ও বাগেরহাট এলাকায় আজও বিদ্যমান। এতদাঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণভূমিকে তিনি মানুষের বাসের উপযোগী করে তোলেন এবং তাঁর নির্দেশে দলে দলে লোক জনহিতকর কর্মে আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যাদিতে লোক বিমুগ্ধ হয়ে যেত। হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) বিনা রক্তপাতে সুন্দর বনাঞ্চল জয় করে সেখানে শান্তি ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি একাধারে ধর্ম প্রচারক, সুশাসক, ন্যায় বিচারক, কর্তব্য পরায়ণ, পরিশ্রমী এবং ইসলামের ব্যাপারে আপোসহীন ছিলেন। আর তিনি এজন্যই সক্ষম হয়েছিলেন, জন মানুষের হৃদয় রাজ্য জয় করতে। তাঁর এ অসংখ্য কীর্তি হতে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ এখনো উপকৃত হচ্ছে । তাঁর এ যুগান্তকারী অবদানের কথা জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে।[২৫৮]

৬.৩ জীবন সায়াহ্নে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) ও তাঁর অবদান

হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর বাবুর্চিখানা সমাধি সৌধের পূর্বদিকে। এখন এর শেষ অবস্থা । বহুলাংশে এর ছাদ চৌচালা খড়ের ঘরের মত। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) অসংখ্য অসহায় গরীব, দুঃখী দুস্থ ও আগন্তুকদেরকে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করাতেন। এ রন্ধন-শালার মধ্যে জিনিসপত্র রাখার তাকও দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান প্রবেশদ্বার ও তোরণ রয়েছে বাবুর্চিখানার উত্তরে। এর উত্তরে প্রশস্ত রাস্তা। এ রাস্তার পশ্চিমদিকে সম্প্রতি ছয়টি পাকা কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। এ কবরগুলোর উপর থেকে মৃত্তিকা অপসারণের সময় শাহী আমলের প্রায় শতাধিক রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়।[২৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

দিঘির পাড়ে সর্বত্র মাযার, মৃত্তিকা খুড়লেই অসংখ্য কঙ্কাল পাওয়া যায়। বহু মনুষ্য কঙ্কাল পচা দিঘির পশ্চিম পাড়েও পাওয়া গিয়েছে। নিঃসন্দেহে এ সমস্ত নিদর্শন প্রমাণ করিয়ে দেয় যে, এক সময় খলিফাতাবাদ ছিল ঘনবসতিপূর্ণ জনবহুল শহর।[২৬০]

সর্ব প্রথম অসংখ্য মনুষ্য কঙ্কাল ও অস্থি প্রাচীন মহেঞ্জোদাড়ো শহরে আবিষ্কৃত হওয়ায় শহরের নাম হয়েছে মৃতের ঢিবি বা মহেঞ্জোদাড়ো। মহেঞ্জোদাড়ো সিন্ধি ভাষা, এর অর্থ মৃতের ঢিবি। মহেঞ্জোদাড়োর মত খলিফাতাবাদেও যত্রতত্র মনুষ্য কঙ্কাল ও অস্থি বিদ্যমান।[২৬১]

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর পূর্বে এখানে শহর ছিল বলে অনুমিত হয়েছে। তাঁর আগমন প্রাক্কালে সম্ভবত এ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং তথায় তিনি পুরাতন ভিত্তির উপর নতুন শহরের পত্তন করেছিলেন। এতঘন বসতিপূর্ণ শহর ও অসংখ্য মনুষ্য কঙ্কাল বঙ্গের অন্য কোন প্রাচীন শহরে পরিলক্ষিত হয় না। তজ্জন্য একে "সমাধির শহর" (city of Graves) বললে অত্যুক্তি হয় না।[২৬২] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য ছিল । তিনি জানতেন বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এর পলিমাটিতে কোন সৌধ চিরস্থায়ী হয় না। নদীর গতি অস্থায়ী, ভাঙ্গন বেশী। হর্মরাজি অবিকৃত থাকে না জলবায়ু ও নোনাক্রান্ত দোষে। বাংলায় প্রস্তরের সৌধ নির্মাণের জন্য তিনি বিশেষভাবে ইষ্টকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি সৌধরাজি স্থায়ী করার জন্য মূল্যবান মাল মসলা ও প্রস্তর ব্যবহার করেছিলেন। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখানে অত্যধিক বারিপাত হয়। সেজন্য তাঁর অধিকাংশ হর্মরাজির ছাদ বহুলাংশে চৌচালা গোলপাতা ঘরের মত। এভাবে সহজে পানি গড়িয়ে পড়ার প্রথাতে ছাদ নির্মাণ করা বৃষ্টিপাত বহুল দেশেরই পরম উপযোগী। E.B. Havell তদীয় গ্রন্থে (The Ancient and medieval Architecture of India : A study of Indo-Aryan civilisation) লিখেছেন যে, এ প্রকার ছাদ গঠন বাংলার স্থপতি শিল্পীদের খেয়ালমাত্র নয়, বরং এটা দস্তুরমত বৈজ্ঞানিক প্রথায় ও সুপরিকল্পনায় গঠিত।[২৬৩]

তাই হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সময় নির্মিত অধিকাংশ মসজিদ ও বাসগৃহের ছাদ চতুর্দিকে ঢালু করে নির্মিত হয়েছিল।

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর শেষ জীবনের সমস্ত কীর্তিই ঠাকুর দিঘির উত্তর পাড়ে অবস্থিত। পূর্ব পাড়ে বিশেষ কিছুই নেই, মাত্র একটা পাকা ঘাটের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রয়েছে। এপাড়ে একটা ক্ষীর খেজুর ও দু'টো প্রাচীন আম গাছ এখনো বেঁচে আছে। ক্ষীরখেজুর বৃক্ষটা বকুল বৃক্ষের মত ঝাপটান এবং এর পাতা ছাতিয়ান বৃক্ষের পত্রের মত।[২৬৪] প্রবাদ রয়েছে যে, এ বৃক্ষটার বয়স প্রায় চারশত বছরের অধিক হবে। যুগে যুগে এ বৃক্ষের বাকল শুকিয়ে মরে আবার নতুন বাকলের সৃষ্টি হয়। সমগ্র বাংলায়

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব ক্ষীর বৃক্ষ আর কোথাও নেই। সম্ভবত হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর কোন শিষ্য এ বৃক্ষটা কোথাও হতে এনে দিঘির পাড়ে রোপণ করে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন। এ পাড়ে নানা প্রকার ঔষধির গাছ ও লতা-পাতা ছিল।[২৬৫] দক্ষিণপাড়ে ফকিরদের কয়েকটি বাড়ি ভিন্ন অন্য কিছু নেই।

এ দিঘির তীরে দাঁড়িয়ে ভাবুক ব্যক্তি উদ্বেল হয়ে পড়ে। মনে হচ্ছে কি বিশাল অন্তকরণ ছিল হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর। তিনি জনহিতকর কার্যে যথা সর্বস্ব দান করে গেছেন। তাই মরেও তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। এভাবে কবির ভাষায় বলা যায়,

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।" [২৬৬]

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) নির্মিত ষাট গম্বুজ, স্বীয় সমাধি সৌধ, মসজিদ ও বিশালকায় তোরণসমূহ দর্শনে মানব মনে এ মহাত্মার প্রতি অভাবনীয় ভক্তি শ্রদ্ধা জাগরিত হয়। তৎকালে এ দিঘি খননে তাঁর সমতুল্য আর কেউ ছিলেন না। প্রায় ৫৫৫ বছর পূর্বে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এ সমস্ত দিঘি খনিত ও সুরম্য হর্ম নির্মিত হয়েছিল। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) জাঁকজমক ও শান-শওকতের সাথে সদল বলে এখানে অবস্থান করতেন। সৈন্যগণ ও নগর-রক্ষীরা রাজধানীর চারিদিকে কুচকাওয়াজ করে বেড়াত। অফিস আদালতে কর্মকর্তা, কর্মচারীরা সর্বদা কর্মে ব্যস্ত থাকতো। কালচক্রের নিষ্পেষণে এর বিশেষ কোনও চিহ্ন আজ দৃষ্ট হচ্ছে না। কালের স্রোতে সবই ভেসে গেছে। বাকী আছে শুধু ইতিহাস আর করুণ স্মৃতিকণা। সত্যিই কবি বলেছেন ঃ -

" ভাসে তার কত ছবি কত পুণ্য কথা
কত বরষের হায় কত শত ব্যথা।"[২৬৭]

অদ্যাপি সেই শত বর্ষ পূর্বের কীর্তিগুলো যেন ধ্বংসের অবতাররূপে দণ্ডায়মান। তাই হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর প্রাচীন গৌরব মহিমা জগৎ সমক্ষে বজ্র নির্ঘোষে প্রচার করছে।

এখন প্রশ্ন হলো - এ সকল হর্মরাজি, রাস্তার ইষ্টক ও প্রস্তর কোথা থেকে আসল ?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক রনদাকান্ত রায়, অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ ও পশুপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ বলেছেন যে, এ অঞ্চলে পূর্ব থেকেই হিন্দু রাজত্ব এবং বৌদ্ধদের বাস ছিল। তাই তাদের মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ হতে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড ও ইষ্টক সংগ্রহ করে তদীয় হর্মরাজিতে ব্যবহার করেছিলেন।[২৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে Bengal District Gazetteers Khulna (১৯০৮) এর ২৯নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, হযরত খান জাহান আলী (রহ) চট্টগ্রাম হতে প্রস্তর এনেছিলেন । পক্ষান্তরে তিনি উড়িষ্যা ও রাজমহল থেকেও প্রস্তর এনেছিলেন। আর মজুরের সাহায্যে স্থানীয় মৃত্তিকা দ্বারা রাশি রাশি ইষ্টক তৈরি হতো। কাঠের ফরমায় ফেলে এ ইষ্টক তৈরি হতো না। বরং মৃত্তিকা তৈরি করে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই কেটে খণ্ড খণ্ড করা হতো। এগুলো স্তূপাকৃতি করে পোড়ালে নানা রকমের ইট পাওয়া যেত।[২৬৯]

উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শেষের উক্তিটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে আমি মনে করি। এখনো খলিফাতাবাদে অনেক প্রকারের ইষ্টক হর্মরাজির শোভা বর্ধন করছে। ইষ্টকের সাধারণ পরিমাপ ঃ -

১. ১০″ x ৪″ x ৩″ ২. ৯″ x ৪″ x ২$\frac{১}{২}$″

৩. ১৮″ x ১২″ x ২″ ৪. ১৮″ x ১২″ x ৩″

৫. ৬″ x ৪″ x ১$\frac{১}{২}$″ ৬. ১৬″ x ১৪″ x ৩$\frac{১}{৪}$″

৭. ৫″ x ৩″ x ১$\frac{১}{২}$″ ৮. ৬″ x ৩″ x ২″ ইত্যাদি ।

ক্ষুদ্র পাঁচ কোণ ও ছয় কোণাবিশিষ্ট ইষ্টক পাওয়া যায়। এ সমস্ত ইটে সুন্দর কারুকার্য দৃষ্ট হয়।[২৭০] আধুনিক সমতল টালির মত অসংখ্য টালিও ব্যবহৃত হতো। ইটের প্রকারভেদ দেখলেও হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অপরূপ শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে চুন, সুরকি অন্যান্য মাল-মসলা তৈরি হতো। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) সম্ভবত গৌড় অঞ্চল হতে মাল মসলা ও রাজমিস্ত্রী সংগ্রহ করেছিলেন। পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের হর্মরাজির সাথে খলিফাতাবাদের স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়।[২৭১]

তোঘলোক আমলের দিল্লী ও জৌনপুরের স্থাপত্য নিদর্শনের সাথেও বাগেরহাটের বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয়। তোঘলোকাবাদের অর্ধ ভগ্নসৌধরাজি দেখলে এর সত্যতা সহজে অনুভব করা যায়। খলিফাতাবাদের হর্মরাজি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অদ্ভুত শিল্প প্রতিভার পরিচায়ক। নিঃসন্দেহে এদিক থেকে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শিল্পী।[২৭২] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দরগায় প্রতিবছর চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল) পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাতে ধুমধামের সাথে মেলা বসে।[২৭৩] এ মেলা তিনদিন স্থায়ী হয়। এখানে অসংখ্য লোক হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর কর্মক্ষেত্র দর্শন মানসে একত্রিত হয়। তারা সমাধিসৌধ পরিদর্শনে পুণ্য সঞ্চয় করে। লোকেরা একে খাজালীর মেলা বলে থাকে। দূর-দূরান্ত এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান,নর-নারী ও শিশুরা এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। এখানে

Dhaka University Institutional Repository

মানতের অসংখ্য মুরগী, ছাগল ইত্যাদি আসে। পুণ্য সঞ্চয় ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লোকেরা কুমীরকে মুরগী ও অন্যান্য খাদ্য ভক্ষণ করার জন্য দেয়।[২৭৪]

উপর্যুক্ত আলোচনায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রোগ দেয়ার মালিক মহান স্রষ্টা, রোগ থেকে মুক্তি দেয়ার মালিকও তিনি। তবে রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে, সেজন্য কুমীরের উদ্দেশ্যে মানত কেন ? এ ধরনের মানতে রোগমুক্তি ঘটে কিনা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এ কাজটি করা মস্তবড় পাপের কাজ।[২৭৫]

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তাঁর গোটা জীবন এ মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে এ দেশের প্রতিটি মানুষের মনের মণি কোঠায় একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও কর্মের ফলে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি এ দেশের প্রতিটি মানুষের নিকট হতে যে অকুণ্ঠ ভালবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর ইন্তেকালের পরেও তা বিদ্যমান রয়েছে।[২৭৬] জানা যায় যে, এখানে প্রতি বছর হযরত খান জাহান আলী (রহ:)-এর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে ২৫শে অগ্রহায়ণ বিশেষ মিলাদ ও ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় সমস্ত কবরগাহ্ ধৌত করে নতুন করে সজ্জিত করা হয়।

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে বহু লোক এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে থাকেন। ঐদিন ভোজেরও আয়োজন করা হয় এবং এতে বহু ভক্ত অংশগ্রহণ করে দূর-দূরান্ত থেকে। কুরআন খতম, জেকের ও ইসলামি কাওয়ালীও অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রতি মাসে করে দূর-দূরান্ত থেকে। কুরআন খতম, জেকের ও ইসলামী কাওয়ালীও অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রতি মাসে পূর্ণিমার সময়ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।[২৭৭]

অধুনা কয়েক বছর ধরে অনেক কবর ও প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আবিকৃত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও আবিষ্কারের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই খলিফাতাবাদ নগরের যত্রতত্র অধিক সংখ্যক কবর এবং মনুষ্য কঙ্কাল ও অস্থি এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, তাতে প্রাচীনত্বের ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

৬.৪ খাঞ্জালীর সমাধি ও তাঁর লিপিসমূহ

পরিশিষ্ট- ৮

বাংলাদেশে যতগুলো প্রাচীন সমাধি জাঁকজমকের সাথে মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তি পেয়ে আসছে, তন্মধ্যে বাগেরহাটের পীর হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাধি অন্যতম। দক্ষিণবঙ্গের এক প্রান্তে এর অবস্থান হলেও প্রতিদিন ভক্ত ও দর্শকদের আগমনের বিরাম নেই। যে সমাধি সৌধের অভ্যন্তরে তিনি সমাহিত আছেন, কলা-কৌশলের দিক দিয়ে তা সমসাময়িক স্থাপত্য সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে

Dhaka University Institutional Repository

আছে। বাগেরহাট জেলায় সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর দিঘি বা খাঞ্জালী দিঘির উত্তর পাড়ে এ সমাধিসৌধ অবস্থিত। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর নশ্বর দেহ এখানেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। তিনি মরেও অমরত্ব লাভ করেছেন। জনসাধারণ তাঁকে পীর বা মোরশেদ বলে জানে। দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে, "হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সমাধি প্রায় ৫৩.৩৪ একর ভূমির উপর অবস্থিত।"[২৭৮] এ সমাধি সৌধটি বর্গাকৃত। "এর আয়তন ৪২ x ৪২ ফুট , প্রাচীরের উচ্চতা ২৫ ফুট।"[২৭৯] সমাধি-সৌধের চারদিকে দেয়াল বেষ্টিত এবং এর পরিধি ৬ ফুট ।

এছাড়া সমাধি সৌধের ভেতরে আরও একটি দেয়াল আছে যার বেষ্টন ৫১ ফুট। এর চারকোণে চারটি নাতিদীর্ঘ স্তম্ভ দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা আছে। সুন্দরবন অঞ্চলের দালান কোঠা প্রায় ৬ ফুট পর্যন্ত নোনা ধরে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সমাধি-সৌধ যাতে নোনায় ধ্বংস করতে না পারে সেজন্য হযরত খান জাহান আলী (রহ:) নির্মাণের সময় প্রস্তর দ্বারা এর দেয়াল গাত্রে নিম্নের দিকে প্রায় ৪ ফুট পর্যন্ত লেয়ার দিয়েছিলেন। উক্ত প্রস্তরের গাঁথুনি এখনো অটুট রয়েছে। এর বাইরের দেয়াল চতুষ্কোণ। কিন্তু ভেতরের দেয়াল আটকোণা বিশিষ্ট এবং ২৪ ফুট দীর্ঘ হয়ে তথা হতে একটি গোলাকৃতি বৃহৎ গম্বুজ প্রস্তুত হয়েছিল। সমাধির প্রবেশ পথে রয়েছে বিশাল তোরণ এবং এর উপর লতা-পাতা, ফুল প্রভৃতি মনোরম কারুকার্য উৎকীর্ণ ছিল।[২৮০] L.S.S.O'Malley সাহেব এ কারুকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কারুকার্যগুলো লোপ পেলেও গম্বুজের উপরিস্থ জমাট এত মজবুত ও সুদৃশ্য যে অদ্যাপি ওটা প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। এটার স্থাপত্য সৌন্দর্য স্থায়ী এবং উপভোগ্য । উত্তর দিক হতে দিঘি ও দরগায় প্রবেশ করতে হলে একটা বিরাট তোরণের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। এ সুউচ্চ তোরণ দর্শন করলে আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের তোরণের কথা মনে পড়ে যায়। প্রতি তোরণে পাথরের খিলান ছিল। সমাধি সৌধের বড় দরজা কাঠের ছিল। সমাধির ঠিক পশ্চিম পাশেই অক্ষত অবস্থায় একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ আছে। এর পূর্ব পাশে একটি বাবুর্চিখানার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। 'শেষ জীবনে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) যখন এ সমাধিতে বসবাস করতেন, তখন উক্ত মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করতেন এবং প্রতিদিন উক্ত বাবুর্চিখানায় রান্না করা খাদ্য তাঁর কাছে আগত সর্বস্তরের লোকদের ভোজন করাতেন।[২৮১]

রওজা মোবারক সর্বদা বস্ত্রাবৃত থাকে। সমাধিসৌধের স্থাপত্য শিল্প অনেকটা ষাট গম্বুজের মত। এর চতুর্দিকে আছে একটি বেষ্টনী দেয়াল। দেয়ালের ভেতরের স্থান বেশ বড়। পূর্ব দেয়ালে আছে একটি দরজা এবং দক্ষিণ দেয়ালে ঠাকুর দিঘির পাকা ঘাট বরাবর আছে আর একটি দরজা। দেয়াল ঘেরা স্থানের প্রায় মাঝখানে আছে সমাধি সৌধ।[২৮২] কিন্তু দেয়ালের উত্তর দিকে কোন দরজা নেই। খিলানের সাহায্যে তৈরি দরজাগুলো প্রায় ৭ ফুট উঁচু । সমাধির দেয়ালগুলো বেশ পুরু। দরজার নিকট দেয়ালগুলো প্রায় ৮ ফুট

Dhaka University Institutional Repository

পুরু। ছাদের উপর একটি মাত্র গম্বুজ রয়েছে। প্রায় ২৪' ফুট দেয়ালগুলো উঠার পরে গম্বুজের কাজ শুরু হয়েছে। অর্ধ গোলাকার বা উল্টান পেয়ালার আকারে গম্বুজটি তৈরি, "এটি বিরাট আকারের এবং মাটি থেকে গম্বুজের চূড়া প্রায় ৪৭ ফুট উঁচু।"[২৮৩] খুবই শক্তভাবে গম্বুজটি তৈরি।

এখন (২০০৪ খ্রিঃ) থেকে প্রায় ৫৫৫ বছর পূর্বে প্রস্তুত হলেও বিশেষ কোন মেরামত ছাড়াই এটি বর্তমান পর্যন্ত প্রায় অটুট অবস্থায় টিকে আছে। তবে গম্বুজের উপরিভাগের কারুকার্য এখন আর টিকে নেই।[২৮৪] সমাধি গাত্রে বিভিন্ন ধরনের লেখনীগুলো তার আমলেই শেষ হয়েছিল। সমাধির উপর আরবীতে অনেকগুলো কুরআন শরীফের আয়াত , দু'আ, দুরূদ, খুলাফায়ে রাশেদীনের নাম, উপদেশ বাণী, কিছু ফার্সি বয়আত , আল্লাহর নাম সমূহ প্রভৃতি রয়েছে। এগুলো পাথরের গাত্রে খোদাই করে লেখা।[২৮৫] কথিত আছে, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর নির্দেশ ক্রমে এ লিপিগুলো লেখা হয়। তখনকার যুগেও এরূপ শিল্পে নিপুণতা ছিল পাথর দেখে বোঝা যায়। বর্তমানে কোন কোন পাথরের লেখা ক্ষয় হয়ে উঠে গেছে। কোন কোন লেখার কোন কোন অংশ একেবারেই নেই, ফলে অনেক লেখাই পড়া যায় না। তবুও সে যুগের মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতার ও শিল্পের যে কতখানি উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, তার জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে তাঁর সমাধি ও মসজিদ আজও আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।[২৮৬]

হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর মাযার গাত্রের শিলালিপিতে আরবী ও ফার্সি ভাষায় হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর মৃত্যুর তারিখ ৮৬৩ হিঃ ২৬ জিলহজ্জ বুধবার মোতাবেক ১৪৫৯ সালের ২৩ অক্টোবর মতান্তরে ২৪ অক্টোবর উৎকীর্ণ আছে।[২৮৭]

পূর্ব পরিকল্পনা ও রূপরেখা অনুযায়ী তুর্কী স্থাপত্যের নিদর্শনে মৃত্যুর পূর্বেই হযরত খান জাহান আলী (রহ:) নিজেই এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন।[২৮৮] সমাধি নির্মাণে ব্যবহৃত ইটে তিনি এমন এক মসল্লা ব্যবহার করেন যার শক্তি আজও অটুট রয়েছে। জানা যায়, মধু, চুন, সুরকি ও পাথরের গুঁড়ার মিশ্রণে তিনি এই সৌধ নির্মাণে ব্যবহার করেছিলেন। এই সৌধের ভেতর প্রবেশ করলে গরমের দিনে ঠাণ্ডা ও শীতের দিনে গরম অনুভূতি হয়।[২৮৯]

আরও জানা যায়, এই মাযারের উপরে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির একটি আলোক বর্তিকা স্থাপিত ছিল। এর বৈশিষ্ট্য ছিল দরজা দিলেই কিছু সময় পরে এটি আলোকিত হয়ে উঠতো।[২৯০] হযরত খান জাহান আলী (রহ:) কিরূপ ধর্মনিষ্ঠাবান ছিলেন তা তদীয় সমাধি লিপির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর বিশ্বাস ছিল ধর্মের প্রতি অটল। শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ সমাধির চতুষ্কোণে হযরত আবু বকর (রা:), হযরত ওমর (রা:), হযরত ওসমান (রা:) ও হযরত আলী (রা:) এই চারজন শ্রেষ্ঠ খলিফার নাম লিখিত রয়েছে। প্রত্যেক খলিফার নামের পূর্বে "এলাহি বেহুর মতে" এবং পরে "রাজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু" - লেখা আছে।[২৯১]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ হে খোদা! খলিফাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক - তাঁরই সম্মানার্থে লিখিত হলো।" এ লেখনী হতে জানা যায় যে, তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। আরবী ভাষায় কবরের চতুর্দিকে লেখা রয়েছে- "মাম্মাতা গারীবান ফাকাদ মা'তা শাহীদান।"[২৯২] অর্থাৎ - যিনি মুসাফির অবস্থায় দেহত্যাগ করলেন, তিনি যেন শহীদ বা ধর্ম যোদ্ধার ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। প্রস্তরের উপর অর্ধ গোলাকৃত মৎস্য পৃষ্ঠের ন্যায় লেখা আছে --

"আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজীম -

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।"[২৯৩]

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির জন্য সাহায্য চাচ্ছি। পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। আরবী ভাষায় কালেমা তৈয়্যেবা ও কালেমা শাহাদত উত্তরদিকে শীর্ষ প্রস্তরের উপর লেখা রয়েছে।[২৯৪]

অর্থ ঃ - মহান আল্লাহ্-তায়ালা ব্যতীত আর কেউ উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর প্রেরিত রাসূল এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ -তায়ালা ব্যতীত আর কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নেই; তিনি এক তাঁর কেউই অংশীদার নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা:) তাঁর একজন বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত পয়গম্বর। এ কালেমা সমূহ ইসলাম ধর্মের কুঞ্জিস্বরূপ, যা বিশ্বাস ও পাঠ না করলে সত্যিকার মুসলমান হওয়া যায় না।

আরবী ভাষায় রওজা মোবারকের উত্তরদিকে লেখা আছে - "হাজিহি রওজাতুম মুবারাকাতুন মির রিয়াজিল জান্নাতি লেখানিল আ'যম খান জাহান আলাইহির রাহমাতু ওয়া রিজওয়ানু তাহ্রীরান ফি ছিত্তাতি ওয়া এশরীনা মিন জিলহজ্জ ওয়া ছালাছা হেত্তিনা ওয়া ছামানু মিয়াতিন।"[২৯৫]

অর্থাৎ - খানে আ'যম খান জাহান আলী (রহ:) এর এ পবিত্র সমাধি বেহেশ্তের বাগিচা বিশেষ। তাঁর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। তারিখ ২৬শে জিলহজ্জ ৮৬৩ হিজরি।

খানে আ'যম তুর্ক আফগান শাসনামলে প্রধান সেনাপতির সম্মানিত উপাধি ছিল। স্বাধীন শাসক হলে তাঁর কবরগাত্রে সুলতান, রাজা বা বাদশাহ্ বা অনুরূপ কোন খেতাব বা উপাধি খোদাই থাকতো। সমসাময়িক কোন ইতিহাস গ্রন্থে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর নাম নেই। "খানে আ'যম" উপাধি হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন মূলত একজন সেনানায়ক। ইসলাম ধর্মে তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং তিনি মানব সেবার দিক দিয়ে অসংখ্য জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে সমাধির দক্ষিণ দিকেও -

Dhaka University Institutional Repository

" ওয়াদ্দুনিয়া আউয়ালুহা বাকায়ুন

ওয়া আওছাতুহা আনাউন

ওয়া আখিরুহা ফানাউন।"[২৯৬]

অর্থ ঃ - পৃথিবী এমন এক জায়গা যার শুরু ক্রন্দনে, মধ্যস্থলে দুঃখ -কষ্টে এবং এর পরিণতি ধ্বংস।

ইরানের সূফী-সাধকদের অমর বাণী যা মূল্যবান উপদেশ মিশ্রিত আরবী-ফার্সি ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে সমাধির দক্ষিণদিকে। এটা আরবী-ফার্সি ভাষার সংমিশ্রণে প্রণীত যা একটি সুন্দর রোবাই বা চতুষ্পদী কবিতা। এটি এমন চমৎকার মর্মগাঁথা মানুষের অন্তরকে খোদাপ্রেমে মশগুল রাখে।

ইয়ারো মুরিদ-ই দোস্তান

আলমাওতু হাক্কুন আলমাওতু হাক্কুন।

খারাস্ত আম্দার বোস্তান

আলমাওতু হাক্কুন আলমাওতু হাক্কুন।

মারগাস্ত খাসমিয়ে মোহকামি

পিয়ে জুমলায়ে জানান যু একিন।

নয়ী হামচু দিগার দুষমুনান

আলমাওতু হাক্কুন আলমাওতু হাক্কুন।[২৯৭]

ভাবার্থ ঃ হে বন্ধুগণ ! স্মরণ রেখো, মৃত্যু অনিবার্য । এটা বাগিচার মধ্যে অবস্থিত কন্টকের মত। মৃত্যু নিশ্চিত জেন। মৃত্যু প্রতিটি জীবের মহা শত্রু। অন্যান্য শত্রু অপেক্ষা এটা ভয়ঙ্কর। নিশ্চয় জেন মৃত্যু অনিবার্য।

উপর্যুক্ত শিলালিপি আমার পর্যবেক্ষণের সঙ্গে বাগেরহাটের প্রথম এস.ডি.ও. মি.সাণ্ডার্সের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় রূপান্তরকৃত অংশটি স্মরণ করা যেতে পারে।

" জগতে ক্রন্দন ল'য়ে খুলি'এ জীবন,

কতবা যাতনা কষ্ট করে আক্রমণ!

পরীক্ষার নাহি পার জীবন ভরিয়া

(কিন্তু) সর্বশেষ করে শেষে মরণ আসিয়া।

মৃত্যুই নিশ্চয় ভাই মৃত্যুই নিশ্চয়,

জীবন-উদ্যানে তীক্ষ্ণ কন্টকের ন্যায়,

মরণ নিশ্চয় ভাই, মরণ নিশ্চয়।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের হেন অরি নাহি কেহ আর,
অন্য শত্রু হ'তে এর প্রভেদ বিস্তর,
দুষ্ট শয়তান আছে অরাতি তোমার
ট'লাতে বিশ্বাস তব চেষ্টা সদা তার;
সকল সমাজে দেখি এই রীতি আছে-
দুর্বল লভয়ে ক্ষমা সবলের কাছে;
ক্ষমা নাই-দয়া নাই-মৃত্যু দুর্নিবার,
মরণ নিশ্চিত ভাই, আছেরে সবার।"[২৯৮]

সমাধি গাত্রের প্রস্তর পৃষ্ঠের দক্ষিণ দিকে মধ্যস্থলে একটা চতুষ্কোণ এবং তন্মধ্যে একটা বৃত্ত রয়েছে। আরবী ভাষায় নিম্নের কথাগুলো এ বৃত্তের চারপাশে লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ -

" এনতাকালাল আবদুদ্দায়ীফ আলমুহ্তাজু ইলা রাহ্মাতি রাব্বিল আ'লামীন, আলমুহিব্বু লে আওলাদে সাইয়্যেদিল মুরসালিন, আলমুখলিসু লিল উলামায়ির রাশেদীন, আল মুবগিদু লিল কুফ্ফারি ওয়াল মুশরিকীন, আল মু'য়ীদু লিল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন; উলুগ খান জাহান আলাইহির রাহ্মাত ওয়াল গুফরান মিন দারিদ দুনিয়া ইলা দারিল বাকা - লায়লাতুল আরবায়া ফি ছিত্তাতে ওয়া এশরীনা মিন যিলহজ্জ ওয়া দুফিনা ইয়াত্তমাল খামিছে ফি ছাবয়াতে ওয়া এশরীনা মিনহু, ফি ছানাতে ছালাছা ছেত্তিনা ওয়া ছামানিয়াতা।[২৯৯] অর্থ ঃ- "আল্লাহর নগণ্য দাস, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের করুণা প্রত্যাশী প্রেরিত পুরুষ প্রবরের বংশধরদের অনুরক্ত, সৎপথগামী আলিমগণের একাধিক বন্ধু, কাফির ও মুশরিকদের শত্রু, ইসলাম ও মুসলিমদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকারী, উলুগ খান জাহান তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক, ৮৬৩ সালের ২৬ যু'ল হিজ্জা ঃ বুধবার রাতে, এ নশ্বর দুনিয়া হতে চিরস্থায়ী আবাসভূমিতে প্রস্থান করেন এবং উক্ত মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি সমাহিত হন (মৃত্যু ২৩ অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রিঃ)।

এ লেখনীর মাঝে এ আভাষ পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি অতিশয় সম্মান করতেন মহানবীর বংশধরদের, আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ, ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস ও ভক্তি এবং দীনতা উক্ত লেখনীর মাঝে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া পবিত্র কুরআনের ১০৯ সূরা (কাফিরুন) সমাধি গাত্রের পশ্চিম দিকে কুরআনের ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১০২ সূরা (তাকাসুর) পূর্বদিকে আছে। সমাধি গাত্রের পশ্চিম দিকে পবিত্র কুরআনের বৃহত্তম সূরার (সূরা বাকারা) অংশ বিশেষ যাকে " আয়াতুল কুরসী" অর্থাৎ - কুরআনের মহামহিমান্বিত কয়েকটি বাণী লেখা আছে। এ সম্মানিত আয়াত পাঠে অসীম পুণ্য। এতে আল্লাহর মহাগুণাবলীর পরিচয় রয়েছে। সমাধি গাত্রের উত্তর-পশ্চিম দিকে পবিত্র কুরআনের ১১২,১১৩ ও ১১৪ সূরা

Dhaka University Institutional Repository

(এখলাস, ফালাক ও নাস) লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ বাণীসমূহ সমগ্র কুরআনের মাঝে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আল্লাহর নামসমূহ বা আস্‌মাউল হুসনা (সুন্দর নাম-সমূহ) সমাধি লিপির মাঝে লেখা রয়েছে। আল্লাহর মহান গুণাবলীর পাশে নিম্নের দোয়া লিপিবদ্ধ আছে। "নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব ওয়া বাস্থিরিল মু'মিনীন।"[৩০০]

অর্থ ঃ আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী । মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ।

সমাধি পৃষ্ঠের উত্তর দিকে হযরত জিবরাঈল (আ:) হযরত মিকাঈল (আ:), হযরত ইস্রাফিল (আ:) এবং হযরত আজরাঈল (আ:) - এ মহান ফেরেস্তাগণের পবিত্র নামসমূহ লিখিত রয়েছে।

সমাধি পৃষ্ঠের দক্ষিণ দিকে লেখা রয়েছে ঃ

" ইয়া বুরহানু ইয়া বাদিউচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ খাল্লিছনা মিনান্নার।"[৩০১]

অর্থ ঃ-হে সর্ব প্রকাশক, হে নিখিল বিশ্বের পালক - আমাদেরকে (পরজগতের) অগ্নিশিখা হতে পরিত্রাণ দাও।

উপর্যুক্ত লিপিসমূহ (লেখনী) ছাড়া আরও বহু লিপি আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ রয়েছে। কয়েকদিন প্রচেষ্টা করার পরও সমস্ত লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয়নি। লিপিসমূহ উদ্ধার করতে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। সমাধি গাত্রের অবশিষ্ট লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার হলে হযরত খান জাহান 'আলী (রহ:) সম্বন্ধে আরও কিছু অজানা তথ্য উদ্ধার করা যেতে পারে ।

পরিশেষে বলা যায় যে, দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচরে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অবদান বাস্তবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যা বিশ্বের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১ ডঃ এ,কে,এম, আইয়ুব আলী, খান জাহান, (ইসলামী বিশ্বকোষ, নবম খণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫০৪

২ বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ) খণ্ড ৩, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত),বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৬৬

৩ সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, মেহেরপুরের ইতিহাস, মিসেস মেহেরুল ইসলাম পাবলিকেশনস, মেহেরপুর, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৭; শ ম শওকত আলী ,কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৫৭

৪ শ ম শওকত আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭; এম ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ২য় সংস্করণ, ফেনী, ১৯৮২, পৃ.২০৯

৫ ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫; Bengal District Gazetteers (Jessore), L.S.S. O'Malley (ed.), The Bengal Secretariat Book Depot., Calcutta, 1912, P.140; Bangladesh District Gazetteers (Jessore), K.G.M. Latiful Bari (ed.) ,Bangladesh Government Press, Dacca, 1979, p. 301; মোঃ আব্দুর রহিম, হযরত খান জাহান আলী, কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, বরিশাল, ১৩৮০, পৃ. ১১; আবুল ফাতাহ মাওলানা জয়নুল আবেদীন, হযরত খান জাহান আলী (র:), খুলনা, ১৯৯৫, পৃ. ১২; মোঃ নুরুল ইসলাম, খুলনা জেলা, খুলনা, ১৯৮২, পৃ. ২২১; নাসির হেলাল, " প্রাণের স্পন্দন জেগেছে মৃতের নগরী বারোবাজারে" আজকের কাগজ, রবিবার ২রা নভেম্বর, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.৭; গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৯৬

৬ বারবাজার ঃ-- যশোর শহর হতে প্রায় ১৬.১০ কিলোমিটার উত্তরে ঝিনাইদহ জেলার একটি প্রত্নস্থল। মৃতপ্রায় ভৈরব নদীর উত্তর তীরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রাচীন বসতির এক নিদর্শনস্থল এই বারবাজার। যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়ক ও এর সমান্তরালে বিস্তৃত নিকটস্থ রেলপথের উভয় পার্শ্বে সমগ্র এলাকাটি জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন স্তূপ রয়েছে। প্রাচীন ইট ও ছড়ানো-ছিটানো প্রত্ন সামগ্রী নিয়ে অসংখ্য স্তূপ ৬.৪৪ কিলোমিটারের অধিক জায়গা দখল করে আছে। প্রত্নস্থলটি এর বিপুল সংখ্যক প্রাচীন জলাশয়ের (প্রায় ১২৬টি) জন্য বিখ্যাত। তবে সেগুলোর প্রায় সব এখন আগাছা ও পলি দ্বারা ভরাট হয়ে এসেছে। এলাকাটির সমৃদ্ধির সময়ে এগুলো সম্ভবত জনসাধারণ্যে সুপেয় পানির জোগান দিত। এসব ধ্বংসাবশেষের মাঝে অসংখ্য প্রস্তর স্তম্ভ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া হিন্দু-বৌদ্ধ ভবনের ভিত্তি এখনো চোখে পড়ে। স্থানীয় লোকজন একটি স্তূপকে চম্পক নগর বা চম্পা নগরের কিংবদন্তির রাজা শ্রীরাম রাজার প্রাসাদ হিসেবে চিহ্নিত করে। ধারণা করা হয়, তিনি জনৈক গোরাই গাজী কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন।

পাকা সড়কের ৪.৮ কিলোমিটার পূর্বে বিলাত গ্রামে সুলতানি যুগের এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মনোরম বর্গাকার (৬.১২ মি. প্রতি বাহু) মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে একটি করে খিলানপথ রয়েছে। মসজিদটি বাঁকানো কার্নিস এবং পূর্ব দিকে একটি বারান্দা বিশিষ্ট। ছোট্ট এই মসজিদটির দেওয়ালগাত্র ফুল নকশায় পোড়ামাটি ফলক দ্বারা অসাধারণভাবে অলঙ্কৃত। বর্তমানে ভবনটির ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) খন্ড ৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

আরও জানা যায়, বারবাজারের পূর্ব নাম নিয়ে বিভিন্ন মতানৈক্য রয়েছে। যেমন - নূরুল্লাহ মাসুম তাঁর লিখিত " দক্ষিণের বাদশাহ খান জাহান আলী (রহ:)" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর আগমনের পূর্বে এই বারবাজারের নাম ছিল 'গঙ্গে' বা 'গঙ্গারোজিয়া'। সেকালের গঙ্গে ছিল 'গঙ্গারিডি' নামক বৌদ্ধ রাজ্যের রাজধানী। বৌদ্ধ শাসিত রাজ্যের রাজধানীতে আস্তানা ফেলার কারণ হয়তো ঐ একটাই, ইসলাম প্রচার। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর আগমনের পর এখানকার নাম হয় বারবাজার। দ্রঃ নূরুল্লাহ মাসুম, দক্ষিণের বাদশাহ খান জাহান আলী (রহ.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,১৯৯৬, পৃ. ৪-৫

অপরদিকে শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর "যশোহর খুলনার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, বারবাজারের পূর্ব নাম ছিল ছাপাইনগর বা চাপাইনগর। দ্রঃ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩২১, পৃ. ২৯০

উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলো বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম বর্ণনাটি অত্যন্ত Authentic বলে আমি মনে করি

Dhaka University Institutional Repository

৭ ভিভাশ চৌধুরী, ষাট গম্বুজের আযান ধ্বনি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩

৮ নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৯ এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, হযরত খান জাহান আলী, ১ম সংস্করণ, খুলনা, ১৯৬৬, পৃ. ২৩; আবুল ফাতাহ্ মাওলানা জয়নুল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১০ এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল,পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

১১ মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২; ভিভাশ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

১২ খানকাহ ঃ - খানকাহ একটি ফার্সি শব্দ, সূফী দরবেশদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা আস্তানা। ধারণা করা হয়, ইবাদত ও ইসলামি শরিয়াহর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা দানের কেন্দ্ররূপে খোরাসান ও ট্রান্সঅক্সিয়ানায় দশম শতাব্দীতে খানকাহর আবির্ভাব ঘটে। তখন থেকেই ইরান,ইরাক, সিরিয়া, মিশর, আল-মাগরিব (মরক্কো), এশিয়া মাইনর এবং অটোম্যান বা উছমানী সাম্রাজ্যের অংশে ইসলামি বিশ্বের সর্বত্র শহর ও গ্রামাঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

বাংলাদেশে আগমনকারী সূফীরা এয়োদশ শতাব্দীতে সরাসরি পারস্য থেকে খানকাহর ধারণা নিয়ে আসেন। খানকাহ মুসলমানদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। খানকাহগুলোতে নামাজ, মাহফিল ইত্যাদির মতো ইসলামি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। প্রায়ই বহু সংখ্যক সূফীর আশ্রয় দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সব খানকাহতেই আবাসিক ভবন, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মাযার, বিভিন্ন উপগৃহ ও অন্যান্য ভবন থাকতো। ফলে খানকাহগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খানকাহগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমির উপর।

মধ্যযুগের বাংলায় শেখ ও সূফীদের খানকাহগুলো মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মিনহাজ ই-সিরাজ উল্লেখ করেন যে, তৎকালীন বাংলার রাজধানী লখনৌতিতে স্থাপনের পর মুহাম্মদ বখতিয়ার বহু মসজিদ-মাদ্‌রাসা এবং খানকাহ নির্মাণ করেছিলেন। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রথম একশত বছর সময়কালের (১২০৪-১৩০৪) তেরটি শিলালিপির মধ্যে ছয়টি খানকাহর স্মৃতি বহন করে। এগুলো তৎকালীন বাংলার সমাজে খানকাহর গুরুত্ব নির্দেশ করে। দেবকোট, দেওতলা, মহাস্থান, ঢাকা, সোনার গাঁ, চট্টগ্রাম, সিলেট, গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ এবং ত্রিবেণীর (সাতগাঁও) মতো স্থানগুলো ছিল খানকাহর জন্য বিখ্যাত।

'চিল্লাখানাহ' বা খানকাহসমূহ প্রতিষ্ঠা করে সূফীরা বাংলার সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই অনেক অনুগামী ছিল। শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই নয়, সাধারণ শিক্ষা বিস্তারেও তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। বাংলার সূফী-দরবেশদের কোন কোন খানকাহ ছিল ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনচর্চার বড় পীঠস্থান। এগুলো শুধু বাংলার জন্যই নয়, সমগ্র ভারতের জন্যই বেশ কিছু সূফী-দরবেশ ও আলিম ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেছিল। শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী, আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি, নাসির উদ্-দীন মানিকপুরি, শায়খ হোসেন যুক্কারপোস, হাসান উল-দীন মানিকপুরি, শেখ কাকি এবং উত্তর ভারতের আরও কয়েকজন বাংলায় তাঁদের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। খানকাহতে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মানসিক শান্তি লাভ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তার আগ্রহ পরিতৃপ্ত করতে পারতো। এটা হাসপাতাল বা আশ্রয়স্থান রূপেও কাজ করতো যেখানে বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত এবং অসুস্থ ব্যক্তিরা আশ্রয়, উপযুক্ত চিকিৎসা ও ভাল সেবা-শুশ্রূষা এবং যত্ন পেতে পারতো। প্রত্যেকটি খানকা হতে একটি লঙ্গরখানা সংযুক্ত থাকতো, যেখান থেকে দরিদ্র ও অভাব গ্রস্তদের খাদ্য সরবরাহ করা হতো। দানকৃত অর্থ বা লাখেরাজ সম্পত্তির আয় থেকে লঙ্গরখানাগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা হতো। সুতরাং খানকাহ ও লঙ্গরখানাগুলো দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্তদের যথেষ্ট স্বস্তি দান করতো। এসব লঙ্গরখানা সূফী-দরবেশদেরকে সাধারণ মানুষের অধিকতর নিকটে আসার সুযোগ এবং তাঁদের অনুভূতি ও মনোভাব বুঝতে সাহায্য করেছিল। খানকাহ ছিল মানবতা ভিত্তিক। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মতের মানুষ এখানে আসতো, অবাধ মেলামেশা এবং খোলাখুলি আলোচনায় প্রবৃত্ত হতো।

আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান ছাড়াও খানকাহগুলো শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করতো।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), খন্ড ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

১৩ আবুল ফাতাহ্ মাওলানা জয়নুল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৪ Bangladesh District Gazetteers (Jessore), K.G.M. Latiful Bari (ed), op. cit. p. 301; ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫

Dhaka University Institutional Repository

১৫ এম ওবায়দুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ.২০১; নাসির হেলাল, আজকের কাগজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭; এ. এফ, এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২

১৬ নাসির হেলাল, আজকের কাগজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১৭ আবুল ফাতাহ মাওলানা জয়নুল আবেদীন,পূর্বোক্ত,পৃ. ১২-১৩; মোঃ আব্দুর রহিম,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪ ও পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১৯ এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, হযরত খান জাহান আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩; আবুল ফাতাহ মাওলানা জয়নুল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩; মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত , পৃ. ১৩

২০ হোসেন উদ্দীন হোসেন, যশোরাদ্যদেশ, বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৭৫; তিতাশ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬; সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, খানে আজম হজরত খান জাহান আলী (রঃ), মোরশেদ পাবলিকেশন, বাগেরহাট, ১৯৮২, পৃ. ১১৪; এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০

২১ কেল্লাবাটি- তদানীন্তন কালের দু'জন লোক জমি আবাদের জন্য মাটি খুঁড়ছিল। হঠাৎ একটি দুর্গ বের হয়ে পড়ে। সে থেকেই লোকেরা এ স্থানটিকে "কেল্লাবাটি" নামে অভিহিত করেন। দ্রঃ তিতাশ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭

২২ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১; শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১; তিতাশ চৌধুরী , পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬; এম ওবায়দুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

২৩ এ, এফ, এম আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০; তিতাশ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

২৪ নাসির হেলাল, যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৭২

২৫ আবুল ফাতাহ মাওলানা জয়নুল অবেদীন,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭; এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০; মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত,পৃ. ১৪

২৬ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০

২৭ এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, হযরত খান জাহান আলী (রহ:), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪; এম.ওবায়দুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

২৮ এম, ওবায়দুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

২৯ আবুল ফাতাহ মাওলানা জয়নুল অবেদীন,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮

৩০ মোঃ নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

৩১ বুড়ো খাঁ ঃ বুড়ো খাঁ ছিলেন হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অন্যতম প্রধান অনুচর। তাঁর নাম হলো যোয়হান উদ্দীন খাঁ ওরফে বুড়ো খাঁ। দ্রঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

৩২ ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫; নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত,পৃ. ৬; শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

৩৩ ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫; তিতাশ চৌধুরী, পূর্বোক্ত , পৃ. ২৮

৩৪ গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক,পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭; আবুল ফাতাহ মাওলানা জয়নুল অবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৩৫ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১

৩৬ বিদ্যানন্দকাটি ঃ এ গ্রামটি কেশবপুর থেকে ৬.৪৪ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং যশোর সদর থেকে ৩৮.৬৪ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। তৎকালীন সময়ে এখানে একটি বিরাট দিঘি খনন করা হয়। যেটি হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর দিঘি নামে সুপরিচিত; Bengal District Gazetteers (Jessore), L.S.S.O'Malley (ed.), op. cit. p. 141; Bangladesh District Gazetteers (Jessore), K.G.M. Latiful Bari (ed.), op. cit. p. 302

৩৭ গোলাম সাকলায়েন ,পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭; মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৩৮ Bengal District Gazetteers (Jessore), L.S.S. O'Malley (ed.), Ibid, p.141

৩৯ Bangladesh District Gazetteers (Jessore), K.G.M. Latiful Bari (ed.), Ibid, p. 302

৪০ নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ.৬

Dhaka University Institutional Repository

৪১ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১; গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮; নাসির হেলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬; এম ওবায়দুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫; মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯; তিতাশ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৪২ Bengal District Gazetteers (Jessore), L.S.S. O'Malley (ed.), Ibid., p.141; শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, ২৯২; নাসির হেলাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৪৩ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২-৯৩

৪৪ Bangladesh population Census (1974), Jessore District, Bangladesh Bureau of Statistics, Dacca, 1977, p. 144

৪৫ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২-৯৩

৪৬ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২

৪৭ তারা হচ্ছেন - ফরফারাজ খাঁ ও জাফর খাঁ। দ্রঃ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

৪৮ মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯; আবুল ফাতাহ মাওলানা জয়নুল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৪৯ আবুল ফাতাহ মাওলানা জয়নুল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২; মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৫০ মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৫১ মোঃ নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬; মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২

৫২ এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭; মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২

৫৩ এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭

৫৪ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪; মোঃ নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৫

৫৫ নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৫৬ এম ওবায়দুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১; রশীদ আহমদ, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, মডার্ণ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৯০; এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২-৩৩; শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র,পূর্বোক্ত,পৃ. ৩৩

৫৭ 'পায়গ্রাম কস্‌বা' - ফার্সি শব্দ, 'পায়গ্রাম' অর্থ- সুসংবাদ, 'আর কসবা' অর্থ শহর। পুরো নামের অর্থ হলো 'সুসংবাদের শহর'। কিসের সুসংবাদ ? বোধ হয় এখান থেকেই ইসলাম প্রচারের অগ্রযাত্রা শুরু হবে। হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) তা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। এই পায়গ্রাম কসবা বর্তমান যশোর শহর থেকে ৩২.২০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে। নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮;

আরও জানা যায়, কসবা সুলতানি আমলের উপ-বিভাগীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র। প্রশাসনিক উপ- বিভাগগুলোর মধ্যে ইকলিম, ইকতা, মুক্তা, ইরতা, যোয়ার ও কসবা নামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৩৭টি কসবার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

কসবাগুলোর অধিকাংশই বর্তমান জেলা শহরের মধ্যে বা অদূরে অবস্থিত ছিল। একটি কসবার অবস্থান থেকে অন্যটির দূরত্বও একটি লক্ষণীয় বিষয়। এ সব কসবার নামের সঙ্গে অনেক রাজকীয় আমলার পদবির সংযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কাজীর কসবা, কোতোয়ালের কসবা, শহর কসবা, নগর কসবা ইত্যাদি। কসবাগুলোর অবস্থান, একটির সঙ্গে অপরটির দূরত্ব, রাষ্ট্রীয় কিংবা প্রাদেশিক রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নামের সঙ্গে যুক্ত রাজকীয় পদবি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে কসবাকে সুলতানি আমলের একটি উপ-বিভাগীয় প্রশাসন কেন্দ্র বলা যেতে পারে। সুলতানি আমলের 'কসবা'কে জেলা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কসবার দায়িত্বে ছিলেন একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন কাজী ও একজন কোতোয়াল। মোগল আমলে অধিকাংশ কসবাই পূর্বের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

কয়েকটি কসবার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো যেমন-- খুলনার পায়গ্রাম কসবা, মুন্সীগঞ্জ জেলার কাজীর কসবা ও নগর কসবা, টাঙ্গাইল জেলার কসবা আটিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা, লক্ষ্মীপুর জেলার শহর কসবা, বৃহত্তর রংপুরের কসবা নূরপুর, দিনাজপুরের কসবা সাগরপুর, বৃহত্তর রাজশাহী জেলার চোয়ারা কসবা, আমরুল কসবা, কিসমত কসবা ও কসবা মান্দা এবং গৌরনদী উপজেলার বড় কসবা ও লাখেরাজ কসবা।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), খণ্ড ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩-১৪

৫৮ নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭-৮

৫৯ আবুল ফাতাহ মাওলানা জয়নুল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল,হযরত খান জাহান আলী, পূর্বোক্ত,পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৬০ উত্তর ডিহি ঃ ডিহি অর্থ তালুক, কয়েকটি গ্রাম মিলে একটি ডিহি হয়। উত্তর ডিহি ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। এ স্থানে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর বসতবাটি, দরবার শরীফ ও মসজিদ নির্মিত হয়। এখানে একটি পাথর আছে, যা দেখতে সুন্দর ও মনোরম। যাকে খাঙ্গালী পাথর বলা হয়ে থাকে। দ্রঃ আবুল ফাতাহ মাওলানা জয়নুল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৬১ দক্ষিণ ডিহি ঃ এটা একটা অতি প্রাচীনতম গ্রাম। যা হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সময় হতে দক্ষিণ ডিহি নামে সুপরিচিতি লাভ করে এবং এর অধিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তীতে এই স্থান নানাবিধ কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শুধু তাই নয়, এ স্থানে পীরালী সম্প্রদায়ের লোক বাস করতো। এছাড়া দক্ষিণ ডিহি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী মৃনালিনী দেবীর গ্রাম। দ্রঃ গোলাম মোস্তফা সিদ্দাইনী, মৃনালিনী দেবীর গ্রাম, দক্ষিণ ডিহি ঃ স্মারক গ্রন্থ, দক্ষিণ ডিহি রবীন্দ্র কমপ্লেক্স পরিচালনা পরিষদ, খুলনা, ১৯৯৫

৬২ রশীদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১; মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, হযরত খান জাহান আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৬৩ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯-৯০

৬৪ রশীদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২; গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

৬৫ মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫; রশীদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২; সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২-৪৩; নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

৬৬ এম, আব্দুল কাদের, মুসলিম কীর্তি, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ. ৩০৬; নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৬৭ এম; আব্দুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮

৬৮ বারাকপুর ঃ - ব্যারাক শব্দের অর্থ শিবির। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সৈন্যগণ এখানে ছাউনি ফেলেছিলেন বলে এ স্থানের নাম হয়েছিল বারাকপুর। এখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এস্থানে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) -এর কীর্তির কোন চিহ্ন না থাকলেও নাউলি থেকে ধূলগ্রামের মধ্য দিয়ে বারাকপুর পর্যন্ত খাঙ্গালী রাস্তার চিহ্ন রয়েছে। এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮; নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১১

৬৯ সেনের বাজার ঃ খুলনা শহরের উত্তর দিকে সেনের বাজার। সেনের বাজার নামটিও কিন্তু জনৈক জমিদারের নামানুসারে হয়েছে

৭০ রশীদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২; মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, হযরত খান জাহান আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২; এম. আব্দুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬; নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৭১ মোঃ আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

৭২ সামন্তসেনা ঃ সামন্তসেনা নাম হতে বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে কোন এক সামন্ত জমিদারের রাজত্ব ছিল এবং তাদের সেনাবাহিনীর সাথে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সৈন্যদের সংঘর্ষ হয়ে থাকবে হয়তো। দ্রঃ নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৭৩ রাংদিয়া ঃ জানা যায়, সামন্ত সেনাদের সাথে সংঘর্ষে যখন হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর সৈন্যরা ক্রমাগত জয়ী হচ্ছিল, বিধর্মীগণ পরাজিত। সামন্ত রাজন্যবর্গ তখন ব্রাহ্মণ সমাজের বিলুপ্তির ভয়ে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর নিকট ব্রাহ্মণদের রক্ষায় প্রার্থনা জানান। মহান সাধক হযরত খান জাহান আলী (রহ:) মানবতার ধর্মে দীক্ষিত। ইসলামে হিংসা-বিদ্বেষ শেখায় না, ক্ষমা করতে শেখায়। তিনি বললেন, ব্রাহ্মণরায় দিয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রক্ষা কর। তাই গ্রামের নামকরণ হয় ব্রাহ্মণ রাখদিয়া। তা আজকের মতান্তরে জানা যায় হিন্দু ধর্মে বর্ণ-বৈষম্যের কারণে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ক্রমাগত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে বর্ণবাদী ব্রাহ্মণরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলে সমাজ পতিগণ ব্রাহ্মণ সমাজ বিলুপ্তির ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। তারা দলবদ্ধ হয়ে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর নিকট ব্রাহ্মণদের ইসলামে দীক্ষিত না করার প্রার্থনা জানালে হযরত খান জাহান আলী (রহ:) ঐ নির্দেশ দেন। সেই থেকে গ্রামের নাম ব্রাহ্মণ রাখদিয়া > ব্রাহ্মণ রাংদিয়া > রাংদিয়া। দ্রঃ নূরুল্লাহ মাসুম , পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১২

৭৪ রশিদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২-৯৩; এম ওবায়দুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

৭৫ ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫

৭৬ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮; সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩
খলিফাতাবাদ ঃ-- বর্তমান বাগেরহাট শহরের সাথে ভৈরব নদীর তীরে শনাক্তকৃত নগর। পরবর্তী ইলিয়াসশাহী সুলতান নাসির উদ্-দীন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রিঃ) এর আমলে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) (মৃত্যু ১৪৫৯ খ্রিঃ) নামীয় শাসনকর্তা (মুকতা) কর্তৃক খলিফাতাবাদ এলাকাকে মুসলিম অধিকারে আনা হয়। নাসির উদ-দীন নুসরত শাহের শাসনকালে (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ) ৯২২ হিজরি মোতাবেক ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে টাকশাল শহর হিসেবে শহরটির আবির্ভাব ঘটে এবং গিয়াস উদ-দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩২-১৫৩৮ খ্রিঃ) এর রাজত্বকাল পর্যন্ত এটির এ মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল।
সুলতান গিয়াস উদ-দীন মাহমুদ শাহ ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'খলিফাতাবাদ বদরপুর' নামে শহরটির নতুন নামকরণ করেন। সুলতান তাঁর সম্মান সূচক উপাধি আবদ-আল-বদর অনুসরণে 'বদরপুর' শব্দটি এর সাথে যুক্ত করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি ডি.ব্যারস, ব্লাইভ এবং ভেন ডেন ব্রুকের পর্তুগীজ মানচিত্রে শহরটিকে 'কুইপিটাভাজ' যা খলিফাতাবাদের বিকৃত উচ্চারণ নামে দেখানো হয়েছে। বর্তমান বাগেরহাটের চারদিকের এলাকা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত 'হাবেলী খলিফাতাবাদ' বা উপ-শাসকের আবাসস্থল নামে পরিচিত ছিল। এ নাম আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে দেওয়া হয়। শহর ও শহরতলীতে কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান ও স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) কর্তৃক বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদ বাগেরহাটের ৬.৪৪ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। মসজিদটির সন্নিকটে প্রায় একশত একর ভূমি জুড়ে উল্লিখিত শাসকের আদেশে একটি দিঘি (বড় পুকুর) খনন করা হয়। এটির জনপ্রিয় নাম "ঘোড়া দিঘি"। বাগেরহাট শহর থেকে ৪.৮৩ কিলোমিটার এবং ষাটগম্বুজ মসজিদে যেতে প্রধান সড়ক থেকে .৮০Error! কিলোমিটার দূরে আরও একটি বড় দিঘির পাড়ে হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর সমাধি সৌধ অবস্থিত। দিঘিটির আয়তন প্রায় একশত আশি একর এবং এটি 'ঠাকুরদিঘি' নামে পরিচিত। সমাধি সৌধ, দিঘি এবং এর পাড়ে অবস্থিত মসজিদ সব মিলে এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এবং খলিফাতাবাদের পাকা রাস্তার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনেক এবং এর থেকে বোঝা যায় যে, একক্কালে শহরটি বেশ বড় এবং সমৃদ্ধশালী ছিল। এটি একটি টাকশাল এবং প্রশাসনিক সদরদপ্তর ছিল এবং এটি জলাভূমি ও বিল এলাকায় পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছিল। Banglapedia (National Encycloopdia of Bangladesh), Vol. 6, Sirajul Islam (ed.), Asiatic Society of Bangladesh, 2003, pp. 53-54

৭৭ দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), খণ্ড ৩, পূর্বোক্ত, পৃ.৬৬

৭৮ সাদেক শিবলী জামান,বাংলাদেশের সূফী সাধক ও অলী আওলিয়া, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৩৯

৭৯ বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬

৮০ সাক্ষাতকার গ্রহণ, ২২ জুলাই ২০০২, সকাল ১০ টা

৮১ বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ),সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২

৮২ বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ),সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) খণ্ড ৯, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২

৮৩ Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1908, p. 168

৮৪ Bangladesh District Gazetteers (Khulna), K.G.M. Latiful Bari (ed.), op. cit., p. 376

৮৫ Ahmad Hasan Dani, Muslim Architecture in Bengal, Asiatic Society of Pakistan Publication, Dacca Museum, Dacca, 1961, p. 144

৮৬ Dr. Syed Mahmudul Hasan, op. cit. p. 160

৮৭ বাংলা বিশ্বকোষ চতুর্থ খণ্ড, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম (সম্পাদিত), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ.৫০৭

৮৮ Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.),op. cit. p. 168; Bangladesh District Gazetteers (Khulna), K.G.M. Latiful Bari (ed.), Ibid, p. 176

৮৯ বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খণ্ড ৯, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৪

Dhaka University Institutional Repository

৯০ Johana E.Van Lohuizen de Leeuw," The early Muslim monuments at Bagerhat" , in George Michell (ed.), The Islamic heritage of Bengal, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Unesco, Belgium, 1984, p.177

৯১ Bangladesh District Gazetteers (Khulna), K.G.M. Lartiful Bari (ed.), Ibid, p. 377

৯২ বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খণ্ড ৯, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬

৯৩ Bangladesh District Gazetteers (Khulna), Ibid, P. 376; বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৭; এ,এফ,আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২; দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ.২৫৩

৯৪ Bangladesh District Gazetteers (Khulna), K.G.M. Latiful Bari (ed.) , Ibid, p. 377

৯৫ Sir Wolseley Haig (ed.), The Cambridge History of India, Volume III, Published by S. Chand and Co., Ram Nagar, New Delhi, 2nd Indian Reprint, 1965, p. 604

৯৬ JASB, Vol. XXXVI (36), Babu Gaurdass Bysack, On the Antiquities of Bagerhat, Calcutta, 1867, p. 132; Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), op. cit., p.168; The Pakistan Observer, 10 October Sunday, Anwar Hussain, Khan Jahan Ali Khan, Dacca, 1965; Ahmad Hasan Dani, op. cit, p. 114; Bangladesh District Gazetteers (Khulna) , K.G.M. Latiful Bari (ed), Ibid, p. 373; Dr. Nazimuddin Ahmed, Discover the Monuments of Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, 1984, p. 138

৯৭ Dr. Syed Mahmudul Hasan, op. cit., p. 162

৯৮ Bangladesh District Gazetteers (Khulna), K.G.M. Latiful Bari (ed.), Ibid, p. 377

৯৯ Sir Wolseley Haig (ed.), The Cambridge History of India, op. cit., p. 604

১০০ সাক্ষাতকার গ্রহণ ২৩ জুলাই ২০০২ সকাল ১০ টা

১০১ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

১০২ Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), op. cit., p. 167

১০৩ Ibid, p. 167

১০৪ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

১০৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪

১০৬ বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খণ্ড ৯, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬

১০৭ Bangladesh District Gazetteers (Khulna), K.G.M. Latiful Bari (ed.), Bangladesh Government Press, Dacca, 1978, p. 377; Dr. Syed Mahmudul Hasan, Muslim Monuments of Bangladesh, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987, p. 167; বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), খণ্ড ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১০৮ Bangladesh District Gazetteers (Khulna), K.G.M. Latiful Bari (ed.), Ibid., p. 373

১০৯ Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ibid, p. 167

১১০ সাক্ষাতকার গ্রহণ, ২২ জুলাই ২০০২, সকাল ১০ টা

১১১ Bangladesh District Gazetteers (Khulna), K.G.M. Latiful Bari (ed.), Ibid, p. 377

১১২ Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ibid, p. 167

১১৩ সাক্ষাতকার গ্রহণ, ২২ জুলাই ২০০২, সকাল ১০ টা

১১৪ Dr. Syed Mahmudul Hasan, op. cit., p. 166

১১৫ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫

১১৬ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

১১৭ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১১৮ আ,কা,মো, যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৮৪, পৃ. ৩৫৯

১১৯ Bangladesh Population Census (1974), Village Population Statistics, Khulna District, Bangladesh Bureau of Statistics, Dacca, 1977, pp. 74, 76,77

১২০ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১২১ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১২২ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১২৩ Dr. Syed Mahmudul Hasan, op. cit., p.158

১২৪ Dr.Nazimuddin Ahmed, op. cit., p. 142; Khoundkar Alamgir, Khan Jahan (R): Ruler, Builder and Saint, Parash publishers, Dhaka, 2001,p.32

১২৫ আ,কা,মো, যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০

১২৬ Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ibid, p.158

১২৭ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১২৮ Dr. Dyed Mahmudul Hasan, Ibid, p. 158

১২৯ আ,কা,মো, যাকারিয়া, পূর্বোক্ত,পৃ.৩৬০

১৩০ Bangladesh Population Census (1974) Village Population Statistics. Khulna District, Bangladesh Bureau of Statistics, Dacca, 1977, p.77

১৩১ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১৩২ Dr. Syed Mahmudul Hasan, op. cit. p.164

১৩৩ Khoundkar Alamgir , op. cit. p.34

১৩৪ Dr. Syed Mahmudul Hasan,Ibid, p.164

১৩৫ আ,কা,মো, যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৮

১৩৬. Bangladesh Population Census (1974), Village population Statistics, Khulna District, Bangladesh Bureau of Statistics, Dacca, 1977, p.76

১৩৭ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১৩৮ আ,কা,মো, যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, প.৪২; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), খণ্ড ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮

১৩৯ বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খন্ড ৩, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮

১৪০ আ,কা,মো, যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৮; বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খণ্ড ৩, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮

১৪১ Johana E.Van Lohuizen-de-Leeuw, "The early Muslim Monuments at Bagerhat" in George Michell (ed.),op.cit. p.176; Dr.Syed Mahmudul Hasan, Ibid,p.163

১৪২ Dr. Syed Mahmudul Hasan, op. cit. , p.163

১৪৩ Ibid. p.163

১৪৪ আ,কা,মো, যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৭

১৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫৭

১৪৬ Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ibid, p.163

১৪৭ Dr. Nazimuddin Ahmed, op. cit. p.140

Dhaka University Institutional Repository

১৪৮ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১৪৯ Khoundkar Alamgir, op. cit, p. 36

১৫০ George Michell (ed.), op. cit. p. 171

১৫১ Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ibid,p.157

১৫২ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১৫৩ আ,কা,মো, যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২

১৫৪ Khoundkar Alamgir, Indigenous and Extraneous Elements of Sultanate Architecture of Bengal,Ph.D. Thesis (unpublished), Dhaka University, 2002, p. 84

১৫৫ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১৫৬ "পীর" ফার্সি শব্দ । পীর হচ্ছেন মুসলিম আধ্যাত্মিক গুরু। মিশর, সিরিয়া, পারস্যদেশ, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে পীর শব্দটির বিকল্প প্রকাশ হচ্ছে আলি, ইমামজাদা শায়খ। এ শব্দগুলো সুলতানি আমল থেকে বঙ্গেও প্রচলিত হয়। এ দেশে পীর অর্থে ফকীর, শাহ শব্দগুলোও প্রচলিত হয়েছে। বাংলায় ইসলাম প্রচারে সূফী সাধকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামের সূফী ভাবধারায় আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশরূপে পীর একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। কোন কোন পীর ভক্তদের বিশ্বাস যে, পীর আধ্যাত্মিক মহাজ্ঞান এবং অতি মানবিক ও অতি লৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি ভক্তকে শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান করেই ক্ষান্ত হন না, তার ইহজগত ও পরজগতের জিম্মিদার হিসেবেও কাজ করেন। তাঁর অনুগ্রহে মজলুম মানুষের মুসকিল আসান হয়, কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যায়। তিনি ভক্তের হয়ে আল্লাহর কাছে যে দোয়া করেন, তা কবুল হয়। কামিল পীর অমর আত্মার অধিকারী। এজন্য শুধু জীবিত কালে নয়, মৃত্যুর পরেও পীরের প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে যায়। তাঁদের দরগাহকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয় ওরস ও মেলাসহ নানা প্রতিষ্ঠানাদি। ভক্তরা পীরের মাযার জিয়ারত করে দোয়া-দরূদ পাঠ করে এবং নানারূপ মনস্কামনা ব্যক্ত করে মানত করে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশে এরূপ বহু মাযার আছে, যেগুলোর মাহাত্ম্য ও জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বাগেরহাটের হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) মাযার, সিলেটের শাহ জালালের মাযার, শাহ পরানের মাযার, চট্টগ্রামের বায়েজিদ বিস্তামীর মাযার, শাহ আমানত আলীর মাযার, ঢাকার শহীদ আদমের মাযার, হাইকোর্টের মাযার, মীরপুরের শাহ আলী বাগদাদীর মাযার, নেত্রকোণার শাহ সুলতান রুমীর মাযার, শাহযাদপুরের শহীদ শাহদৌলার মাযার, দিনাজপুরের ইসমাইল গাজী পীরের মাযার প্রভৃতির নাম করা যায়। জিয়াজুল ইসলাম (সম্পাদিত), খণ্ড ৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩

১৫৭ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

১৫৮ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১৫৯ আ,কা,মো, যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫২

১৬০ মসজিদকুড় ঃ মসজিদকুড়েই হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) এর সহচর বুড়ো খাঁ ও ফতেহ খাঁ প্রধান আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। স্থানটির প্রকৃত নাম আমাদি, এরই উত্তরাংশে বুড়ো খাঁ মসজিদ নির্মাণ করেন। সুন্দরবনের বিপ্লবে এই স্থান অনেককাল পর্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে থাকে। সেই জঙ্গল কেটে মাটি খুঁড়ে যখন মসজিদ বের হয়, তখন সে স্থানের নাম রাখা হয় মসজিদকুড়। শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

১৬১ Bangladesh Population Census (1974), Village Population Statistics, Khulna District, Bangladesh Bureau of Statistics, Dacca, 1977, p. 50

১৬২ আ,কা,মো, যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২

১৬৩ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

১৬৪ Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), op. cit., p. 183

১৬৫ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫; মোঃ নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭

১৬৬ Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), Ibid, p. 183

১৬৭ Ibid, p. 183; শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

১৬৮ A Report on the District of Jessore, Sir J. Westland, Calcutta, 1874, p. 73

Dhaka University Institutional Repository

১৬৯ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬

১৭০ মোঃ নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬

১৭১ নাসির হেলাল, বায়বাজারের ঐতিহ্য, সীমান্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩

১৭২ Dr. Syed Mahmuddul Hasan, op. cit, p. 147

১৭৩ আ,কা,মো, যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪; আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পাদিত), যশোর জেলার ইতিহাস, দিগন্ত প্রচারনী লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২১৬

১৭৪ সাক্ষাতকার গ্রহণ ২৩ জুলাই ২০০২, সকাল ১০ টা

১৭৫ আস'দুজ্জামান আসাদ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

১৭৬ George Michell (ed.), The Islamic Heritage of Bengal, op. cit, p. 171

১৭৭ আ,কা,মো, যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৩; Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ibid, p. 157

১৭৮ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১৭৯ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬

১৮০ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১৮১ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬

১৮২ Bangladesh District Gazetteers (Khulna), K.G.M. Latiful Bari (ed.), op. cit. p. 373; George Michell (ed.) The Islamic Heritage of Bengal, op. cit. p. 173

১৮৩ Dr. Syed Mahmudul Hasan, op. cit. p. 167

১৮৪ Bangladesh District Gazetteers (Khulna), K.G.M. Latiful Bari (ed.), Ibid, p. 373.

১৮৫ Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ibid, p. 167

১৮৬ দৈনিক ইনকিলাব, ১০ নভেম্বর ১৯৯৯

১৮৭ আ,কা,মো, যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১

১৮৮ Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), op. cit., p. 169; বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খণ্ড ৩, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১৮৯ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১৯০ Dr. Syed Mahmudul Hasan, op. cit. p. 167; দৈনিক ইনকিলাব, ১০ নভেম্বর ১৯৯৯

১৯১ দৈনিক ইনকিলাব, ১০ নভেম্বর ১৯৯৯

১৯২ Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), Ibid, p. 166

১৯৩ নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

১৯৪ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০

১৯৫ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

১৯৬ আ,কা,মো, যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১

১৯৭ দৈনিক ইনকিলাব, ১০ নভেম্বর ১৯৯৯

১৯৮ Dr. Syed Mahmudul Hasan, Ibid, p. 167

১৯৯ Ibid, p. 167

২০০ অলি ঃ-- মহান আল্লাহর নিকটতম ঈমানদার ব্যক্তি এবং মুমিনদের বন্ধু। তিনিই অলি যিনি খোদাভীরু এবং মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথার্থরূপে মেনে চলেন। অলি হওয়ার জন্য ঈমান, অত্যধিক সৎকাজ ও নফল ইবাদত অতীব প্রয়োজন। পুরুষের ন্যায় স্ত্রী লোকও সাধনার দ্বারা অলি হতে পারে। যদিও অলিদের মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে, তথাপি সূফীবাদে অলি বলতে শুধু কামিল অলিকেই বোঝায়। সূফীদের মতানুসারে অলি হতে হলে শরিয়ত ও তরিকত উভয়ের অনুশীলন অত্যাবশ্যক। শরিয়ত ও তরিকত উভয়ই পালন করে যিনি মারেফাত ও হকিকত লাভ করেন তিনিই হচ্ছেন অলি। কোন কোন সময় মহান স্রষ্টার কৃপায় তাঁর কিরামত (অলৌকিক শক্তি) প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি তা গোপন রাখতে প্রচেষ্টা করেন। এছাড়া মহান প্রভুর নিকট থেকে তাঁর অন্তরে জ্ঞান ও বিশেষ অবস্থা আপতিত হয়। এগুলো হচ্ছে অলির বৈশিষ্ট্য । সূফীদের বিশ্বাস, প্রভু সর্বদা পৃথিবীতে অলি বিরাজমান রাখেন, যদিও তাঁদের অলিত্ব সব সময় প্রকাশ পায় না। সকল অলিই নিজেকে প্রকাশ করেন না।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ কেউ নিজেকে অজ্ঞাতবাসে রাখেন। তাঁরা যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তাঁদের ফয়েজ বরকত অহরহ-ই-পৃথিবীতে বিরাজমান থাকে। কোন কোন সূফী আরও বিশ্বাস রাখেন যে, বিশ্ব ভূমণ্ডলের আধ্যাত্মিক প্রশাসন অলিদের উপরই ন্যস্ত। অবশ্য শরিয়ত সূফীদের এরূপ বিশ্বাসের গুরুত্ব দেয় না। সুবিখ্যাত অলিদের অন্যতম হযরত শাহ্ জালাল (রহঃ) (মৃত্যু ১৩৪৪ খ্রিঃ) , হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) (মৃত্যু ১৪৫৯ খ্রিঃ) এবং হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রহঃ) (মৃত্যু ১৪৮০ খ্রিঃ) এর সঙ্গে আরও অনেক অলি ইসলাম প্রচারার্থে বাংলাদেশে আগমন করেন। এদের মধ্যে শাহ মাখদুম (রহঃ), শাহ পরান (রহঃ), মাওলানা কায়ামত আলী জৌনপুরী, শাহ সুলতান (রহঃ), শাহ আমানত (রহঃ), গরীবুল্লাহ শাহ (রহঃ), মোহসীন আওলিয়া (রহঃ), শাহ বদর (রহঃ), শরফুদ্দীন চিশতি (রহঃ), শাহ জালাল (রহঃ) ও আরও অনেকে এদেশে শায়িত।

দেশের নানা স্থানে অলিগণ খানকাহ নির্মাণ করে আধ্যাত্মিক সাধনা করেন। তাঁদের পবিত্র জীবন ও তাঁদের দ্বারা প্রচারিত ইসলামের সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁদের নবদীক্ষিত শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই কালক্রমে আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে পৌঁছেন এবং কেউ কেউ অলির মর্যাদাও লাভ করেন। এভাবে স্থানীয় ও বহিরাগত সূফী ও অলিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগের বাংলায় জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ অলিদের অধিকাংশই আলিম ও সূফী । সাধারণত তাঁরা চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকার অন্তর্ভুক্ত । জিকির তাঁদের আমলের মধ্যে প্রধান। তাছাড়া কালব বা আত্মার উন্নতিকল্পে তাঁরা নির্জনতা, মুরাকাবা, তাওবা, তাওয়াক্কুল ইত্যাদির উপরও জোর দেন। তাঁরা শরিয়ত অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতানুসারে সকল পর্যায়েই শরিয়ত মেনে চলা অত্যাবশ্যক। সাধারণভাবে বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর অলি পৃথিবীতে সর্বদাই বিরাজমান। সকল অলি সম-মর্যাদার নন। সর্বশ্রেষ্ঠ অলি হচ্ছেন গাওছ এবং তার পরে কুতুব। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)কে (মৃত্যু- ১১৬৬) এদেশে গাওছুল আজম বা সর্বশ্রেষ্ঠ গাওছ হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়। অলিদের কিরামত সত্য এ বিশ্বাস ইসলামি আকিদার অন্তর্ভুক্ত। এদেশের অনেক অলি কাশফ এর অধিকারী এবং তাঁদের একাধিক কিরামত প্রকাশিত । অলি যত বড়ই হন না কেন, তাঁর স্থান নবীর পরে। তিনি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র। বিপদ-আপদে মহান প্রভুর নিকট দোয়া করার জন্য মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হয় এবং সুফল কামনা করে। তাঁর ইন্তেকালের পর মানুষ তাঁর কবর জিয়ারত করে। এসকল শরিয়ত সিদ্ধ আচার অনুষ্ঠান অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রচলিত আছে। কিন্তু তাঁকে বা তাঁর কবরকে সেজদা করা, তাঁর কবরে ফুল দেয়া ও বাতি জ্বালানো এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁর দরগায় মানত করা এসব সংস্কার শরিয়তে নিষিদ্ধ হলেও ভাবাবেগে কেউ কেউ করে থাকেন। অবশ্য প্রকৃত অলিগণ এসব থেকে ভক্তদের বিরত রাখেন। বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খণ্ড ২, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১-১১২

২০১ দৈনিক ইনকিলাব, ১০ নভেম্বর ১৯৯৯

২০২ নূরুল্লাহ মানুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

২০৩ Dr. Mahmudul Hasan, Ibid, p. 167

২০৪ Banglapedia (National Encyclopedia of Bangladesh), Sirajul Islam (ed.), Vol. 3, op. cit, p. 164

২০৫ Crocodile :- Crocodile সাধারণত গৃহপালিত নয়, সুযোগ পেলে এরা মানুষ আক্রমণ করে। এরা আকৃতির দিক থেকে লম্বা, মুখ লম্বা, লেজটা খুব বড় এবং এরা সর্বোচ্চ ৫০ ফুট(১৫মিটার) পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। The Encyclopedia americana International Edition, Vol. 8, USA, 1829, p. 231
এদের উভয় চোয়ালে বড় চারটি করে দাঁত রয়েছে। মুখ বন্ধ করলে নিচের চোয়ালের চারটি দাঁত দেখা যায়। Ibid, p. 233, এরা স্বাদু পানির কুমীরের তুলনায় বেশিক্ষণ পানিতে থাকে, এমনকি সাগরেও । পানি থেকে উঠে ম্যানগ্রোভ (গরান গাছ) বনের ধারে দিনের বেলা শুয়ে থাকে। প্রধানত মৎসভোজী, তবে বড় বড় তন্যপায়ীও শিকার করে। Sirajul Islam (ed.), Ibid, p. 165
Crododile (স্ত্রী কুমীর) এক সাথে ডিম পাড়ে প্রায় ২০-৭২ (গড়ে ৫০) Sirajul Islam (ed.), Ibid, p. 165. ডিম পাড়ার তুলনায় ভবিষ্যত প্রজন্ম তেমন একটা বৃদ্ধি পায় না। তবে একটা Crocodile ৬ পুরুষ পর্যন্ত এর প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে পারে। The New Encyclopedia Britannica, Vol. 3, Chicago, 2002, p. 745. এদের বেশী দেখা যায় পশ্চিম আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, মাদাগাসকার প্রভৃতি দেশে। The Encyclopedia Americana, International Edition, Vol.8,USA,1829, p. 233

Dhaka University Institutional Repository

২০৬ Alligator - আমেরিকা ও চীনে সাধারণত Alligator গৃহপালিত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। The New Encyclopedia Britannica, Vol. 3, Chicago, 2002, p. 745, এটি আকৃতির দিক দিয়ে মোটা এবং মুখটি খাট, তবে এরা মানুষ আক্রমণ করে না। Alligator বাঁচে প্রায় ৫০ বছর। আর চিড়িয়াখানার Alligator বাঁচে প্রায় ৩০ বছর। এদের চামড়া দ্বারা জুতা, হ্যাণ্ডব্যাগ ইত্যাদি তৈরি হয়। The Encyclopedia Americana International Edition, Vol. 8, USA, 1829, p. 232-33; এরা ডিম পাড়ার তুলনায় ভবিষ্যত প্রজন্ম বেশী বৃদ্ধি পায় এবং ১৫ পুরুষ পর্যন্ত এদের প্রজন্ম টিকিয়ে রাখতে পারে। Ibid, p. 232

২০৭ Gharial - ঘড়িয়াল Reptilia শ্রেণীর Crocodylidae গোত্রভুক্ত Gavialis gangaticus নামের এক প্রাচীনকালীন সরীসৃপ। স্থানীয়ভাবে এটি মেছো কুমীর, ঘট কুমীর বা ঘড়িয়া নামে পরিচিত। প্রধান খাদ্য মাছ বলেই হয়তো মেছো কুমীর নাম। কারও কারও মতে, মাথা ও তুণ্ড দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মাথা ও মুখের মতো বলেই এদের নাম ঘড়িয়াল। অন্যদের মতে, ঘোড়া থেকে নয়, ঘড়া থেকেই ঘড়িয়াল হয়েছে। ঘড়িয়ালের তুণ্ডে কোমল হাড় দিয়ে তৈরি একটি অষ্টভুজ উদগত অংশ থাকে যা দেখতে ঘড়ার মতো। গঙ্গা নদীতে বহুদৃষ্ট বলেই বৈজ্ঞানিক নামের সঙ্গে gangeticus শব্দটি যুক্ত। জলচর এ সরীসৃপটি লাজুক ও শান্ত প্রকৃতির। ঘড়িয়ালের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৪-৭ মিটার। গঙ্গা নদী ছাড়াও উপমহাদেশের অন্যান্য বড় নদীতেও ঘড়িয়াল দেখা যায়। বাংলাদেশের পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনায় এবং সেগুলোর শাখা-প্রশাখায় এক সময় প্রচুর দেখা যেত। বর্তমানে দেখা যায় না বললেই চলে। বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খণ্ড ৩, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭-৪৮

ঘড়িয়ালের দেহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো লম্বা ও সরুতুণ্ড। মুখে উপরের চোয়ালে ৫০টি ছোট কিন্তু খুব ধারালো দাঁত থাকে। নিচের চোয়ালে দাঁতের সংখ্যা ৪৮ । ছোট ছোট মাছ ও জলজ পাখি শিকারে এই দাঁত খুব কার্যকর। ঘড়িয়াল নদীতটে বিচরণরত ছাগল, কুকুর ইত্যাদিও শিকার করে। প্রাকৃতিক পরিবেশে কতদিন বাঁচে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। ঘড়িয়াল বন্দি অবস্থায় প্রায় ৪০ বছর বাঁচলেও সম্ভবত এদের আয়ু আরও বেশি। নদীর তীরে ঘড়িয়াল গর্ত খুঁড়ে তাতে ৪০ বা ততোধিক ডিম পাড়ে এবং মাটি দিয়ে গর্ত ঢেকে দেয়। মার্চ এপ্রিল মাসের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। সদ্যজাত ঘড়িয়াল শাবক মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার। কুমীরের অন্যান্য প্রজাতির মতো ঘড়িয়াল অধিক সময় নদীর তটে রোদ পোহায় না। অন্যান্য কুমীরের মতো এর পা মাটিতে হাঁটা-চলা করার জন্য তেমন উপযোগী নয়। কারণ ঘড়িয়ালের সামনের পা দু'টি পেছনের দু'পা থেকে অপেক্ষাকৃত খাটো ও ছোট আকারের। এরা লিপ্তপদী অর্থাৎ এদের পায়ের পাঁচটি আঙুল সম্প্রসারিত ত্বক দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত। এই পা ও লেজের সাহায্যে ঘড়িয়াল ভাল সাঁতার কাটতে পারে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ঘড়িয়ালকে পবিত্র ভেবে এক সময় দেবতা বিষ্ণুর পূজায় উৎসর্গ করতো। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তখন চামড়া বা মাংসের লোভে ঘড়িয়াল নিধন করা হতো না। ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় বিশ্বাস উবে গেলে মানুষ মূল্যবান চামড়ার জন্য একে হত্যা করতে শুরু করে। মহিলাদের হ্যাণ্ডব্যাগ, জুতা, গৃহসজ্জার জিনিসপত্র ইত্যাদি এদের চামড়া দিয়ে তৈরি হয়। ঘড়িয়ালের চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। ফলে মুনাফালোভী শিকারিদের হাতে অসংখ্য ঘড়িয়াল মারা পড়েছে ও এদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে এসেছে। বর্তমানে প্রাণীটি বিরল এবং বিপুপ্তপ্রায়। বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খণ্ড ৩, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), পৃ. ২৪৮

২০৮ A Report on the District of Jessore, Mr. J. Westland, Calcutta Review, 1874, p. 73

২০৯ Bengal District Gazetteers, (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), op. cit., p. 166

২১০ সাক্ষাতকার গ্রহণ ১৯ জুলাই ২০০০, সকাল ১০ টা

২১১ দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ জুলাই ২০০০ রবিবার

২১২ সাক্ষাতকার গ্রহণ ২০ জুলাই ২০০০, সকাল ১০ টা

২১৩ সাক্ষাতকার গ্রহণ ২০ জুলাই ২০০০ বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিট

২১৪ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২১৫ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২১৬ The New Encyclopedia Britannica in Vol.30, Helen Hemingway Benton 1973-74, p. 287

২১৭ Banglapedia (National Encyclopedia of Bangladesh) , Sirajul Islam (Editor), Vol. 3, op. cit. p. 165

Dhaka University Institutional Repository

২১৮ L Collingwood, Universal Encyclopedia, vol. 8, Regency Publishing Group ptv. Limited, sydney, 1983, p. 136; সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

২১৯ Sirajul Islam (ed.), Vol. 3,Ibid, p. 165,

২২০ L. Collingwood, Ibid, p. 136; Sirajul Islam (ed.), Vol. 3, Ibid, p. 165

২২১ সাক্ষাতকার গ্রহণ, ১২ জুন ২০০১ সকাল ১০ টা

২২২ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, উদ্ধৃত এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল,পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭

২২৩ সাক্ষাতকার গ্রহণ, ২১ জুন ২০০১, সকাল ১১ টা

২২৪ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮

২২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯-৪০

২২৬ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

২২৭ The New Encyclopedia Britannica in 30 vol. op. cit, p. 287

২২৮ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯

২২৯ কামরুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পাদক), সেন্স নিউজ লেটার, জানুঃ-মার্চ, ৩য় বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা,১৯৯৯, পৃ. ১০

২৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২৩২ Banglapedia (National Encyclopedia of Bangladesh) , Sirajul Islam (ed.), Vol. 3, op. cit. p. 164

২৩৩ Banglapedia (National Encyclopedia of Bangladesh) , Sirajul Islam (ed.), Vol. 3, Ibid, p. 165

২৩৪ কামরুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২৩৫ Banglapedia (National Encyclopedia of Bangladesh) , Sirajul Islam (ed.), Vol. 3, Ibid, p. 164

২৩৬ Banglapedia (National Encyclopedia of Bangladesh) , Sirajul Islam (ed.), Vol. 3, Ibid, p. 165

২৩৭ কামরুল ইসলাম চৌধুরী (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২৩৯ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০

২৪০ আবুল কালাম সামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

২৪১ বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খন্ড ৩,সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

২৪২ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

২৪৩ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮

২৪৪ আবুল কালাম সামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

২৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, হযরত খান জাহান আলী,পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

২৪৬ আবুল কালাম সামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

২৪৭ আবুল কালাম সামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

২৪৮ আবুল কালাম সামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, ৪৪; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, হযরত খান জাহান আলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৯

২৪৯ আবুল কালাম সামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪; এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, ৪৯

২৫০ আবুল কালাম সামসুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

২৫১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

২৫২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

২৫৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

২৫৪ ডঃ এ,কে, এম আইয়ুব আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৫; এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, হজরত খান জাহান আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

২৫৫ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭; মুহাম্মদ আবূ তালিব, খুলনা জেলায় ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৮৩

২৫৬ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৭

২৫৭ শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১

২৫৮ মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, সাতক্ষীরা জেলায় ইসলাম প্রচারে আলিম ও সুফীদের অবদান, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০০, পৃ. ২৩৭

২৫৯ সাক্ষাতকার গ্রহণ ২২ জুলাই ২০০০ সকাল ১০ টা

২৬০ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৬১ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২৫

২৬২ Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), op. cit.,p. 194; Richard M.Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, (1204-1760), University of California Press, 1993, p. 210

২৬৩ E. B. Havell, The Ancient and Medieval Architecture of India; A Study of Indo-Aryan Civilization, S. Chand and Co. (Pvt.) Ltd., Ram Nagar, New Delhi, 1915, p. 21

২৬৪ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৬৫ সাক্ষাতকার গ্রহণ ২৩ জুলাই ২০০০ সকাল ১০ টা

২৬৬ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭

২৬৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭

২৬৮ এ,এফ,এম, আব্দুল জলীল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭-২৮

২৬৯ Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.), op. cit. p. 29

২৭০ A Report on the District of Jessore, Mr. J. Westland, Calcutta Review, 1874, p. 12

২৭১ A Report on the District of Jessore, Mr. J. Westland, Calcutta Review, 1857, p.75

২৭২ JASB, Vol. vi: 1910, p. 23

২৭৩ W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, vol. 11, Trubner and Co., London, 1877, p. 230

২৭৪ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৭৫ নূরুল্লাহ মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

২৭৬ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১

২৭৭ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৭৮ দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ জুলাই ২০০০

২৭৯ দৈনিক ইনকিলাব, ১০ নভেম্বর ১৯৯৯

২৮০ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত) , পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

২৮১ ঐতিহ্য, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর অফিসার সমিতি পত্রিকা, তৃতীয় -চতুর্থ সংখ্যা,সৈয়দ আমীরুল ইসলাম (সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬১-৬২

২৮২ আ,কা,মো, যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

২৮৩ আ,কা, মো, যাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

২৮৪ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৮৫ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৮৬ সৈয়দ ওমর ফারুক হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

২৮৭ বাংলা পিডিয়া, (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ), খণ্ড ৩, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

২৮৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

২৮৯ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৯০ সাক্ষাতকার গ্রহণ ২২ জুলাই ২০০০ সকাল ১০ টা

Dhaka University Institutional Repository

২৯১ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৯২ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৯৩ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৯৪ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৯৫ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৯৬ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৯৭ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

২৯৮ মিঃ সাণ্ডার্সের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় রূপান্তরিত; Bengal District Gazetteers (Khulna), L.S.S. O'Malley (ed.),op. cit., p. 166

২৯৯ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

৩০০ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

৩০১ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পরিলক্ষিত হয় যে, এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সাথে সূফী সাধক হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ তিনি ১৫'শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন । ফলে দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তিনি এক বিস্ময়কর অবদান রাখেন। একাধারে তিনি ছিলেন ইসলাম প্রচারক, সমাজ সেবী, সাহসী বীর, সুশাসক ও মহান সূফী-সাধক; বিশেষ করে তিনি দক্ষিণবঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধন করেন। মূলত তিনি দক্ষিণবঙ্গ[১] তথা যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী এবং এগুলোর পার্শ্ববর্তী এলাকা শাসন করতেন।[২] আপামর জনসাধারনের নিকট তাঁর জীবন ছিল দিশারী স্বরূপ। হযরত খান জাহান আলী (রহ:) তৎকালীন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমগ্র অঞ্চল শাসন করলেও প্রশাসনিক কেন্দ্র বাগেরহাটে ছিল বলে মনে হয়। এ অঞ্চলে তাঁর নির্মিত বহু স্থাপত্য কীর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রচলিত আছে, তিনি ৩৬০টি মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন সমসংখ্যক স্বাদুপানির দিঘি খনন করেছিলেন। এর মধ্যে বাগেরহাটে অবস্থিত তার স্বীয় সমাধি কমপ্লেক্সটি অন্যতম দৃষ্টান্ত স্বরূপ টিকে রয়েছে।

এ অঞ্চলে তাঁর দীর্ঘদিনের ব্যাপক কর্মতৎপরতা হতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি অতি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নদী-নালা খাল-বিল পরিবেষ্টিত যশোর-খুলনা ও বাগেরহাট লোনা পানির অঞ্চলে তখন যাতায়াত ও সুপেয় পানির সমস্যা ছিল প্রকট। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পশ্চাদপদ এই এলাকার মুসলিম ও অমুসলিম জনসাধারণ নানা রকমের কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন ছিল। বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল অনাবাদী ও জঙ্গলাকীর্ণ।

সূফী-সাধক হযরত খান জাহান আলী (রহ:) যশোর থেকে বাগেরহাটের পথে এক এক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করে তাঁর অনুসারী বিপুল সংখ্যক ভক্ত মুরীদ ও শিষ্যদের সহযোগিতায় তথায় সড়ক ও পুল নির্মাণ, পুকুর দিঘি খনন এবং মসজিদ ও মাদ্‌রাসা স্থাপন করে সকল শ্রেণীর জনগণের অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এ সকল জন কল্যাণকর কার্যাদি স্বল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতো বলে জনসাধারণ তাকে আধ্যাত্মিক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পীর-দরবেশরূপে সম্মান করতো। তাঁর নিঃস্বার্থ

Dhaka University Institutional Repository

জনসেবায় মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় বহু হিন্দু, বৌদ্ধ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। উচ্চ বংশীয় প্রভাবশালী কোনো হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলে পীর সাহেব তাকে স্বীয় খলিফারূপে ঐ স্থানের প্রশাসনিক দায়িত্বভার তার উপর ন্যস্ত করে তিনি অন্যত্র অগ্রসর হতেন। তিনি যে স্থানে অবস্থান করতেন স্বল্প দিনের মধ্যে একটি জনবহুল কর্মচঞ্চল ছোট খাট শহরে পরিণত হতো। এভাবে যেই সকল শহরের পত্তন হয় তন্মধ্যে যশোরের বারবাজার, মুড়লী কসবা, পায়গ্রাম কসবা, আমাদি (মসজিদকুড়) এবং বর্তমান বাগেরহাট জেলার খলিফাতাবাদ নগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

পরিশেষে তিনি বর্তমান বাগেরহাট শহরের অদূরে অবস্থিত "ঘোড়া দিঘি" নামক স্থানে বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও অনুসারীসহ উপনীত হন। তিনি এ অঞ্চলের নামকরণ করেন খলিফাতাবাদ। বর্তমান বাগেরহাট জেলার সমগ্র অঞ্চলই খলিফাতাবাদ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি খলিফাতাবাদকে তাঁর শেষ আবাসভূমি ও আবাদকৃত সকল অঞ্চলের রাজধানী করে এখান থেকে বিভিন্ন এলাকায় অনুসারীদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। সুন্দরবনের অনাবাদী বিকীর্ণ অঞ্চল তাঁর প্রচেষ্টায় অচিরেই জনবহুল এলাকায় পরিণত হয় এবং খলিফাতাবাদ তথা বর্তমান বাগেরহাট একটি সমৃদ্ধ শহর ও ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে। খ্রিষ্টীয় ১৫'শ শতাব্দীর মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের স্বল্পতম নিদর্শন এবং দক্ষিণবঙ্গের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম মনোরম মসজিদ হলো হযরত খান জাহান আলী (রহঃ)নির্মিত ষাট গম্বুজ মসজিদ । এ মসজিদটি বিশাল ঘোড়া দিঘির পূর্ব তীরে অবস্থিত। এখানে বিচারকার্য ও দরবার অনুষ্ঠিত হতো। মূলত, তৎকালীন সময়ে ষাট গম্বুজ মসজিদটি ছিল একাধারে মুসলিম সমাজের 'ইবাদতগাহ' শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র। এখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুজাহিদ সূফী সাধকগণ তাদের মুরশিদ ও পীরের আদর্শ অনুসরণে ইসলাম প্রচার, মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, অনাবাদী ভূমি চাষাবাদের ব্যবস্থা, বিরাট দিঘি খনন ইত্যাদি জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাগেরহাট, খুলনা ও যশোর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের নির্মিত বহু প্রাচীন মসজিদ ও খননকৃত বিশাল দিঘির চিহ্ন এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

কথিত আছে যে, সূফী-সাধক হযরত খান জাহান আলী (রহঃ) দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচার ও নানাবিধ জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থেকে শেষ জীবনে সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন এবং বাগেরহাটের সন্নিকটে স্বীয় মাযার জীবদ্দশায়ই নির্মাণ করেছিলেন। মাযারের পার্শ্বেই প্রায় সমআয়তনের একটি মসজিদ। সম্ভবত এই মসজিদেই তিনি মুরাকাবা- মুশাহাদায় মগ্ন থাকতেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মসজিদ ও মাযারের সম্মুখেই এক বিশাল দিঘি। এ দিঘিটিই তাঁর খননকৃত এ অঞ্চলের বৃহত্তম শেষ দিঘি; এটা খাজালী দিঘি নামে সুপরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট এবং অনাবাদী সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপকভাবে সুচিন্তিত পদ্ধতিতে ইসলামের বিস্তার, মুসলিম সমাজ সংগঠনে এবং মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহান সূফী সাধক ও শাসক হযরত খান জাহান আলী (রহ:) এর অবদান অবিস্মরণীয়। যা বাংলার হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম তথা সকলের নিকটই তিনি শ্রদ্ধারপাত্র হিসেবে অমর হয়ে রয়েছেন।

তথ্য নির্দেশ

১ Johana E. van Lohuizen de Leeuw, The early Muslim Monuments at Bagerhat in the Islamic Heritage of Bengal (ed.) by George Michell, UNESCO, 1984, P. 167

২ Dr. Nazimuddin Ahmed, Discover the Monuments of Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, 1984, p. 135

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা

আল-কুরআনুল কারীম :

আলী, ডঃ এ,কে,এম, আইয়ূব : খান জাহান (ইসলামী বিশ্বকোষ, নবম খণ্ড) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০

আজমী, নূর মুহাম্মদ : হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯২

আজরফ, দেওয়ান মোহাম্মদ : সিলেটে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫

আজিজ, ডঃ এম,এ, : বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩

আজিজ, শেখ আবদুল : পীর খান জাহান আলী সাহেবের জীবনী, দি বাগেরহাট প্রেস, বাগেরহাট, ১৯৬৬

আত্তার, ফরীদ উদ্-দীন : তাজকিরাতু-ল-আউলিয়া, আর.এ., নিকলসন কর্তৃক সম্পাদিত, লন্ডন, ১৯০৫

আলম, ডঃ রশীদুল : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ১৯৮১

আসকার ইবনে শাইখ : মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮

আলী, কে : মুসলিম বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৭৬৫ খ্রিঃ), আলী পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৭৭

আলী, শ ম শওকত : কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২

আবুল ফজল : আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৮০৫

আবূতালিব, মুহাম্মদ : যশোর জেলায় ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১

আবূতালিব, মুহাম্মদ : খুলনা জেলায় ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮

আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পাদিত) : যশোর জেলার ইতিহাস, দিগন্ত প্রচারনী লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০

আলী, ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব : মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

আলী, মেহ্‌রাব : দিনাজপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১

আলাওল : পদ্মাবতী , শাহ সৈয়দ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত , ঢাকা, ১৯৭৭

আলী, রহমান : তাজকিরাতুল আউলিয়া-ই-হিন্দ, লক্ষ্ণৌ, ১৯১৪

আহমদ, সালাউদ্দীন; মমতাজুর রহমান তরফদার, অজয় রায় (সম্পাদিত) : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ঢাকা, ১৯৯১

আহমদ , রশীদ : বাংলাদেশের সূফী-সাধক, মডার্ণ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৪

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন (সম্পাদিত) : দিনাজপুর ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৬

আহমদ, তোফায়েল : যুগে যুগে বাংলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯২

ইউসুফ, ডঃ ফজলুল হাসান : বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬

ইবন খালদুন : আল-মুকাদ্দিমা, দারুল কলম, বৈরুত, ১৯৮১

ইবন খালদুন : আল মুকাদ্দিমা, (নুর মোহাম্মদ মিয়া অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩

ইবনে বতুতা : আজায়েবুল আসফার, ২য় খন্ড, (খান বাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন কর্তৃক অনূদিত), দিল্লী, ১৯১৩

ইবনে খুরদাদবিহ : কিতাব আল মাসালিক,

ইলিয়ট : বাবরনামা, সুশীল পাবলিকেশন, তা. নে.

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) : বাংলা পিডিয়া (বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ), খন্ড ২, ৩, ৯, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩

ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল (সম্পাদিত) : ঐতিহ্য, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, অফিসার সমিতি পত্রিকা, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, শাহবাগ, ঢাকা, ১৯৯৮

ইসলাম, সৈয়দ আমিনুল : মেহেরপুরের ইতিহাস, মিসেস মেহেরুল ইসলাম পাবলিকেশনস, মেহেরপুর, ১৯৯৩

ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল : বাংলাদেশ ও ইসলাম, ঢাকা, ১৩৯৪

ইসলাম, মুফাখখারুল : টাঙ্গাইলে ইসলাম , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, মোঃ নূরুল : খুলনা জেলা, খুলনা জেলা পরিষদ ভবন, খুলনা, ১৯৮২

করিম, আবদুল : মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

করিম, আবদুল : বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, ৩য় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

করিম, আবদুল : বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

করিম , আবদুল : ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

করিম, আবদুল : চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০

করিম, আবদুল : বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

করিম, আবদুল : (মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত), বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

করিম , আবদুল : বাংলার ইতিহাস,(মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত) (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ), বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

কাদের, এম. আবদুল : মুসলিম কীর্তি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮

কাদের, এম. আবদুল : সুন্দরবনে ইসলাম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৬

কামাল, শেখ মাসুম , জ্যোতি চট্টপাধ্যায় : ব্যাঘ্রতট পরিক্রমন, সাতক্ষীরা, ১৯৮৬

কৃষ্ণদাস (কবিরাজ) : চৈতন্য চরিতামৃত, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

কৃত্তিবাস : রামায়ণ, কলিকাতা, ১৯২৬

কৃত্তিবাস : রামায়ন, ভূমিকা , আত্মকথা, কলিকাতা, ১৯২৬

খন্দকার, ফজলে রাব্বি : বাংলার মুসলমান (মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮

খসরু, আমির : কিরান-উস-সাদাইন, মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল কর্তৃক সম্পাদিত, আলীগড়, ১৯১৮

খান, ফজলুর রশীদ : সমাজ বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব , শিরিন পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৮০

খান, আব্বাস আলী : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

খান, কে, এম, রাইছ উদ্-দীন : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৯৬

খাতুন, নূরন্নেছা : মোস্‌লেম বিক্রম ও বাঙ্গালায় মোসলমান রাজত্ব, মোহাম্মদী প্রেস, কলিকাতা, ১৯২৬

গুপ্ত, বিজয় : মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬২

চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পাদিত) : প্রবাসী সচিত্র মাসিক পত্র, চতুর্দশ ভাগ- দ্বিতীয় খন্ড, কার্তিক-চৈত্র, ২১০/৩/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩২১

চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম : চণ্ডীকাব্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫২

চিশতী, আবদুর রহমান : মিরাত-উল-আসরার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি নং ১৬এ, আর

চৌধুরী, আনিসুল হক : বাংলার মূল, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫

চৌধুরী, কামরুল ইসলাম (সম্পাদিত) : সেম্প নিউজ লেটার, জানুঃ -মার্চ, ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৯

চৌধুরী, তিতাশ : ষাট গম্বুজের আযান ধ্বনি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬

চৌধুরী, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত) : (অগ্রপথিক সংকলন), আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫

চৌধুরী, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত) : হযরত শাহ্ জালাল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭

চৌধুরী, মোহাম্মদ হাসান আলী : রংপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪

চৌধুরী, মোহাম্মদ হাসান আলী বাংলাদেশ ও পাক -ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস, আইডিয়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

চৌধুরী, শামসুর রহমান : পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো, পাকিস্তান পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ১৯৬৮

চৌধুরী, সুবোধ : মানব সমাজ, ১ম খন্ড, অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা, ১৩৬৩

জলীল, এ,এফ,এম, আব্দুল : সুন্দরবনের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, মেহদী বিল্লাহ্, ১নং আহসান আহম্মদ রোড, খুলনা, ১৯৬৭

জলীল, এ,এফ,এম, আব্দুল : সুন্দরবনের ইতিহাস, ২য় ও ৩য় খন্ড, লিঙ্কম্যান পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ১৩৭৬

জলীল, এ,এফ,এম, আব্দুল : পাঁচ হাজার বছরে বাঙ্গালা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, কাকলী পাবলিশার্স, খুলনা, ১৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

জয়ানন্দ : চৈতন্যমঙ্গল, দি এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৭১

জামান, সাদেক শিবলী : বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী-আওলিয়া, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৭

জামালী : সিয়ারুল আরিফীন, দিল্লী, ১৩১১ হিজরি

জানা, প্রিয়নাথ : বঙ্গীয় জীবন কোষ, ১ম খন্ড, মাতৃভাষা পরিষদ, কলকাতা, ১৯৭৫

তরফদার, এম,আর, : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

তরফদার, এম, আর, : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (আনিসুজ্জামান সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭

তারাচাঁদ, ড. : ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব (করুণাময় গোস্বামী কর্তৃক অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

তালুকদার, মাহবুব : বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বৃহত্তর যশোর, ১৯৯৮

তালিব, আবদুল মান্নান : বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০

তুঘলক, সুলতান ফীরুজশাহ : ফুতূহাত-ই-ফীরূজশাহী, (আবদুল করিম অনূদিত), এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ১৯৮৯

দাস, শন্তনাথ : নতুন মানব সমাজ, ঝুনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা, ১৯৬৮

দাস, বৃন্দাবন : চৈতন্যভাগবত, কলিকাতা, শ্রী গৌরাব্দ ৪৪০

দীন মুহম্মদ, কাজী : সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯

দীন মুহম্মদ, কাজী : জীবন সৌন্দর্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫

দেহলভী, আবদুল হক : আখবারুল আখিয়ার (উর্দু অনুবাদ), করাচী, ১৯৬৩

ফজলুল্লাহ ইবনে আল্ উমারী : মাসালিক আল্ আবসার, অধ্যাপক আঃ রশীদ কর্তৃক অনূদিত

বসু, নগেন্দ্রনাথ (সঙ্কলিত) : বিশ্বকোষ, পঞ্চম ভাগ, কলিকাতা, ১৩০১

বিপ্রদাস : মনসামঙ্গল, এম,কে,সেন কর্তৃক সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫৬

বিশ্বাস, সুকুমার : বাংলাদেশের পুরাকীর্তি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

বংশীদাস, দ্বিজ : মনসামঙ্গল, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস : বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পাদিত) : বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), জেনারেল পিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৮৫

মজুমদার, রমেশচন্দ্র : বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, (প্রাচীন যুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৪

মহিউদ্দীন, এ, কে, এম, : চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬

মাসুম, নূরুল্লাহ : দক্ষিণের বাদশাহ খান জাহান আলী (রহ.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬

মাসুদী : মুরুজ আল জাহাব,

মিনহাজ-ই-সিরাজ : তবকাত-ই-নাসিরি (আ,ক,ম, যাকারিয়া অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

মিত্র, সতীশচন্দ্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩২১

মিঞা, মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন : গৌড়ে মুসলিম শাসন ও নূর কুতুব উল-আলম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১

মুখোপাধ্যায়, মতিলাল : সমাজ দর্শন, জানার্জি পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৪

মুখোপাধ্যায়, সুখময় : বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব, (১২০৪-১৩৩৮ খ্রীঃ), সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৮৮

মুখোপাধ্যায়, সুখময় : বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, কলিকাতা কে.বি. প্রিন্টিং, কলিকাতা, ১৩৮৫

মুখোপাধ্যায়, সুখময় : বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৮০

যাকারিয়া, আ,কা,মো, : বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭

রশীদ, আ. ন.ম.বজলুর : আমাদের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৭

রায়, নীহার রঞ্জন : বাঙ্গালীর ইতিহাস, বুক এমপোরিয়াম লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫৬

রায়, অনিরুদ্ধ : মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

রহমান, ড: মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর : কুর'আন পরিচিতি, নুবালা পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ১৯৯২

রহমান, ড: মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর : কুরআনের পরিভাষা, আল মুনীর পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ১৯৯৮

রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর : সমাজ কর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০

রসুল, মোহাম্মদ গোলাম : সমাজ ও সভ্যতার ইতিকথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

রহিম, ড: মুহম্মদ আবদুর : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১২০৩-১৫৭৬ খ্রি:), (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

রহিম, মোঃ আব্দুর : হযরত খান জাহান আলী, কোরাণ মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল, ১৩৮০

রহীম, আবদুর : হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭০

রহিম, ড মুহম্মদ আবদুর : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০১

লতিফ, এম. এ. (সম্পাদিত) বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ১৯৮৪

শরফুদ্দীন, শাইখ : পূর্ব-পাকিস্তানে সূফী-প্রভাব ও ইসলাম প্রচার, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯

শাহ্নাওয়াজ, এ.কে.এম. : মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১২০০-১৫৩৮ খ্রি:), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

শহীদুল্লাহ, ড: মুহম্মদ : ইসলাম প্রসঙ্গ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩

শহীদুল্লাহ, ড: মুহম্মদ : বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৩৭১

শরীফ, আহমদ : মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

শোয়েব, শাহ : মানাকিব-উল-আসফিয়া, বিহার, ১৯২৬

সরওয়ার, গোলাম : খাজিনাতুল আসফিয়া, নেওয়াল কিশোর, লক্ষ্ণৌ, ১৩২৫ হিজরি

সম্পাদনা পরিষদ : ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, ১৯৮৬, ৩য় খন্ড, ১৯৮৭ , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদ : বিশ্বভারতী এ্যানালস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৫

সাকলায়েন, গোলাম : আমাদের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭

সাকলায়েন, গোলাম : বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

সাকলায়েন, গোলাম : পূর্ব পাকিস্তানের সুফী-সাধক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৮

সলীম, গোলাম হোসায়ন : বাংলার ইতিহাস, (রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ, আকবর উদ্দীন অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪

সিদ্দিকী, আবদুল গফুর : ফোকর স্থানে ইসলাম, উদ্ধৃতি : উত্তর বাংলায় আউলিয়া প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৭

সিদ্দাইনী, গোলাম মোস্তফা : মৃণালিনী দেবীর গ্রাম, দক্ষিণ ডিহি: স্মারক গ্রন্থ, খুলনা, ১৯৯৫

সেন, খগেন্দ্রনাথ : সমাজ বিজ্ঞানের পরিচয়, শ্রীশ প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮১

সেন, খগেন্দ্রনাথ : সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা, ১ম খণ্ড, শ্রীশ প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮২

সেন, রঙ্গলাল : সমাজ বিজ্ঞান, প্যারামাউন্ট বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৭৩

সেন, দীনেশচন্দ্র : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯০১

সেন, কে,পি, : বাংলার ইতিহাস (নবাবী আমল), ১৩০৮ বঙ্গাব্দ

সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (প্রথম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯১

হক, ডঃ মুহম্মদ এনামুল : পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম, আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৪৮

হক, ডঃ মুহম্মদ এনামুল : বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৯৩৫

হক, ডঃ মুহম্মদ এনামুল : মনীষা মঞ্জুষা, (৩য় খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪

হক, ডঃ মুহম্মদ এনামুল : মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, (বাংলা-সাহিত্য মুসলিম অবদানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮

হক, এম. ওবায়দুল : বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ফেনী, ১৯৮২

হাকিম, আবদুল : লালমতি সয়ফুল মুলুক, ৬৪/৩, মেছুয়া বাজার স্ট্রিট, কলিকাতা, ১২৯৮

হাকিম, আবদুল (সম্পাদিত) : বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্থ খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৯

হাকিম, আবদুল (সম্পাদিত) : বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৯

হেলাল, নাসির : প্রাণের স্পন্দন জেগেছে মৃতের নগরী বারোবাজার, আজকের কাগজ, ঢাকা, ১৯৯৭

হেলাল, নাসির : বারবাজারের ঐতিহ্য, বড় মগবাজার, ঢাকা, ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

হেলাল, নাসির	:	যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, সীমান্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২
হোসেন, সৈয়দ ওমর ফারুক	:	খানে আজম হজরত খান জাহান আলী (র:) , মোরশেদ পাবলিকেশন, বাগেরহাট, ১৯৮২
হোসেন, মোঃ মোশারফ	:	প্রত্নতত্ত্ব ঃ উদ্ভব ও বিকাশ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮
হোসেন উদ্দীন হোসেন	:	যশোরাদ্য দেশ, বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৭৪
হোসেন, মোঃ আমীর	:	সমাজ বিজ্ঞান, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯০

ঢাকা আলীয়া মাদ্‌রাসা পাণ্ডুলিপি নং এস,এ, ১২/১৯-২০

মিঃ সান্ডার্সের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় রূপান্তরিত

এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. (অপ্রকাশিত) অভিসন্দর্ভ :

আক্তার, সুরাইয়া	:	মুসলিম বাংলার তোরণ স্থাপত্য (পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী) : স্থাপত্যিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব, এম.ফিল. থিসিস (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা,২০০৩
আমীন, মুহাম্মদ রুহুল	:	বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি:), পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৬
খাতুন, মাহমুদা	:	মঙ্গলকাব্যে বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজ, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৮৯
খাতুন, মোছা : আশীয়ারা	:	বাংলার ঐতিহাসিক নগরী একটি সমীক্ষা, (১২০০-১৫৭৫ খ্রি :), পিএইচ.ডি. থিসিস (অপ্রকাশিত), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৫
চৌধুরী, মোঃ মজিবুর রহমান	:	বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন (১৮০০-১৯০০ খ্রি:), পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৬
লতিফ, মুহাম্মদ আব্দুল	:	শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী ও নূর-কুত্‌বুল আলম (র:), সাধকত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

শফিকুল্লাহ, ডঃ মুহাম্মদ : ইমাম তাহাবীর জীবনী এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, (অপ্রকাশিত), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯০

সালাম, ড : এস,এম, আবদুস : আবদুল হক দেহলভী , হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, (অপ্রকাশিত), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৭

হক, এ,কে,এম, আমিনুল : ঢাকায় উর্দু -ফার্সী সাহিত্যের চর্চা, (১৯০১ থেকে ১৯৭১ খ্রি:), এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১

Alamgir, Khoundkar : Indigenous and Extraneous Elements of Sultanate Architecture of Bengal, Ph. D. Thesis (unpublished), The University of Dhaka, Dhaka, 2002

Ali, A.K.M Yaqub : Aspects of Society and Culture of Barind 1200-1576 A.D. Ph. D. Thesis (unpublished) , Rajshahi University, Rajshahi,1981

Bari, Muhammad Abdul : Khalifatabad : A Study of its History and Monuments, M.Phil Thesis (unpublished), Rajshahi University, Rajshaji, 1980

Khatun, Habiba : Sonargaon : Its History and Monuments (1338-1603 A.D.), Ph.D. Thesis (Unpublished), The University of Dhaka, Dhaka, 1987

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি

Abul Fazal	:	Ain-i-Akbari, (tran. Blochmann), Vol. I, Calcutta, 1877
Abul Fazal	:	Ain-i-Akbari, Vol. I and II, (English translation of H.S. Jarret), Calcutta, 1949
Ahmed, Dr. Nazimuddin	:	The Buildings of Khan Jahan in and around Bagerhat, U.P.L., Dhaka, 1989
Ahmed, Dr. Nazimuddin	:	Discover the Monuments of Bangladesh, The University press Limited, Dhaka, 1984
Alamgir, Khoundkar	:	Khan Jahan (R.) : Ruler, Builder and Saint, Parash Publishers, Dhaka, 2001
Ali, Dr. A.K.M. Ayub	:	History of Traditional Education in Bangladesh, Islamic foundation Bangladesh, Dhaka, 1983
Ali, Mehrab	:	Eksha Teish Hijrir Shilalipi (Inscription of 123 A.H.), Dinajpur Museum Series No. 4
Ali, Muhammad Mohar	:	History of the Muslims of Bengal, Vol. I A, IB, Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Department of Culture and Publications, Riyadh, 1985
Ali, Syed Murtaza	:	Saints of Bangladesh, Dacca, 1971
Ali, Syed Ameer	:	The Spirit of Islam, A History of the Evolution and Ideals of Islam, with a Life of the prophet chatto and windus, London, 1964
Arberry, A.J. (ed.)	:	Muslim Saints and Mystics, Routledge and Kegan Paul, London, 1966
Ashraf, K.M.	:	Life and conditions on the people of Hindustan, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, New Delhi, 1988
Babur, Zahir uddin Muhammad	:	The Babur-nama in English (Memoirs of Babur), Vol. II, Luzac and Co., London, 1921
Bakhshi, Nizam uddin Ahmad	:	Tabaqat-i-Akbari, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1935
Barani, Zia-uddin	:	Tarikh-i-Firuz Shahi, Calcutta, 1862
Beveridge, H .	:	The District of Bakarganj (Its History and Statistics), Trubner and Co., Ludgate Hill, London, 1876
Bhattasali, N.K.	:	Bengal Chiefs, Struggle (Reprinted from Vol. XXXV of "Bengal : Past and present") Calcutta, 1928

Dhaka University Institutional Repository

Bhattasali, N.K.	:	Catalogue of coins, Dacca, 1936
Bhattasali, N.K	:	Coins and chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, Cambridge, 1922
Brown, Percy	:	Indian Architecture (Islamic Period), D.B. Taraporevala Sons and company, Bombay-India, 1875 A.D.
Chatterji, S.K.	:	The Origin and Development of the Bengali Language, Vol. 1, II and III, George Allen and Unwin, London, 1979
Colling Wood, L.	:	Universal Encyclopedia, Vol. 8, Regency Publishing Group Ptv. Limited, Sydney, 1983
Cowell, E.B.	:	The History of India, John Murray, Albemarle Street , London, 1866
Creswell, K.A.C.	:	A short Account of Early Muslim Architecture, Penguin Book Ltd., Great Britain, 1958
Cunningham, Alexander	:	Archaeological Survey of India, Vol. 15, Rahul Publishing House, Delhi, 1994
Dames, M.L.	:	The Book of duarte Barbosa, Vol. II, Hakluyt Society, London, 1921
Dani, Ahmad Hasan	:	Bibliography of Muslim Inscriptions of Bengal, (Appendix to the Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. II), Dacca, 1957
Dani, Ahmad Hasan	:	Muslim Architecture in Bengal, Asiatic Society of Pakistan Publication No. 7, Dacca, 1961
Das Gupta, J.N.	:	Bengal in the 16th century, Calcutta University, 1914
De leeuw, Lohuizen Johana E. Van	:	"The Early Muslim Monuments at Bagerhat," in Michel, George (ed.), The Islamic Heritage of Bengal, UNESCO, Paris, 1984
Dikshit, K.N.	:	Memoirs of the Archacological Survey of India, No. 55, Delhi, 1938
Eaton, Richard M.	:	The Rise of Islam and the Bengal Frontier, (1204-1760), Oxford University Press, London, 1997
Elliot, H.M. and John Dowson,	:	The History of India as told by its own Historians, Vol. I, Kitab Mahal, Allahabad, 1964
Firishta, Abul Kasim	:	Tarikh-i-Firishta, Newal Kishore, Lucknow.
Ferguson, James	:	History of Indian and Eastern Architecture, Vol. II, Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1972
Gait, E.A.	:	History of Assam, Calcutta, 1926

Dhaka University Institutional Repository

Goron, Stan and J.P, Goenka	:	The Coins of the Indian Sultanates, (Covering the Area of present-day India, Pakistan and Bangladesh), Munshiram Manoharlal publishers Pvt. Ltd., 2001
Habib, Irfan	:	An Atlas of the Mughal Empire, centre of Advance Study in History, Aligarh Muslim University, Delhi, 1982
Haig Wolseley, (ed.)	:	The cambridge History of India, Vol. III, Turks and Afghans, S. Chand and Co., Lucknow-Bombay, 1965
Haq, Dr. S. Moinul	:	Barani's History of the Tughluqs Pakistan Historical Society, Karachi, 1959
Haque, Enamul and A.Karim	:	Arakan Rajsabhaya Bangla Sahitya (Bengali Literature in the Arakanese Court), Calcutta, 1935
Haque, Enamul	:	Islamic Art Heritage of Bangladesh, Bangladesh National Museum, Dhaka, 1983
Haque, Enamul	:	A History of Sufi-ism in Bangal, Asiatic Society of Bangladesh, Dacca, 1975
Haque, Shamsul	:	Tajkiratul Awlia-i-Hind, Vol. II, Delhi, 1931
Hasan, Syed Mahmudul	:	Gaur and Hazrat Pandua, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987 A.D.
Hasan, Syed Mahmudul	:	A Guide to Ancient Monuments of East Pakistan, Society for Pakistan Studies, Dacca, 1970
Hasan, Syed Mahmudul	:	Muslim Monuments of Bangladesh, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987
Havell, E.B.	:	The Ancient and Medieval Architecture of India : A study of Indo-Aryan civilisation, S. Chand and Co, (Pvt.) LTD., New Delhi, 1915
Hodivala, S.H.	:	Studies in Indo-Muslim History, Bombay, 1939
Hunter, W. W.	:	A statistical Account of Bengal, Vol. II, Trubner and Co., London, 1877
Ibn Battuta, H.A.R. Gibb	:	Travels in Asia and Africa, London, 1929
Ishaq, Dr. Muhammad	:	India's contribution to the Study of Hadith Literature, Published by the University of Dacca, 1976
Karim, Abdul	:	Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D. 1538), Baitush Sharaf Islamic Research Institute, Chittagong, 1985

Dhaka University Institutional Repository

Karim, Abdul	:	Corpus of the Muslim Coins of Bengal (Down to A.D. 1538), Published by, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1960
Karim, Abdul	:	Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, 1992
Khan, F.A.	:	Recent Archaeological Excavations in East Pakistan, Karachi
Khan, M. Abid Ali and Stapleton (ed.)	: :	Memoirs of Gaur and Pandua, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1924.
Khan, Muhammad Hafizullah	:	Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1988 A.D
Khusrau, Amir	:	Qira'n al-Sa'dain, Lucknow, 1845
Kupeer, Adam	:	The Social Science Encyclopedia, Library of Congress Cataloging in publication Data, London, 1985
Majumdar, R.C. (ed.)	:	The History of Bengal, Vol. I, The University of Dacca, 1963
Martin, M	:	The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, Vol. II., London, 1838
Minhaj-i-Siraj	:	Tabaqat-i-Nasiri, Asiatic Society, Calcutta, 1964
Moreland, W.H.	:	The Agrarian System of Moslem India, (A Historical Essay with Appendices), Low price publications, Delhi, 1929
Mountstuart Elphinstone	:	The History of India, John Murray, Albemarle Street, 1866
Mukharjee, R.K.	:	A History of Indian Shipping, Orient Longmans, Calcutta, 1957
Nainar, M.H.	:	Arab Geographer's Knowledge of Southern India, University of Madras, 1942
Nath, R.	:	History of Saltanate Architecture, New Delhi, 1997 A.D.
Nathan, Mirza	:	Baharistan-i-Ghaybi (tran. Dr. M.I. Borah) Vol. I, Gauhati, Asam, 1936
Nicholson, R.A.	:	Literary history of the Arabs, Cambridge University press, 1953
Nizami, K.A. (Dr. M. Zaki (ed.)	:	Arab Accounts of India, Idarah-i-Adabiyat-i, Delhi, 1981

Dhaka University Institutional Repository

Pargiter, Ick Eden	:	A Revenue History of the Sundarbans, From 1765 to 1870, Bengal Government press, Alipore, Bengal, 1934
Prashad, Dr. B.B.	:	Tabaqat-i-Akbari, vol. III, English Translation of Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1939
Purchas, Samuel	:	Purchas His Pilgrimes, Vol. XI, Publishers to the University of Glasgow, London, 1625
Qureshi, I.H.	:	The Administration of the Sultanate of Delhi, 2nd edition, Kashmiri Bazar, Lahore, 1944
Qureshi, Dr. I.H.	:	Quoted by Insha-i-Mahru, Taxila in Indo-Pakistan During Middle Ages, Journal of the Pakistan Historical Society, 1953
Rahim, Muhammad Abdur	:	Social and Cultural History of Bengal, vol. I, (1201-1576), Pakistan Historical society, Karachi, 1963
Rajput, A.B.	:	Architecture in Pakistan, Pakistan Publications, Karachi, 1963
Rennell, James	:	Memoir of a Map of Hindustan, Calcutta, 1976 (Reprint)
Salim , Ghulam Hussain	:	Riyazu-s-Salatin (A History of Bengal), Translated by Abdus Salam, Idarah-i Adabiyat-1, Delhi, 1975
Salim, Ghulam Hussain	:	Riyazu-s-Salatin, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1898
Sarkar, Jadunath (ed.)	:	The History of Bengal, vol. II, Published by The University of Dacca, 1948
Spate, O. H.K.	:	India and Pakistan, a General and Regional Geography, (Second edition), London, 1957
Symonds, Richard	:	The Making of Pakistan, Allies Book corporation, Karachi, Hyderabad, 1966
Taifur, S.M.	:	Glimpses of old Dacca, Lulu Bilkis Banu, Dacca, 1956 A.D.
Thackson, Wheeler M	:	"The Role of Calligraphy", in Martin Frishman and Hasanuddin Khan (ed.) : The Mosque History Architectural Development and Regional Diversity, Thames and Hudson, London, 1994
Vasu, Nagendranath Prachya-vidya Maharnava and Mustaphi, Late Byomkesh	:	The castes and Sects of Bengal Brahmans Kanda, vol. III, Calcutta, 1331

Dhaka University Institutional Repository

জার্নাল

Annual Report of Eastern Pakistan Circle Archaeology for the year 1952-53 A.D.

Bangladesh Directory : Shamsul Huda, A.K.M. (ed.),The Times publications, Dacca, 1978

Bangladesh District Gazetteers Bakerganj : Habibur Rashid, Md. (ed.), Bangladesh Government press, Dacca, 1981

Bangladesh District Gazetteers Jossore : Latiful Bari, K.G.M. (ed.), Bangladesh Government press, Dacca, 1979

Bangladesh District Gazetteers, Khulna, : Latiful Bari, K.G.M. (ed.), Bangladesh Government Press, Dacca, 1978

Bangladesh Population Census 1974 : Village population Statistics, Khulna District, Bangladesh Bureau of Statistics, Dacca, 1977

Bangladesh population Census 1974 : Village Population Statistics, Jessore District, Bangladesh Bureau of Statistics, Dacca, 1977

Banglapedia (National Encyclopedia of Bangladesh) : Sirajul Islam (ed.), Vol. 3, 4, 5, 6, 6, 9, 10 , Asiatic Society of Bangladesh, 2003

Bengal District Gazetteers, Jessore : O'Malley, L.S.S. (ed.), Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1912

Bengal District Gazetteers Khulna : O'Malley, L.S.S.(ed.),The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1908

Bengal District Gazetteers Murshidabad : O'Malley, L.S.S, Calcutta, A.D. 1914

Bengal District Gazetteers, Mymensingh : Sachse F A., Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1917

Bengal Past and Present : Hasan Askari , New Light on Rajaha Ganesh and Sultan Ibrahim Sarqi of Jaunpur from Contemporary Correspondence of two Muslims Saints, vol. LXVII,1948

The Calcutta Review : An Illustrated Monthly , Third Series vol. LXX; Jan.-Mar. 1939

Third Series Vol. LXXI; Apr.-Jun. 1939

Third Series Vol. LXXII: July-Sep. 1939

Published by- The University of Calcutta

The Calcutta Review : A report on the District of Jessore , Its Antiquities, its History and its commerce; Westland, J. (ed.), Bengal Secretariat Press, Vol. V, 1857

East Pakistan District Gazetteers, Chittagong : Rizvi, S.N.H., East Pakistan Government Press, Dacca, 1970

Eastern Bengal District Gazetteers Dinajpur : Strong, F.W., The pioneer press, Calcutta, 1912

Dhaka University Institutional Repository

Economic Annals of Bengal : Shing, J.C , London, 1927

The Encyclopedia Americana, Inernational Edition, vol. 8, USA, 1829

The Encyclopedia of Islam, Vols. I-IV, Leiden, 1953

The Encyclopedia of Religion and Ethics , vol. IV, New York, 1965

Encyclopedia of the Social Science Vol. 13, The Macmillan Company, New York, 1963

Final Report on the Survey and Settlement operation in the Bakarganj District, 1900-1908 : Jack. J.C , Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1915

Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Jessore- 1920-1924, Momen, M.N. Bengal Secratriat Book Depot, Calcutta, 1925

The Imperial Gazetteer of India, Vol. XII, Published by Clarendon press, Oxford, 1904

The Imperial Gazetteer of India, Provincial Series Bengal, Vol. I, Published by Usha Jain, Delhi, 1984

Islamic Culture, Vol. XXXII, No. I : The Islamic Culture Board, Hyderabad - Deccan, 1958

Itihash Patrika, Dhaka University : Habiba Khatun, Bagerhat Nay Gambud Masjid, Ist to 3rd Issue, 1382

Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. VI, Calcutta, 1910 and 1911

Journal of the Asiatic Society of Bangladesh : Abdul Karim , "Date of Bakhtiyar Khalji's Conquest of Nadia", Vols, XXIV-VI, Dhaka, 1979-81

Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XLIII (43) : Blochmann, H., Geography and History of Bengal, 1874

Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities); Akmal Hussain (ed.), vol. 42, Number 2 December 1997

Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 36 : Babu Gaurdass Bysack , On the Antiquities of Bagerhat JASB, Calcutta, 1867

Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XLIV, 1875, vol. XLVIII, 1890 Published by F.B. Jewis, Baptist Massion press

Journal of Bengal Art : Khoundkar Alamgir, "Archaeological Remains at Barabazar, Jhenidah District", in Enamul Haque (ed.), Dhaka, 1998

Journal of the Varendra Research Museum, Vol. IV, Sohrabuddin Ahmad, "Antiquities of Barabazar" University of Rajshahi, 1975-76

Journal of the Varendra Research Museum, Vol. 6, (ed. Mukhlesur Rahman) : Yaqub Ali, A.K.M., "Two unpublished Arabic Inscription", Rajshahi, 1980-81

Dhaka University Institutional Repository

The New Encyclopedia Britannica \, Vol. 3, 30, Chicago, 2002

The Pakistan Observer : Anwar Husain , Khan Jahan Ali Khan, 10 October sunday, Dacca, 1965

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Baptist Mission Press, Calcutta, 1873

Selections from Calcutta Gazetteers of the years: Seton-Karr, W.S., vol. 1, 1784-1788, vol. 2. 1789-1797, Published under the Sanction of the Government of India, Calcutta, 1864

Shilpakala : A.B.M. Husain , "The Ornamentation of the Sultani Architecture in Bengal", Bangladesh Shilpakala Academy, Dacca, vol. 1, 1978

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ষাট গম্বুজ মসজিদ

পরিশিষ্ট-১

Dhaka University Institutional Repository

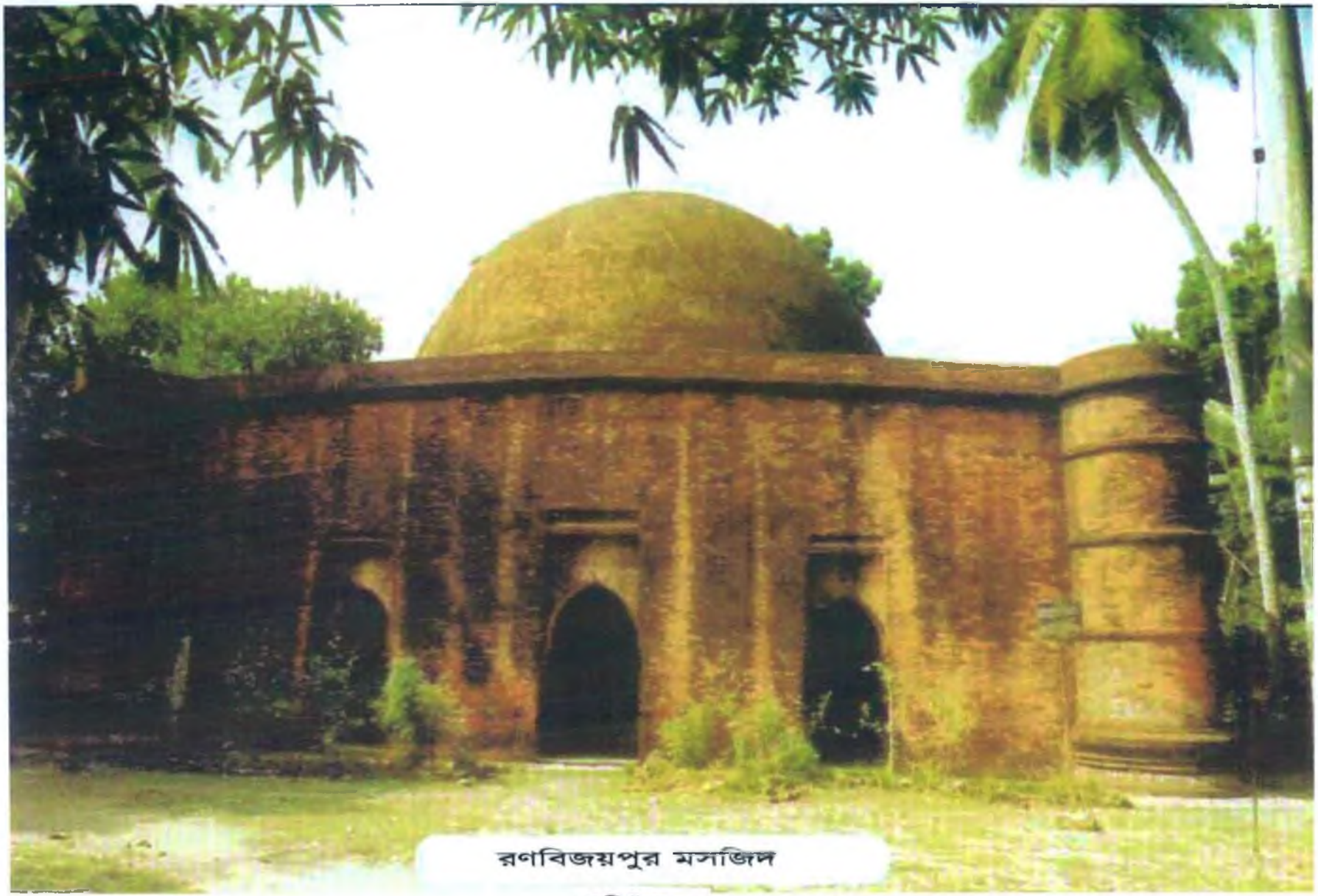

রণবিজয়পুর মসজিদ

পরিশিষ্ট-২

Dhaka University Institutional Repository

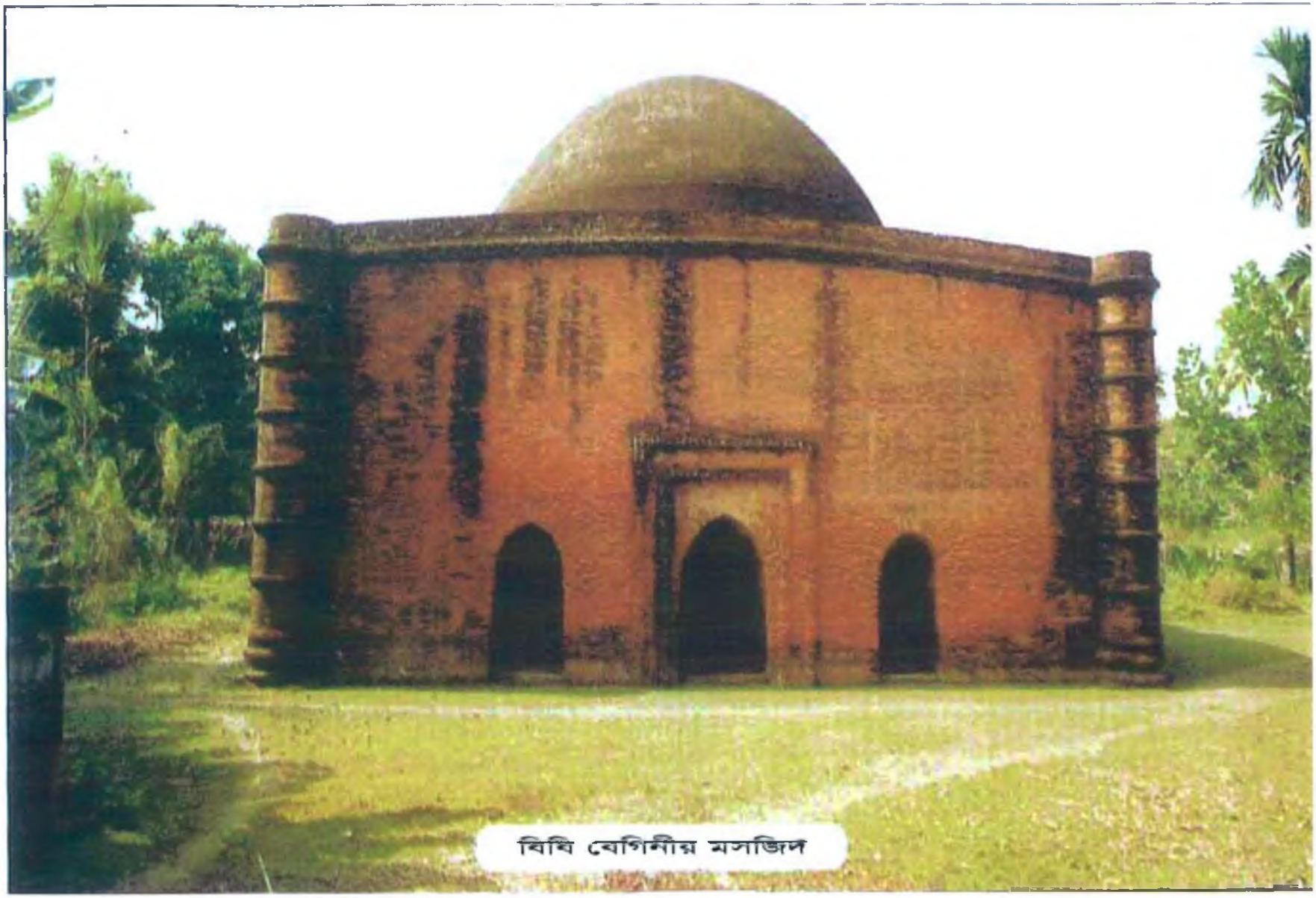

বিবি বেগিনীর মসজিদ

পরিশিষ্ট-৩

Dhaka University Institutional Repository

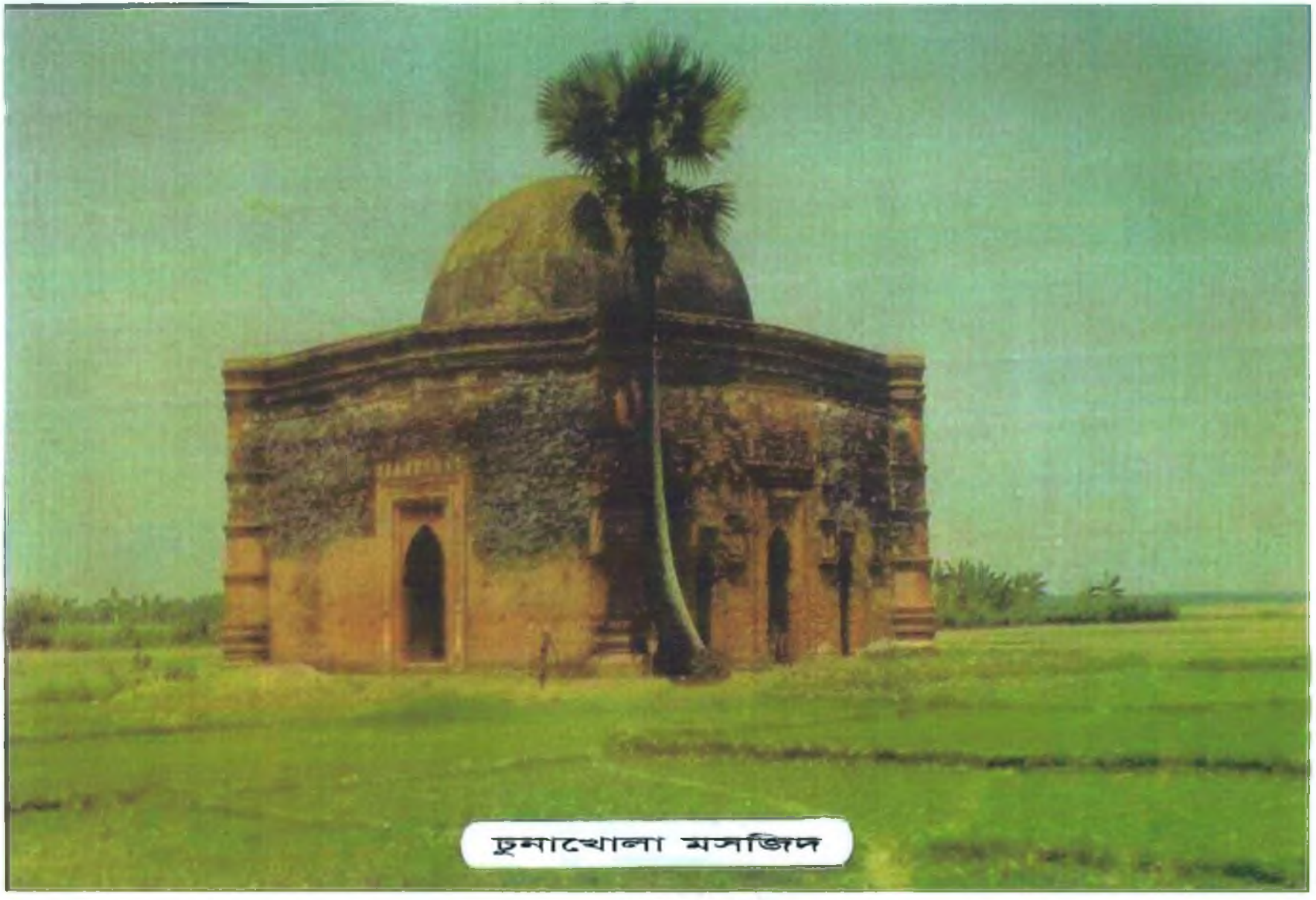

চুনাখোলা মসজিদ

পরিশিষ্ট-৪

Dhaka University Institutional Repository

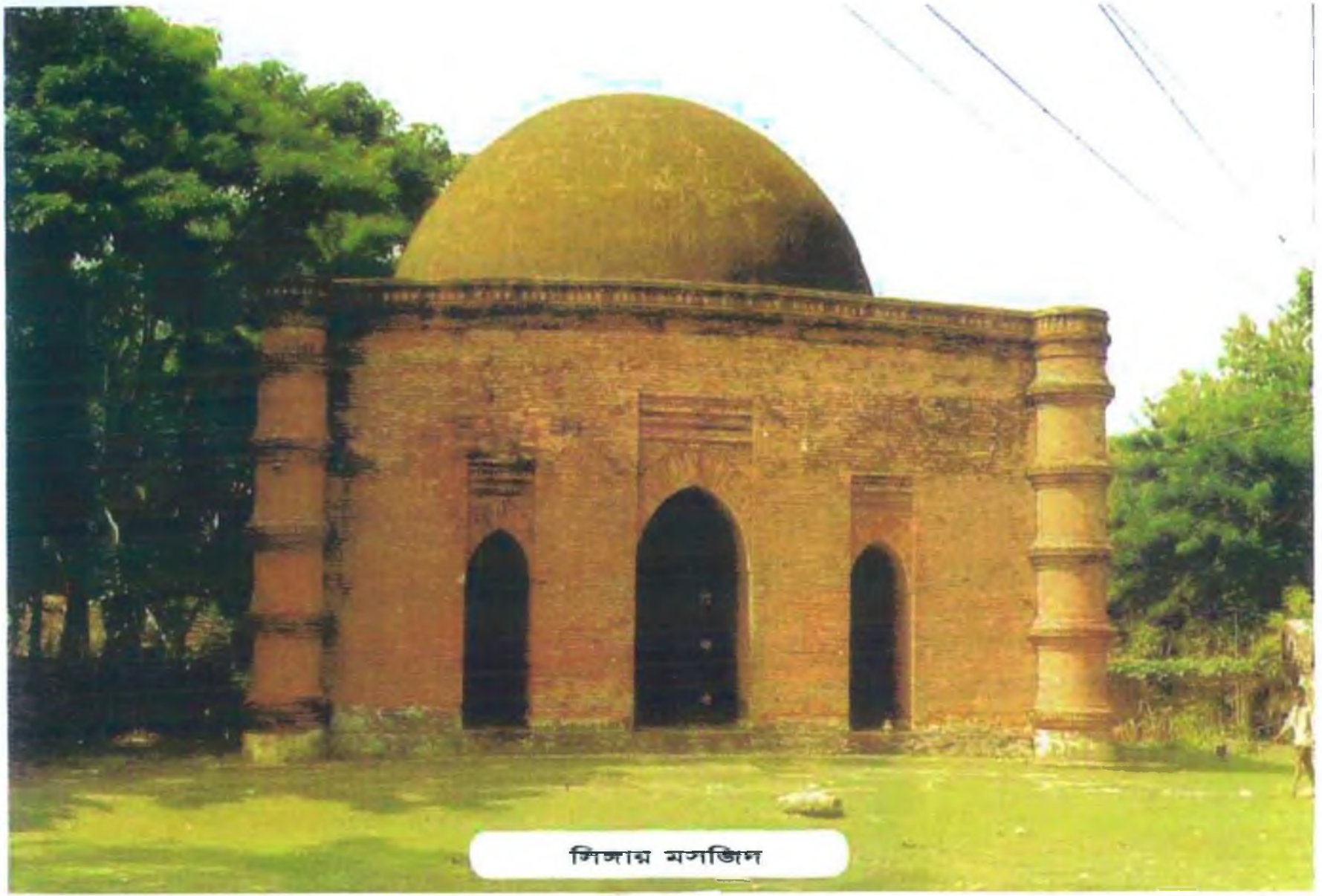

শিঙ্গার মসজিদ

পরিশিষ্ট-৫

Dhaka University Institutional Repository

নয়-গম্বুজ মসজিদ

পরিশিষ্ট-৬

Dhaka University Institutional Repository

জিন্দাপীর মসজিদ

পরিশিষ্ট-৭

Dhaka University Institutional Repository

খাঞ্জালী (রহঃ) এর সমাধি কমপ্লেক্স

Dhaka University Institutional Repository